কুরুক্ষেত্র

নবীনচন্দ্র সেন

প্রকাশকের নিবেদন।

অনেকেরই ধারণা স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "কৃষ্ণচরিত্রের" অনুকরণ করিয়া স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র সেন তাঁহার "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্র" কাব্যদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা জানি বঙ্কিম বাবুর পদাঙ্কানুসরণ করা নবীন বাবু আত্মশ্লাঘা মনে করিতেন; তথাপি সাহিত্যিক সত্যের অনুরোধে এ সম্বন্ধে ১৩০০ সনের ১৫ই ফাল্গুনের ১১শ সংখ্যা "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রে বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বাঙ্গালী পাঠক অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইল, কবিবর শ্রীনবীন বাবু 'রৈবতক' কাব্য প্রচার করেন; সম্প্রতি তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারতে" কুরুক্ষেত্রের এক সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রচারিত হয়। উহার এক স্থলে সমালোচক লিখিয়াছেন,—

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম বাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। * * আমরা

যখন কুরুক্ষেত্র প্রথমবার পড়িলাম তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম কি নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না। আবার পড়িলাম, তখন দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী।"

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কে অগ্রে, কে পশ্চাতে, এ কথার মীমাংসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আর আমরা তাঁহাদের সমসাময়িক হইয়া কখনই ইহার সুমীমাংসা করিতে পারিব না। পারিবে আমাদের ভবিষ্যবংশীয়েরা। এ বিষয়ে কবি গিরিচূড়ার তুলনীয়। কিরাত শিখরদেশে কুটীর বাঁধিয়া রয়; সে কখন পর্ব্বতের তুঙ্গতা উপলব্ধি করে না। কিন্তু বহুদূর হইতে দেশবাসী চাহিয়া দেখে, গিরি উচ্চ শিরে আকাশের স্পর্দ্ধা করিতেছে। কিন্তু অন্যান্য কথা কি ঠিক? তাহার ত এই মীমাংসার সময়। অতীতের কুয়াশায় ঢাকিয়া গেলে, আর ত এ সকল কথার কখনও নিষ্পত্তি হইবে না।

বঙ্কিম বাবু এই ভাবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝিয়াছেন। "যিনি বুদ্ধি-বলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদ-প্রবল দেশে বেদ-প্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—'বেদে ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম লোকহিতে'—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি" (ধর্ম্মতত্ত্ব)।

রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, নব্যভারত যাহাকে কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন—রৈবতকের মৌলিক কল্পনা।

১২৯৭ সালের বৈশাখের সংখ্যা 'সাহিত্যে' রৈবতকের সমালোচনায় আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম,—

"নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এই মহাকীর্ত্তিপ্রসঙ্গ লইয়া রৈবতক রচিত। খণ্ড ভারতে কি উদারতা পরার্থপরতা অলৌকিক কৌশল প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই এই মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। * * তাঁহার জীবনের মহাব্রত

এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
একই সাম্রাজ্য নীতি,
সকলের এক ভিত্তি,—সর্ব্বভূত হিত,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ং, করিব নিশ্চিত
এই ধর্ম্মরাজ্য,—মহাভারত,—স্থাপিত।

কৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সহিত ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছিল। ইহার মূলমন্ত্র—

——এক জাতি মানব সকল,
এক বেদ,—মহা বিশ্ব অনন্ত অসীম!

একই ব্রাহ্মণ তার,—মানবহৃদয়,
একমাত্র মহাযজ্ঞ,—নিষ্কাম সাধনা।

এই কয়টি কথাতেই দুর্ব্বাসার বিশেষ আপত্তি। তাঁহার বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্ম্ম অঙ্কুরে উন্মূলিত না হইলে

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম এই পাপানল
প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত।

এই ভয়ে তিনি বাসুকির (অনার্য্যের নেতা ও ঈশ্বরের) সহিত এই মহাসন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন,

"আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্যশিলায়
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিশিয়া তেমন
নূতন ভারতরাজ্য করিব সৃজন।"

অতএব রৈবতকের মূল কল্পনা কৃষ্ণের জীবনব্রত, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন এবং দুর্ব্বাসার অনার্য্যজাতির সহিত যোগদান করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ। এই দুই প্রবল বিপরীত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে রৈবতক কাব্য। রৈবতকের বিষয় যাহা বলিলাম, কুরুক্ষেত্রের পাঠক দেখিবেন যে, ঐ কাব্যেরও তাহাই। কারণ, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র মৌলিক কল্পনায় স্বতন্ত্র নহে। একে শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, অন্যে মধ্যলীলা, বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব, কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনার জন্য যদি নবীন বাবু ঋণী হয়েন, রৈবতকের জন্যও অবশ্য ঋণী হইবেন। কিন্তু আমি দেখাইব, তিনি আদৌ ঋণী নহেন।

এ কথা প্রমাণ করিতে আমি যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিব, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য। বাহ্য ;—(External) ও আন্তর (Internal evidence)। আন্তর সাক্ষ্য নবীন বাবুর ও বঙ্কিম বাবুর রচিত গ্রন্থাদি। আর বাহ্য সাক্ষ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু, প্রফুল্ল বাবু, ঈশান বাবু, এবং স্বয়ং বঙ্কিম বাবু। প্রথম আন্তর সাক্ষ্য।

রৈবতক এবং কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইবার অনেক বৎসর পূর্ব্বে নবীন বাবুর "রঙ্গমতী" প্রকাশিত হয়। রঙ্গমতীতে আমরা কৃষ্ণের জীবনব্রত সম্বন্ধে এই কয়টি কথা লিখিত দেখি।

——————এই বহ্নি শিক্ষা
দেব চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।

এই কয়টি পংক্তিতে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপনের—যাহা পরে রৈবতকের মৌলিক কল্পনা হইয়াছে,—বিস্পষ্ট আভাস লক্ষিত হয়।

আর এক কথা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে এক হইলেও, বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ও নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কি

এক? কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম বাবু ভাগবতের ব্রজলীলা অনৈতিহাসিক বলিয়া এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিম বাবু পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া ব্রজলীলার কতক ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর স্নেহের পুতুল, ইহার অধিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু নবীন বাবু প্রথম হইতেই ব্রজলীলায় বিশ্বাসবান্। আসিন্ধু হিমাচল এ ভারতে যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, নীবন বাবু 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় মুদ্রণের বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত রৈবতকের এক সর্গ, সেই ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণের চিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত করিয়াছেন। অবশ্য ঐ সর্গ আরও মধুময় হইতে পারিত। কুরুক্ষেত্রে যে কৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গ দেখি, তাহার উদ্বেলতা ঐ সর্গে নাই। তাহার কারণ তাঁহাকে সসঙ্কোচ লিখিতে হইয়াছিল। পতিত ভূমি কর্ষণ করা বড় স্পর্দ্ধাসাধ্য। কিন্তু তথাপি নবীন বাবু সর্ব্বত্রই ভাগবতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা, ব্রজলীলার প্রেম ও কুরুক্ষেত্রলীলার নিষ্কামতা, অর্থাৎ ভাগবত ও মহাভারত এই উভয় মিশাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব, বঙ্কিম বাবুর এবং নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের ধারণা অনেক অংশে বিভিন্ন।

এ সকল আন্তর সাক্ষ্যে হয় ত অনেকের সন্দেহ মিটিবে না। সেই জন্য বাহ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি।

১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্রে (অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের আগষ্ট

মাসে) লিখিত পত্রে (যাহা রৈবতকের আরম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে) নবীন বাবু ঈশান বাবুকে এই কয়টি কথা লিখেন,—

"কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আদিতীর্থ 'গিরিব্রজপুর' বা আধুনিক 'রাজগৃহে' রাজকার্য্যে অবস্থান কালে, স্থানমাহাত্মে উদ্বেলিত-হৃদয়ে কাব্যজগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর একবার পাঠ করি। সেই অবস্থায় তথায় দেখিলাম, গিরিব্রজ-পুরের সেই পঞ্চগিরি ব্যূহ, প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ, বন্ধুর উপল রাশির মধ্যে সেই ভারত খ্যাত রঙ্গভূমির মসৃণ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত, এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। * * * মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার, সেই শেখরমালার, অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান্ বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত মানব জাতির, উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত এবং মধ্যভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার অধিকাংশ রচিত হইল।"

এই বিষয় স্বয়ং নবীন বাবুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতেছি। রাজগৃহে অবস্থিতি কালে ১৮৮২ সালে মহাভারত পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জীবনব্রত—

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন—প্রথম প্রতিভাত হয়। তিনি বুঝেন যে, মহাভারত অর্থে ভারত সাম্রাজ্য (Indian Empire)। সেই সাম্রাজ্য আবার ধর্ম্মসাম্রাজ্য। তাহার রাজার নাম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। উদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবু, তাহার পর কালীপ্রসন্ন বাবু, তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বৈদিক সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিশেষরূপে উদ্ভাসিত করিয়া, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এক মহা ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তিন জনেই ক্রমান্বয়ে অস্বীকার করিলে, নবীন বাবু আপনার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া, তিনখানি মহাকাব্যের (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) সূচনা করেন। পরে তিন খানি কাব্যের গল্লাংশের (Plot) খসড়া করিয়া রৈবতক লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রফুল্ল বাবু এ কথা শুনিয়া, মহাভারতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাব্য লিখিতে নিষেধ করিয়া, নবীন বাবুকে ১৮৮২ সালে তীব্র ভাষায় এক পত্র লিখেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কাব্যসূচনার খসড়া পড়িয়া ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে নবীন বাবুকে যে পত্র লিখেন, তাহার একাংশ উদ্ধৃত হইল।

"জয়দেবপুর, ঢাকা। ৬ই ডিসেম্বর। ৮২।

আমি আপনার কাব্যসূচনার এক খোষখৎ নকল করাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেইটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়াছি।

conception extraordinary grand (অত্যাশ্চর্য্য মহতী কল্পনা)। execution (চিত্রাঙ্কন) ঠিক তেমন হইবে কি না সে বিষয়ে সংশয় আছে। মহাভারতরূপ কাব্যসমুদ্রকে আবার সাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্দ্ধার কথা, পারিলে অসামান্য সুখের কথা। আমি গৌরব না বলিয়া সুখ বলিলাম। কারণ এখনকার দিনে বেনে ও মুদীর দোকানে যশঃ ও গৌরব খরিদ করিতে পারা যায়। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন কি? * * এই কাব্যের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিব কি? এতদিন বাঁচিব কি?"

নবীন বাবু কাব্য লিখিতেছেন শুনিয়া, বঙ্কিম বাবু তিন খানি কাব্যের সূচনা (plot) ও রৈবতকের যে কয় সর্গ লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সকল দেখিয়া ২০শে জানুয়ারী ১৮৮৩ সালে তিনি নবীন বাবুকে ইংরাজিতে যে পত্র লিখেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

JAJPUR, January, 20th, 1883.

"I return your manuscripts to-day in a registered parcel. I have read through them.

"You have planned a new Mahabharat indeed—an exceedingly ambitious work, the most ambitious perhaps since the days of Haribansa and Adhatmya Ramayana. It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided

you can execute it with same grandeur as you have planned, you will properly justify yourself. Properly executed the poem will of course take its rank as the greatest in the language.

"I warn you however not to be too confident of success. Of popularity I cannot promise you much. If executed adequately many will probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth Century—while others will take it to be a parody of the Mahabharat and I must assure you that an inadequate execution is likely to bring it down to the latter level."

"Lastly will your poem be historically and politically true? I have advised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned. But I am hardly bold to advise you to do so in the case of large national movements. Now I believe *it is not historically true either that Krisna set himself up against Brahmonical authority* (there was never a greater champion of it) or that the Brahmans ever coalesced with the Non-aryans, in order to put down the Kshatryas.

I must also tell you that the second canto (?) (কুরুক্ষেত্র) has struck me as being a sort of paren-

thesis between the other two—the main action being carried on by the first and third. The action in the second canto (?) is mainly the death of Abhimanyu and the only connection it has with the action of the peom is that it brings some personal misfortune to Krisna and Arjun. But the death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage—*the establishment of the empire;* and it is therefore only an episode. An episode ought not to take up one of the three cantos (?) to itself.

বঙ্কিম বাবুর এই পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

"আজ ডাকযোগে তোমার হস্তলিপি ফেরত পাঠাইলাম। আমি উহা সকল পড়িয়াছি, তুমি সত্য সত্যই এক অভিনব মহাভারত সূচনা করিয়াছ—অতি দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য—হরিবংশ ও অধ্যাত্মরামায়ণ রচনার পর বুঝি আর কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য্য করে নাই। দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া তাহার সূচনা অবৈধ, এ কথা নহে। সূচনা যেমন মহতী, যদি রচনা তাহার অনুরূপ হয়, তবে তোমার কার্য্য সর্ব্বথা সুসঙ্গত হইবে। যদি যথোচিত রচনা করিতে পার, তোমার কাব্য অবশ্যই ভাষার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

"কিন্তু সাবধান, কৃতকার্য্য হইবে, এ আশা বড় রাখিও না। আমার মতে, ইহাতে তোমার যশঃ অত্যল্পই হইবে। যদি রচনা

সুচারু হয়, অনেকে হয় ত উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিবেন, আবার অন্যে ইহাকে মহাভারতের রহস্যানুকরণ বলিয়া উপেক্ষা করিবে। রচনা অযথা হইলে ঐরূপই হইবার সম্ভাবনা। শেষ কথা, তোমার কাব্য কি ইতিহাস ও রাজ-নীতির অনুগত হইবে? আমি ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসের সহিত কার্য্য সম্পর্কহীন করিতে বলিয়াছি, কিন্তু ইতিহাসের বিপরীত করিতে বলিতে পারি না। কাব্যোক্ত চরিত্রচিত্রণে তাহাও করিতে পার। কিন্তু জাতীয় জীবনের ব্যাপক ঘটনাবলীর অপলাপ করিবার উপদেশ দিতে আমার ত সাহস কুলায় না।

আমার মতে কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিকূল করিয়া চিত্রিত করা ইতিহাসের অনুগত নহে। কৃষ্ণের মত আর কে ব্রাহ্মণ্যের এত পরিপোষক ছিল? আর ব্রাহ্মণেরা যে অনার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক নহে।

"আর এক কথা। আমার মনে হয় যে, তোমার সূচিত দ্বিতীয় কাব্য (কুরুক্ষেত্র) যেন প্রথম ও তৃতীয় কাব্যের একটা অবান্তর মাত্র। প্রথম ও তৃতীয় কাব্যেই প্রতিপাদ্য ঘটনা সংসাধিত হইতেছে। দেখ দ্বিতীয় কাব্যের প্রধান ঘটনা অভিমন্যুর মৃত্যু। প্রতিপাদ্য ঘটনার সহিত ইহার এইমাত্র সম্বন্ধ যে, ইহা দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন কিছু শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কাব্যের প্রতিপাদ্য ঘটনা বা দ্বিতীয় ঘটনা (সাম্রাজ্যস্থাপন)—ইহাদের কি বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতি-

কূলতা হইল ? অতএব ইহা কেবল উপগল্প মাত্র। উপগল্পে কি তিন ভাগের এক ভাগ নিয়োজিত করা উচিত ?"

উক্ত পত্রসহ রৈবতকের যে হস্তলিপি প্রত্যর্পিত হয়, তাহার প্রথম সর্গের শেষে বঙ্কিম বাবু এই মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"Remarks on Chapter I. Krisna preached, if he preached anything, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give a new character to Krisna which this chapter does."

ইহার ভাবার্থ এই—

"কৃষ্ণ কোনও মত প্রচার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। যদি কিছু করিয়া থাকেন, তবে সে ব্রাহ্মণভক্তি। তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিরোধীরূপে চিত্রিত করা, সর্ব্ববিধ জনপ্রবাদ ও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিপরীত। তবে অবশ্য আধুনিক কবি ইচ্ছামত কৃষ্ণের চরিত্র নূতন ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন। এ সর্গে তাহাই করা হইয়াছে।"

ঐরূপ দ্বিতীয় সর্গের শেষে মন্তব্যে, ঐ সর্গকে বড় ভাব ও বর্ণনা প্রধানদোষে দুষ্ট বলেন। আর তৃতীয় সর্গ অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করেন। সে সকল মন্তব্য অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হইল না।

নবীন বাবু ঐ সকল মন্তব্য পাঠে নিতান্ত নিরুৎসাহিত

হইয়া বঙ্কিম বাবুর ঐ সকল মতের নম্রভাবে প্রতিবাদ করিলে, তিনি তদুত্তরে ১৮৮৩ সালের ১৩ই মে তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখেন,—

"I do not quite understand why you should feel any diffidence in carrying on 'Raibatak.' My own plan is never to ask the opinion of others and as I have found by experience my interference in the way of advice or criticism has spoilt many a fine work * * Genius, even mere latent, must work out its conceptions."

ইহার ভাবার্থ,—

"তুমি রৈবতক লিখিয়া শেষ করিতে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছ, বুঝিতে পারি না! আমার নিয়ম এই, আমি স্বরচনার পক্ষে পরের মতামতের অপেক্ষা রাখি না। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, আমার উপদেশ বা সমালোচনায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। প্রতিভা, প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ও আপন মৌলিক কল্পনা আপনার মতে প্রকটিত করিবে!"

তাহাই হইল। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা আপন মৌলিক কল্পনা আপনার মতেই প্রকটিত করিল। তাহার ফল রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র। আমরা বঙ্কিম বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ঐ মৌলিক কল্পনা কি। প্রথম, কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবমত প্রচার। ইহাকেই আমি রৈবতকের সমালোচনায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়াছি। বঙ্কিম বাবু ইহার নাম দিয়াছেন, গীতোক্ত ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়, ক্ষত্রিয়শক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও অনার্য্যশক্তির মিলন।
তৃতীয়, ভারতসাম্রাজ্যসংস্থাপন।

রৈবতক ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ঈশান বাবু তাহার প্রুফ দেখিবার ভার লয়েন। সম্পূর্ণ কাব্যের হস্তলিপিও ঈশান বাবু পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে, 'প্রচার' পত্রে বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

শুনিয়াছি, ঈশানবাবু রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষ কার্য্যাবলীর অপলাপে আপত্তি প্রকাশ করিলে, নবীন বাবু, নবপ্রচারিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুও ঐ প্রণালীর অনু-মোদন করিয়াছেন বলিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু ঈশান বাবু তখন ধর্ম্মসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর নজির গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করেন।

আর সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই। বোধ হয়, পাঠক আমার সহিত একমত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহা অনুমাত্র মিথ্যা বা কল্পিত নহে। আমাদের সৌভাগ্যের ফলে বঙ্কিম বাবু, নবীন বাবু, ঈশান বাবু, প্রফুল্ল বাবু এবং কালীপ্রসন্ন বাবু সকলেই জীবিত আছেন। যদিও কোথাও ভ্রম বা অনবধানক্রমে সত্যের অপলাপ ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা কৃপা করিয়া তাহার সংশোধন করিবেন।

এখন পাঠক কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করুন।

'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, ১৮৮৪.

সালে। আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত কালীপ্রসন্ন বাবুর ও বঙ্কিম বাবুর পত্রে দেখি যে, ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে নবীন বাবু রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এই কাব্যত্রয়ের সূচনা করিয়াছেন। আরও দেখি যে, ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে রৈবতকের অন্যূন তিন সর্গ লিখিত হইয়াছে। আরও দেখি যে, ঐ কাব্য-ত্রয়ের মৌলিক কল্পনা শ্রীকৃষ্ণের নবধর্ম্মপ্রচার ও ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন এবং ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের মিলিত শক্তির সংঘর্ষ। আরও দেখি যে, ইহাকেই কালীপ্রসন্ন বাবু অতি মহতী কল্পনা এবং বঙ্কিম বাবু প্রতিভার প্রচ্ছন্ন সূচনা বলিয়াছিলেন। আমরা আরও দেখি যে, 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র রৈবতক লিখিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত ছিল। কালের পৌর্ব্বাপর্য্য সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্যূন দুই বৎসর পূর্ব্বে সূচিত রৈবতক কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা কি প্রকারে কৃষ্ণচরিত্রের অনুকরণ হইতে পারে? কিরূপেই বা নবীন বাবু ইহার জন্য বঙ্কিম বাবুর কাছে সম্পূর্ণ ঋণী হইতে পারেন। যে শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলার আন্দোলনে আজ বঙ্গদেশ তরঙ্গায়িত, ১৮৮২ সালে ত তাহার প্রসঙ্গমাত্রও ছিল না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যে মৌলিক কল্পনার অবলম্বনে নবীন বাবু কাব্য রচনা করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু প্রথমে তাহার অনুমোদন করেন নাই। কৃষ্ণচরিত্র ঐরূপ ভাবে চিত্রিত করা তিনি শ্রীকৃষ্ণে নূতন চরিত্র আরোপ করা (giving a "new

character) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, তখন উহা জনবাদ ও গ্রন্থাদির সর্ব্বথা বিপরীত বোধ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। ("কৃষ্ণ কোনও ধর্ম্মই প্রচার করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন, তবে সে ব্রাহ্মণভক্তি। ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত মিলিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণশক্তির সংঘর্ষ, ইতিহাসের অননুগত" ইত্যাদি)।

ইহার পর বোধ হয়, কেহই নব্যভারতের মত 'নবীন বাবু মৌলিক কল্পনায় সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুর কাছে ঋণী' এ কথা বলিবেন না। শেষ কথা। যদি মৌলিক কল্পনা নবীন বাবুরই নিজস্ব হইল, তিনি যদি বঙ্কিম বাবুর কাছে এ বিষয়ে আদৌ ঋণী না হইলেন, তবে জিজ্ঞাস্য, ঐ কল্পনা ইতিহাসের অনুগত কি না? এ কথার মীমাংসার স্থল এ নহে। কৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এখন পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও অনার্য্যশক্তির সংঘর্ষ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু সংপ্রতি কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নবীন বাবুর পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে কয়েকটী ঘটনার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীকৃষ্ণের অনার্য্যহস্তে অপমৃত্যু এবং ঋষিদিগের অভিশাপে যদুবংশধ্বংস। তাহার অব্যবহিত পরে অনার্য্য কর্ত্তৃক যাদবপুরী ও যদুপত্নী লুণ্ঠন। নাগকর্ত্তৃক (১) পরীক্ষিতের অকালমরণ, জন্মেজয়ের

(১) নাগ সর্প নহে। অনার্য্য নাগজাতি অদ্যাপি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান।

সর্পযজ্ঞ, জরৎকারু ঋষির নাগরাজভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ এবং তাহার গর্ভজাত আস্তিক ঋষির সর্পসত্রে নাগজাতির জীবন-রক্ষা; ইত্যাদি ঘটনার অর্থ কি? অবশ্য যাঁহাদের কাছে মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কল্পনা কাব্য মাত্র, তাঁহাদের প্রবল ঐতিহাসিক তোপের সম্মুখে এ সকল ঘটনা তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারিবে না। কিন্তু অন্যের পক্ষে এ সকল গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধানের সামগ্রী।

অতএব, নব্যভারত যে দুই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নবীন বাবুর নিজস্ব—ইহাতে তিনি মধুসূদন ও হেম-চন্দ্রের অগ্রে হউন বা পশ্চাতে হউন, তিনি কাহারও কাছে অণুমাত্র ঋণী নহেন। তাঁহার ঋণ কেবল কবিপ্রতিভার নিকট। এই জন্যই আমি রৈবতকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম যে, 'কবি প্রতিভার আলোকে ভূর্ত ইতিহাসের অন্ধকার ছায়া আলোকিত করেন। অদ্ভূত প্রতিভাবলে পুরাতত্ত্ববিদের বহু গবেষণায় আবিষ্কৃত ইতিহাস ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।' নবীন বাবু হয় ত এ কথা মানিবেন না। তিনি বলিবেন,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"
(রৈবতকের মুখপত্র)।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বিদায়।

"উত্তরে! উত্তরে! কই অভিমন্যু কই!"—
উত্তরার শিবিরেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সুলোচনা
আসি উন্মাদিনী প্রায় কহে স্নেহময়ী—
"উত্তরে! উত্তরে। কই, অভিমন্যু কই?
শুনিয়াছি মহা-রণ করিতেছে দ্রোণ আজি,
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার,
কই অভিমন্যু কই, উত্তরে! আমার?"
ধরিয়া সখীর গলা কাঁদিয়া বিরাটবালা
কহে—"ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন,
গিয়াছেন তথা; কিছু নাহি জানি আর;
কাঁদিতেছে প্রাণ মা গো! তোর উত্তরার।
গত নিশি চন্দ্র পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইনু নিদ্রিতা যবে, দেখিনু স্বপন
ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দ্দুল ভীষণ।
দাঁড়াইয়া দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
পরাজিল সপ্ত শত্রু অপূর্ব্ব কৌশলে।
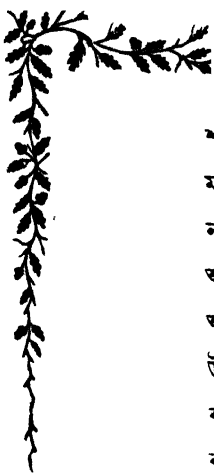
শশাঙ্ক হইতে ধীরে নর-নারায়ণ,
মনোহর পুষ্পরথে করি আরোহণ,
নামিলেন ; নিরমল রথ জ্যোৎস্নায়
আলোকিল রণক্ষেত্র অমৃত ধারায়।
অভিরে তুলিয়া রথে লইয়া আদরে ;
উঠিতে লাগিল রথ আকাশে মন্থরে।
কহিলাম,—'দয়াময়! লও উত্তরায়।'
করুণ নয়নে চাহি কহিলেন হায়!
জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দর দর—
'না, না, বৎসে! যাবে তুমি বৎসর অন্তর!'
কহিনু—'না, প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি ; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!'
জয়নাদে পূর্ণ হ'ল পৃথিবী গগন।
নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি তারাগণ।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়!
এ কি স্বপ্ন মা গো! অভি গেল মা! কোথায়?"
বাপ তোর পোড়া মুখ, স্বপ্ন পোড়া ছাই
মুণ্ড তারে, সাত বাঘ সগোষ্ঠী বিরাট।
ননীচোরা চুরি করি আনিল বাছায়
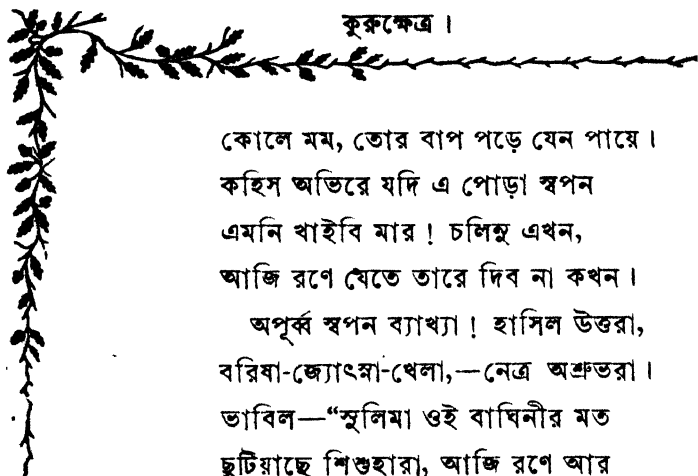
কোলে মম, তোর বাপ পড়ে যেন পায়ে।
কহিস অভিরে যদি এ পোড়া স্বপন
এমনি খাইবি মার! চলিনু এখন,
আজি রণে যেতে তারে দিব না কখন।
অপূর্ব্ব স্বপন ব্যাখ্যা! হাসিল উত্তরা,
বরিষা-জ্যোৎস্না-খেলা,—নেত্রে অশ্রুভরা।
ভাবিল—"সুলিমা ওই বাঘিনীর মত
ছুটিয়াছে শিশুহারা, আজি রণে আর
পারিবে না যেতে, আর কি ভয় আমার?
কেনই বা এত ভয় হয় আজি মনে,
থেকে থেকে কাঁপে বুক কেন অকারণে?
গোবিন্দ মাতুল যার, সুভদ্রা জননী,
পিতা ধনঞ্জয়, নিজে বীরেন্দ্র আপনি
রথি-শ্রেষ্ঠ—মহারথী, সে যাইবে রণে,
তাতে কেন এত ভয় হবে মম মনে?
হাসি মুখে নিত্য যায়, নিত্য করে রণ,
রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ।
আমিই কি ডরি রণে? নহি কি ক্ষত্রিয়া।
বিরাট-তনয়া আমি অভিমন্যু-প্রিয়া?
অর্জ্জুনের শিষ্যা আমি, সেই নাট্য ঘরে
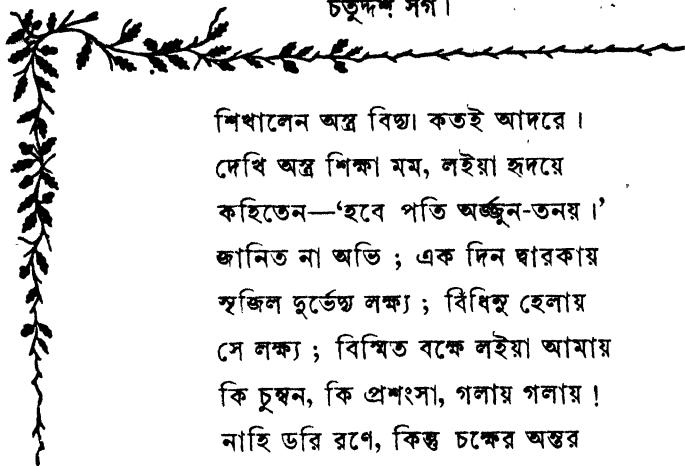
শিখালেন অস্ত্র বিদ্যা কতই আদরে।
দেখি অস্ত্র শিক্ষা মম, লইয়া হৃদয়ে
কহিতেন—'হবে পতি অর্জ্জুন-তনয়।'
জানিত না অভি ; এক দিন দ্বারকায়
সৃজিল দুর্ভেদ্য লক্ষ্য ; বিঁধিনু হেলায়
সে লক্ষ্য ; বিস্মিত বক্ষে লইয়া আমায়
কি চুম্বন, কি প্রশংসা, গলায় গলায় !
নাহি ডরি রণে, কিন্তু চক্ষের অন্তর
হইলে মুহূর্ত্ত, প্রাণ কাঁপে থর থর।
এত রূপ, এত গুণ, পারিজাত হার
মিলিয়াছে মম ভাগ্যে, প্রত্যয় আমার
নাহি হয় পোড়া মনে। জাগ্রতে নিদ্রায়
হারালেম, হারালেম,—ভয় হয় মনে।
ইচ্ছা করে, রাখি সদা নয়নে নয়নে,
মিশাইয়া বুকে বুকে জীবনে জীবনে।
কেন এত ভালবাসি, কেন তাঁর তরে
প্রাণ মম নিরন্তর এইরূপ করে ?
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, শাশুড়ী, শ্বশুর,
কারো তরে প্রাণ নাহি করে এত দূর।
ইচ্ছা করে চিরি বুক বুকের ভিতর
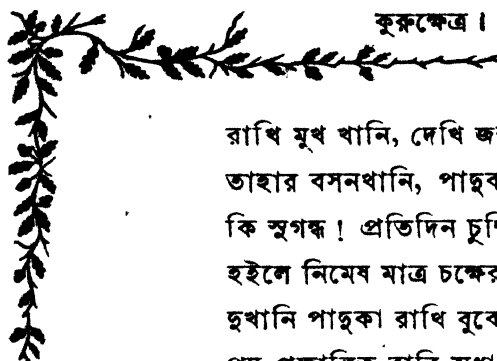
রাখি মুখ খানি, দেখি জন্ম জন্মান্তর।
তাহার বসনখানি, পাদুকা তাহার,
কি সুগন্ধ! প্রতিদিন চুম্বি কতবার!
হইলে নিমেষ মাত্র চক্ষের অন্তর,
দুখানি পাদুকা রাখি বুকের উপর।
পদ-প্রক্ষালিত বারি-সুধা করি পান,
প্রাণের পিপাসা মম করি নিরবাণ।
কি যে করিতেছে প্রাণ! আজি কদাচিৎ
যাইতে দিব না রণে? এ কথা নিশ্চিত।
কিন্তু এ বিলম্ব কেন?" পতি সঙ্গহীনা
বন-বিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা
ছট্ ফট্, শিবিরেতে উঠিয়া বসিয়া।
এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া।
গাইতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর।
এত যত্ন তবু বীণা বাজিছে বেসুর।
আধার বাঁধিতে বীণা ছিঁড়ে গেল তার।
দূরে নিক্ষেপিয়া যন্ত্র, খুলিল ভাণ্ডার
পুতুলের,—ও কি দ্বারে অস্ত্র-ঝনৎকার!
বাজিল সে শব্দ বেগে প্রাণে উত্তরার।
যুদ্ধ বেশে অভিমন্যু,—মস্তকে উষ্ণীষ,
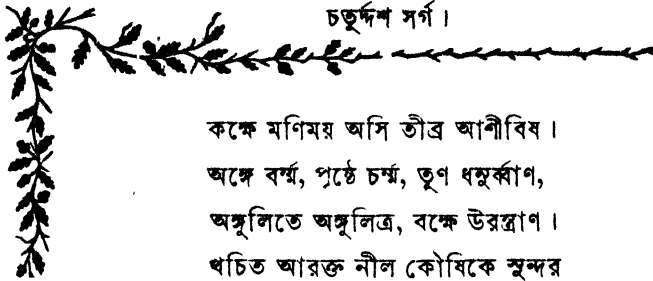
কক্ষে মণিময় অসি তীব্র আশীবিষ।
অঙ্গে বর্ম্ম, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, তূণ ধনুর্ব্বাণ,
অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, বক্ষে উরস্ত্রাণ।
খচিত আরক্ত নীল কৌষিকে সুন্দর
সমাবৃত দীর্ঘায়ত হেম কলেবর,—
মেঘাবৃত হিমাদ্রির কাঞ্চন শেখর।
মুহূর্ত্ত উভয় পানে চাহে আত্মহারা,—
কৃষ্ণ-দ্বাদশীর চন্দ্র চাহি সুখতারা।
চিন্তার ঈষৎ মেঘে বদনে যুবার
করিয়াছে অনুপম গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
গেল সেই মেঘছায়া নিমিষে সরিয়া,
হাসির জ্যোৎস্না মুখে উঠিল ভাসিয়া।

অভি। উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!
ষোড়শ বৎসর মম ; সেনাপতি-পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্ব্বাদ, গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার।
দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার,
কোন্ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্ ক্ষত্রিয়ার?
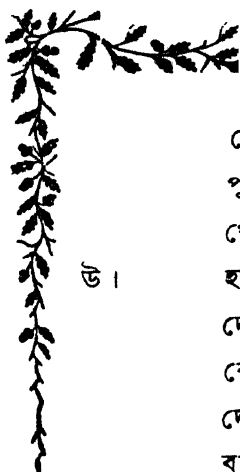
দে বিদায় হাসি মুখে! খেল্ ততক্ষণ
পুতুল লইয়া তোর; পুতুলের সনে
খেলিয়া আমার খেলা আসিব এখন।

উ। হইবে বিবাহ আজি কন্যার আমার।
দেখ দেখি মেয়ে মম সুন্দরী কেমন!
কেমন সোণার নাক, রূপার নয়ন!
দেখ স্বয়ম্বর-সভা! রাজা অগণন
বসিয়াছে চারি দিকে। বর কর্ত্তা তুমি,
তুমি গেলে, কে করিবে বর-অভ্যর্থনা?
বিয়া ফেলি পাত্রী তবে যুড়িবে ক্রন্দন।
কাঁদ পোড়ামুখী।—

কন্যা কাঁদিতে লাগিল
"পিঁ পিঁ" রবে, অভিমন্যু হাসিয়া আকুল।

অভি। থাকিতে এমন বর,—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়,
কাঁদিতে বরের তরে হইবে না তোর
দুহিতার। যুদ্ধ-অন্তে সায়াহ্নে পূরণ
হবে স্বয়ম্বর-সভা; বিদায় এখন।

ছুটি বিজলীর বেগে, শিবিরের দ্বার
রুদ্ধ করি দাঁড়াইল বালা আচম্বিত,
রুদ্ধ কবাটেতে পৃষ্ঠ করিয়া স্থাপিত।
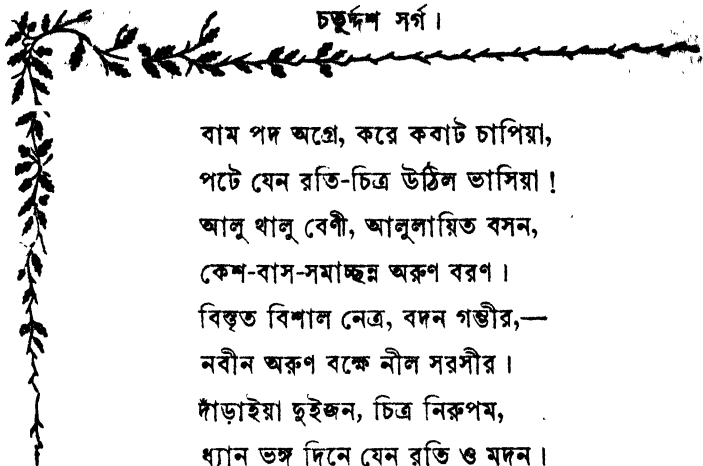
বাম পদ অগ্রে, করে কবাট চাপিয়া,
পটে যেন রতি-চিত্র উঠিল ভাসিয়া!
আলু থালু বেণী, আলুলায়িত বসন,
কেশ-বাস-সমাচ্ছন্ন অরুণ বরণ।
বিস্তৃত বিশাল নেত্র, বদন গম্ভীর,—
নবীন অরুণ বক্ষে নীল সরসীর।
দাঁড়াইয়া দুইজন, চিত্র নিরুপম,
ধ্যান ভঙ্গ দিনে যেন রতি ও মদন।

উ। না, না, নাথ! আজি রণে যাইতে কখন
দিবে না উত্তরা তার থাকিতে জীবন।
যাবে যদি, ওই বর্শা,
হান উত্তরার বক্ষে!
পড়িবে উত্তরা তব চুম্বিয়া চরণ,
লঙ্ঘি মৃত দেহ তার করিও গমন।

অভি। প্রাণাধিকে! একি কথা! বীরের দুহিতা,
বীরের বনিতা তুমি, এই কাতরতা
সাজে কি তোমার, পুত্রবধূ অর্জ্জুনের?
ষড়যন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক সনে
করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিয়োজিত
ঘোরতর একদিকে; অস্ত্রগুরু দ্রোণ
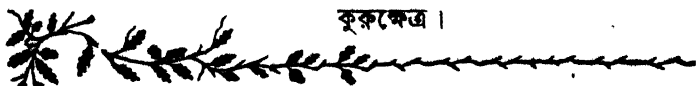
অন্য দিকে চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ
করিছেন মহারণ। শুন হাহাকার
করিছে পাণ্ডব সৈন্য। সঙ্কট ভীষণ,
দেখিয়া পাণ্ডব-পতি করিলা বরণ
এই দাসে; আজি আমি না করিলে রণ,
ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি করিবেন দ্রোণ।

উ। এখনও পাণ্ডব পক্ষে আছে অগণন
রথী মহারথী।

অ। আছে,—দ্রোণের বিক্রম
না জান বালিকা তুমি। প্রতিজ্ঞা তাঁহার
শুন নাহি তুমি,—নাহি থাকে ধনঞ্জয়
করিবেন ধর্ম্মরাজে গ্রহণ নিশ্চয়।
ইন্দ্রোপম পিতা বিনা কেহ নাহি আর
পরাভবে দ্রোণে,—দ্রোণ সমরে দুর্ব্বার।

উ। করিবে কেমনে তুমি পরাভব তাঁরে?

অ। অভিমন্যু আমি, আমি অর্জ্জুনকুমার।

বাম করে শেল, অসি করি নিষ্কোষিত
অন্য করে, শিবিরের চারু গালিচায়
অসি অগ্রে চক্রব্যূহ করিয়া অঙ্কিত

চতুর্দ্দশ সর্গ
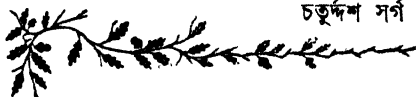
দেখাইলা,—বীর বক্ষ উৎসাহে পূরিত,—
কোন্ রূপে চক্রব্যূহ করিয়া ছেদন
পশিবেন দ্রোণ সৈন্যে। আনত বদন,
উত্তরা চাহিয়া আছে জন্মের মতন।
ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে কেমনে
অমঙ্গল অশ্রুবারি আসিছে নয়নে।
তুলি মুখ অভিমন্যু কহিলা হাসিয়া,—
"এইরূপে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,
লঙ্ঘে যথা সিংহ-শিশু ব্যাধের বন্ধন।
কিম্বা লঙ্ঘি অবরোধ মেষপালকের
পশে যথা মেষপালে কেশরি-কুমার,
প্রবেশিব কুরু-সৈন্যে। দেখিবেন দ্রোণ
আজি রণে অগ্নি-শিশু অগ্নি-পরাক্রম।
দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভুজ বিশাল
অর্জ্জুনের, অর্জ্জুনের এই বক্ষ মম,
প্রদীপ্ত পার্থের বীর্য্যে শোণিত আমার।
এ ধনু গাণ্ডীব শিশু, এ তূণীর মম
অক্ষয় তূণীর-পুত্র, পূর্ণ বজ্র জালে,—
অর্জ্জুনের অস্ত্র-শিশু, বিষধর-শিশু
পিতৃসম তীব্র বিষধর। দেখিবেন দ্রোণ
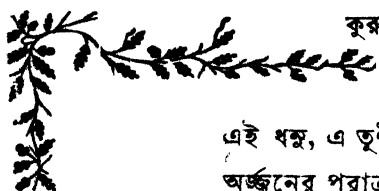
এই ধনু, এ তূণীর, এই শরজাল,
অর্জ্জুনের পরাক্রম অরাতির কাণে
পারে কহিবারে বজ্র নির্ঘোষে ভীষণ ;
পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষরে
অরাতির বুকে। নাহি থাকুন অর্জ্জুন,
দেখিবেন দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুনকুমার
করিবে বিফল আজি প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
তুচ্ছ এক মহারথী, মহারথী দশ
হয় যদি হত আজি, তথাপিও দ্রোণ
ধর্ম্মরাজ কেশাগ্রও ছুঁইতে কখন
নাহি পারিবেন। প্রিয়ে! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ
একে একে আজি রণে করি পরাজিত,
রাখিব ক্ষত্রিয় কুলে কীর্ত্তি অতুলিত।
কিন্তু সাতজনে যদি করে আক্রমণ ?
অভিমন্যু উচ্চ হাসি উঠিলা হাসিয়া—
"এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ; জাতিতে কেশরী
ক্ষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগালের
নহে কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের। আসে সপ্ত জন,
আসে সপ্তদশ জন,—কি ভয় উত্তরে ?
একা সিংহ নাহি ডরে শিবা অগণন।"
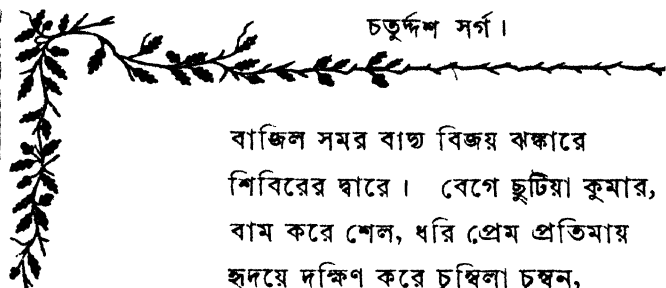
বাজিল সমর বাদ্য বিজয় ঝঙ্কারে
শিবিরের দ্বারে। বেগে ছুটিয়া কুমার,
বাম করে শেল, ধরি প্রেম প্রতিমায়
হৃদয়ে দক্ষিণ করে চুম্বিলা চুম্বন,
প্রভাতে নলিনী যেন চুম্বিলা অরুণ।
মুহূর্ত্তের সে চুম্বনে কি অনন্ত ভরা!
কি অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নীরব-মুখরা!
কি অনন্ত সুখ দুঃখ, কি অনন্ত ভাষা!
কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা!
দুই হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র সম্মিলন,
দুই সমুদ্রের ক্ষুদ্র অনন্ত সঙ্গম।
সেই ক্ষুদ্র পথে কিবা উচ্ছ্বাস অপার,
উভয়ে উভয় প্রাণে করিছে সঞ্চার।
ঊর্দ্ধ মুখে অধোমুখ—শোভিছে কেমন,
চন্দ্র জলধির যেন শেষ দরশন
পূর্ণিমা উষায়! ধীরে ধীরে উত্তরায়
সরাইয়া অভিমন্যু, যথা জ্যোৎস্নায়
সরায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ পূর্ণিমা প্রভাতে,
খুলিল শিবির দ্বার ছুটিলা কুমার,
ছিঁড়িয়া অজ্ঞাতে কণ্ঠহার উত্তরার
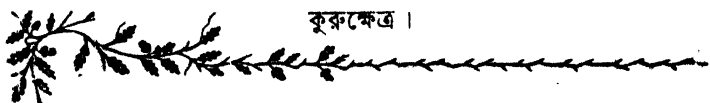
শেলাঘাতে। বজ্রাঘাতে বুক উত্তরার
হইল চূর্ণিত, বামা রহিল চাহিয়া
বজ্রাহত মত স্থিরা শূন্য নিরখিয়া।

সংশপ্তক যুদ্ধে গত বীরেন্দ্র ফাল্গুনি,—
ধ্যানস্থা সুভদ্রা মাতা বসিয়া পূজায়
পতির মঙ্গল ব্রতে। পশিয়া কুমার
সবেগে শিবিরে, স্থির রহিলা চাহিয়া
মুহূর্ত্ত মায়ের মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।
দ্বারে রণ-বাদ্য, কক্ষে অস্ত্র-ঝনৎকার,—
ভাঙ্গিল ভদ্রার ধ্যান। রাখিয়া উষ্ণীষ
মায়ের চরণ তলে, প্রণমি কুমার
কহিলা,—"মা! দ্রোণাচার্য্য ঘোরতর রণ
করিছেন চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ।
পিতার অবিদ্যমানে, সেনাপতি পদে
ধর্ম্মরাজ এই দাসে করিলা বরণ।
দেও মা! বিদায় রণে, কর আশীর্ব্বাদ,
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অর্জ্জুনের পুত্র আমি সুভদ্রা-নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য। স্বধর্ম্ম পালন
করি, ধর্ম্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন।"

চতুর্দ্দশ সর্গ।

গিয়াছেন পতি, পুত্র যাইছে, সমরে
দুর্জ্জয় সঙ্কট পূর্ণ ; জাগিছে হৃদয়ে
শৈলজার প্রতিষেধ, অমঙ্গল ছায়া,
স্থির সরোবর বক্ষে ছায়া জলদের,—
তথাপি একটী রেখা মুখে রূপান্তর
হইল না সুভদ্রার। রহিলা চাহিয়া
প্রাণাধিক পুত্র পানে স্নেহ ছল ছল,
স্বর্ণ-দেবী-প্রতিমার মত অবিচল।

সুভ। বুঝিলাম হইয়াছে পাণ্ডব বাহিনী,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা, যেন বিপন্না তরণী
সিন্ধুগর্ভে ঝটিকায় নাবিক-বিহীনা।
হইয়াছে পাণ্ডবের মহা সৈন্য হায়!
যেন মহারথ রথি-সারথি বিহীন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, শিষ্য প্রিয়তম,
অর্জ্জুনের পুত্র তুই, নিজে মহারথী,
নির্ভয়ে ধরিয়া কর্ণ, আরোহিয়া রথে,
হেলায় সমর সিন্ধু করি অতিক্রম,
আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার!
নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন
তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ,
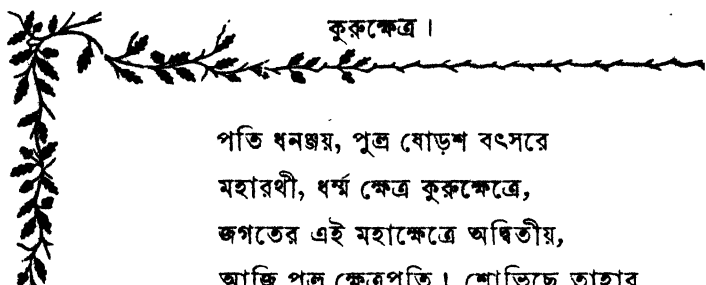
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী, ধর্ম্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,
জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি! শোভিছে তাহার
গলার বরণ মালা, ললাটে তিলক!
আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
বীর-জননীর বক্ষে; বহিতে লাগিল
জীবন্ত উৎসাহ ধারা শক্তি সঞ্চারিণী
পুত্রের হৃদয়ে, পুত্র হইল বিহ্বল।
পুষ্পপাত্র হ'তে ল'য়ে চারু পুষ্পহার
দিলা কুমারের গলে সস্মিত বদন।
কুমার মায়ের বুকে রাখিয়া বদন
রহিলা নীরবে, মাতা নীরব সজল,
কি উচ্চ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হৃদয় যুগল!

সুভ। পিতৃ গুরু দ্রোণ, অতি সাবধানে
বাছা রে! করিস্ রণ।
না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।
করি আশীর্ব্বাদ,— সুভদ্রার বুক
হইবে কবচ তোর;

সুভদ্রার অঙ্ক হবে তোর রথ ;
শত্রু শরজাল ঘোর
হবে সুকুমার যেন সুভদ্রার
স্নেহমাখা পুষ্পহার ;
হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অর্জ্জুন,
লক্ষ্য নর-সমুদ্ধার।
সমর প্রাঙ্গণ সয়ম্বর সভা
হইবে, যাদু আমার !
জয় লক্ষ্মী আজি হইবে সপত্নী
মম বধূ উত্তরার।
চুম্বিলা ললাট আবার আবার

আদরে লইয়া বুকে ;
কি করিছে হায় ! মায়ের পরাণ
চিহ্ন তার নাহি মুখে।
মায়ের চরণে প্রণমি কুমার,
চলিল সমরে সুখে ;—
শিরায় শিরায় কি অজেয় বল,
কি বীর্য্য জ্বলিছে বুকে !

"সুভদ্রে! সুভদ্রে! কই? মম বাছা কই?"
পাণ্ডব শিবির খুঁজি, খুঁজি অস্ত্রাগার,
সত্রাসে শিবির পুনঃ খুঁজি উত্তরার,
উন্মাদিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি সুলোচনা
ধরিল কুমারে, অস্ত্রে পড়িল ঝননা।
কহে গলা জড়াইয়া ধরি সুলোচনা,—
"কোথায় যাবি রে যাদু!"
"যাব না কোথায়"—
চাপিয়া কণ্ঠের বাষ্প, অশ্রু নয়নের,
কহে অভিমন্যু—"আমি যাব না কোথায়!
তোরে ছেড়ে কোথাও কি পারি মা! যাইতে?
তোরে ছেড়ে যাই যদি, স্বর্গেও আমার
হইবে না সুখ, স্বর্গ কোথা আছে আর?
তোর মুখ, তোর বুক, স্বর্গ যে আমার।"

সুলো। তবে কেন রণ বেশ?

অভি। চাহি একবার
দেখাইতে দ্রোণাচার্য্যে স্তম্ভে সুলিমার
কত শক্তি, কত শক্তি শরীরে সরে তার।

সুলো। না না, আজি রণে আমি প্রাণান্তে কখন
দিব না যাইতে তোরে। যাবি যদি আগে
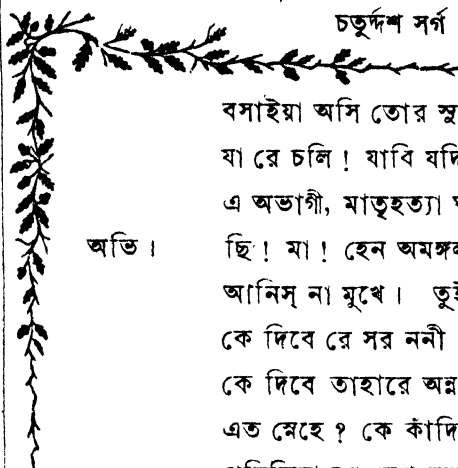
বসাইয়া অসি তোর স্নুলিমার বুকে
যা রে চলি! যাবি যদি মরিবে নিশ্চয়
এ অভাগী, মাতৃহত্যা ঘটিবে রে তোর।

অভি। ছি! মা! হেন অমঙ্গল কথা কদাচিত
আনিস্ না মুখে। তুই গেলে মা ছাড়িয়া,
কে দিবে রে সর ননী অভিরে মা! তোর?
কে দিবে তাহারে অন্ন? কে পূষিবে তারে
এত স্নেহে? কে কাঁদিবে যুদ্ধযাত্রাকালে
পবিত্রিয়া রণ-বেশ নয়নের জলে,
শত্রু-শরজাল যেন না পারে ছুঁইতে?
গলার বরণ মালা, ললাটে তিলক,—
দেখ্ মা নয়ন ভরি; কি গৌরব তোর,
পাণ্ডব সৈন্যের আজি সেনাপতি আমি!
কি গৌরবে আজি মম অসি সমুজ্জ্বল!
না যাই সমরে যদি, কি কলঙ্ক মা গো
রটিবে আচন্দ্র সূর্য্য! সহিবি কেমনে?
অভিমন্যু পুত্র তোর সহিবে কেমনে?

স্নুলো। আমার এ বালসূর্য্যে কার সাধ্য করে
কলঙ্কের কালিমা অর্পণ?
সহস্র কলঙ্ক যদি হয় তোর, হবে তাহা
অভাগীর অঙ্গের ভূষণ।
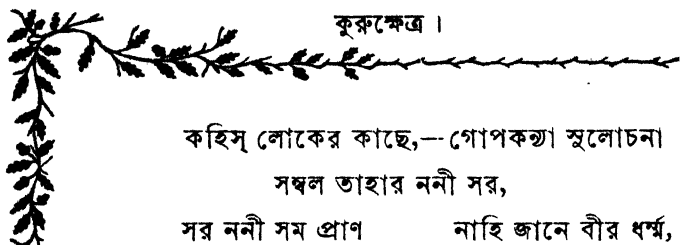
কহিস্ লোকের কাছে,—গোপকন্যা সুলোচনা
সম্বল তাহার ননী সর,
সর ননী সম প্রাণ নাহি জানে বীর ধর্ম্ম,
নাহি দিল করিতে সমর ।
যাক্ তার পোড়া মুখ আরো পুড়ি, তবু তুই
থাক বুক অঙ্ক যুড়ি তার ।
কলঙ্ক-ভঞ্জন কৃষ্ণ দিলা যারে পদ-ছায়া,
কলঙ্কে মা ! কি ভয় তাহার ?
আছে দেবী সুভদ্রার দেব পতি, দেব ভ্রাতা,
কর্ম্মক্ষেত্রে অনন্ত সংসার ।
সুলোচনা দুঃখিনীর কে আছে, কি আছে আর ?
একা তুই সর্ব্বস্ব তাহার ।
তুই ধর্ম্ম, তুই কর্ম্ম, তুই প্রাণ, তুই মর্ম্ম,
তুই অবলম্বন আমার ।
তোর চন্দ্রমুখ স্বর্গ, তোর গৃহ কর্ম্মক্ষেত্র,
তুই মম সকল সংসার ।
আজন্ম অনাথা আমি, জানি কৃষ্ণার্জ্জুন স্বামী,
সত্যভামা সুভদ্রা রুক্মিণী
আমার ভগিনী তিন, তুই এক মাত্র পুত্র,
আমি তোর যশোদা জননী ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।
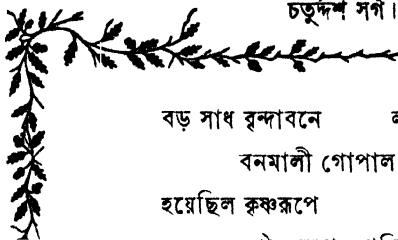
বড় সাধ বৃন্দাবনে ল'য়ে তোরে সাজাইব
বনমালী গোপাল আমার ;
হয়েছিল কৃষ্ণরূপে বিমোহিত বৃন্দাবন,
গৌর রূপে মোহিব আবার।
কৃষ্ণ হারা বৃন্দাবন কাঁদিতেছে নিরন্তর,
গৌর রূপে উচ্ছ্বসিত প্রাণ
হাসিবেক স্বর্গ হাসি, কালিন্দী হইয়া গৌরী
মন সুখে বহিবে উজান।
না, না, হৃদয়ের নিধি! চিরি অভাগীর বুক
আজি রণে যাইতে কখন
দিব না দিব না তোরে, না জানি আমার প্রাণ
আজি কেন করিছে এমন!

অভি। কেন মা নিত্য ত রণে যাইতেছি, কোন দিন
করিস্ নি এমন বারণ?

সুলো। ছিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিবারে রণ ক্ষেত্রে
অভাগীর শাবক রক্ষণ।
তাহাতে দ্রোণের আজি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
দুর্ব্বিজয় চক্রব্যূহ, দুর্ণিবার রণ!—
আজি রণে যেতে তোরে দিব না কখন।
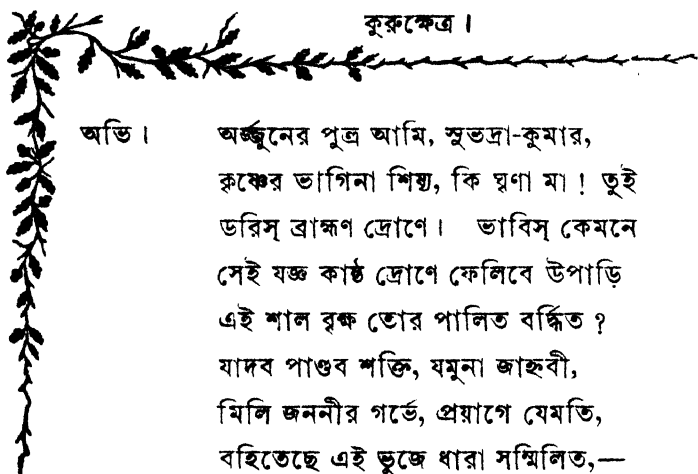
অভি। অর্জ্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা-কুমার,
কৃষ্ণের ভাগিনা শিষ্য, কি ঘৃণা মা! তুই
ডরিস্ ব্রাহ্মণ দ্রোণে। ভাবিস্ কেমনে
সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্রোণে ফেলিবে উপাড়ি
এই শাল বৃক্ষ তোর পালিত বর্দ্ধিত?
যাদব পাণ্ডব শক্তি, যমুনা জাহ্নবী,
মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি,
বহিতেছে এই ভুজে ধারা সম্মিলিত,—
দ্রোণের কি সাধ্য, গতি রোধিবে তাহার?
একা পার্থে, একা কৃষ্ণে, ডরে বৃদ্ধ দ্রোণ;
একাধারে কৃষ্ণার্জ্জুন দেখিবেন আজি।
দেখিবেন পার্থ রথী, গোবিন্দ সারথী;
একাধারে মম রথে; এই ভুজে মম
দুর্জ্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের।
তুচ্ছ দ্রোণ; বিশ্বজয়ী পিতা ও মাতুল
আসেন সমরে যদি, নাহি ডরি আমি।
একা পার্থ, একা কৃষ্ণ, পারে জিনিবারে
ত্রিভুবন এক রথে, কে সহিবে তবে
কৃষ্ণ-পার্থ-সম্মিলিত পরাক্রম মম?
তুচ্ছ চক্রব্যূহ, ওই বালির বন্ধন,

উড়াইয়া মুহূর্ত্তে মা! সিন্ধু-পরাক্রমে
প্রবেশিব দ্রোণ-সৈন্যে মহা সিন্ধু বেগে
উদ্বেলিত, ভাসাইয়া বালি তৃণ মত
অরাতির অনীকিনী, রথী, মহারথী,
দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য। করিব না আমি
পিতার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ, বধিয়া পরাণে।
মরণ অধিক যুদ্ধে হইয়া লাঞ্ছিত
পলাইবে দাঁতে তৃণ লইয়া কেমনে,
শুনিয়া হাসিবি তুই, হাসিবে জগত;
অনন্ত কালের স্রোত বহিবে সে হাসি।
ওই শুন্! ওই শুন্! ওই সিংহনাদ
কৌরবের, পাণ্ডবের ওই হাহাকার!
ছেড়ে দে মা! ছেড়ে দে মা!

ঘোর হাহাকার
উঠিল পাণ্ডব সৈন্যে,—"কুমার! কুমার!
হায়! হায়! আজি দ্রোণ করিবে সংহার
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য।" নক্ষত্রের বেগে
ছাড়াইয়া ধাত্রী-কর ছুটিলা কুমার,
বাজিল সমর-বাদ্যে বিজয় ঝঙ্কার।

স্থলোচনা ভূমিতলে হইল পতিতা
বন্ধনবিহীনা স্বর্ণ-প্রতিমা, মূর্চ্ছিতা।
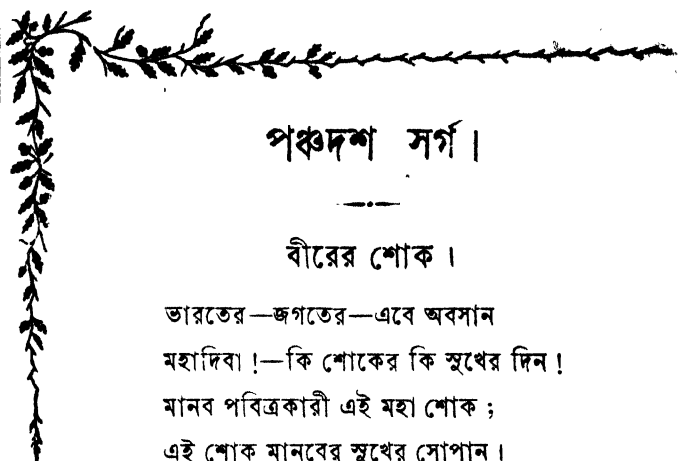
পঞ্চদশ সর্গ।

বীরের শোক।

ভারতের—জগতের—এবে অবসান
মহাদিবা!—কি শোকের কি সুখের দিন!
মানব পবিত্রকারী এই মহা শোক;
এই শোক মানবের সুখের সোপান।
অবসান? না না, এই দিবসের নাহি
অবসান। ব্যাপী চারি যুগ, মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এই দিবালোক
জ্বলিতেছে, জ্বলিবেক;—ঘোর অন্ধকার
কাননের পথে ফুল্ল জ্যোৎস্নার হার।
সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয়।
কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে,
প্রশান্ত ললাট স্বর্গে, নাহি সেই ছায়া।
পড়ে মেঘ-ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর;
অতল জলধি বক্ষে যায় মিশাইয়া।

"হা কেশব! এ ছিল কি নিয়তি আমার!"—
বাষ্প-গদ-গদকণ্ঠে কহিলা ফাল্গুনি,—
"তব নারায়ণী সেনা, অতুল জগতে,
এরূপে অর্জ্জুন হায়! করিবে সংহার!
সত্য, দেব দ্বৈপায়ন! বুঝিনু আবার—
মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার!"
"বৃথা অনুতাপ পার্থ!" প্রশান্ত বদনে
উত্তরিলা নারায়ণ,—"সেনা নারায়ণী
সাধিবারে নারায়ণ-কার্য্য ধরাতলে
হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ-কার্য্য
এই দীর্ঘকাল, আজি জলবিম্ব রাশি
মিশাইল মহাজলে ইচ্ছায় তাঁহার;—
গাণ্ডীবী গাণ্ডীব মাত্র করেতে তাঁহার।
এখনো বুঝিলে নাকি, ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের,
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,
ইচ্ছা তাঁর। অধর্ম্মের যেই মহা বিষে
ক্ষত্রিয়ের রক্ত মাংস মজ্জা জর্জ্জরিত,
কার সাধ্য সেই বিষ করিবে উদ্ধার?
এখনো বুঝিলে নাকি, হায়! ক্ষত্রিয়ের
ধ্বংস বিনা ধর্ম্ম-রাজ্য হবে না স্থাপিত;

নিম্ব বৃক্ষে আম্র নাহি ফলিবে নিশ্চিত ।"
ধীরে চলিয়াছে রথ। নাহি ক্ষুদ্র পথ
কুরুক্ষেত্রে ; মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানব শবে,—দৃশ্য করুণার !
কেহ বা নিদ্রিত যেন, প্রশান্ত বদন,—
কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটি, ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে, মুষ্টিবদ্ধ কর,—
কেহ দন্তে তৃণ কাটি আলিঙ্গি বসুধা—
পড়ে আছে স্থানে স্থানে শোণিত কর্দ্দমে।
কারো অস্ত্র-ক্ষতে হায় ! ঝলকে ঝলকে
এখনো শোণিতধারা বহিতেছে বেগে,
অঙ্গে অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিধিয়া।
জীবিত আহত কোথা করি নিষ্পেষিত
ছুটিতেছে পড়িতেছে ক্ষিপ্ত অশ্ব গজ
অঙ্গহীন শত শত, পূরি রণ-স্থল
ভীম নাদে মৃত্যুমুখে। কোথায় আহত
শত শত চাহিতেছে উঠিতে, চলিতে,
—হস্তহীন, পদহীন, ছিন্ন কলেবর,—
করিতেছে হাহাকার ব্যথায় ব্যাকুল।
ছিন্ন হস্তে পদে শিরে, কবন্ধ শরীরে,

ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে,
আচ্ছন্ন সমর-ক্ষেত্র ক্রোশ ক্রোশান্তর।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
করি ঘোর কোলাহল করিছে ভক্ষণ
অভিন্ন জীবিতে মৃতে। সায়াহ্ন গগনে
আহতের আর্ত্তনাদ,—ভিক্ষা করুণার,
হিংস্র পশু পক্ষীদের ঘোর কোলাহল,
ভীষণ চীৎকার ক্ষত গজ তুরঙ্গের,
মিশি এক ঘোর রবে, কণ্ঠে প্রলয়ের
উঠিছে কি হাহাকার! কিবা হাহাকার
সায়াহ্নের সমীরণে যাইছে ভাসিয়া!
অবতরি স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
আহতের ক্ষতে করি অমৃত সিঞ্চন,
করি মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বরিষণ,
চলিলেন অশ্রুজলে প্লাবিয়া বদন।
সর্ব্বত্র আহতগণ জিজ্ঞাসে ডাকিয়া—
"আজি কোথা আমাদের সুভদ্রা জননী?
যন্ত্রণায় যায় প্রাণ।" কহিলেন পার্থ—
"কেন আজি সুভদ্রায় সেবক, সেবিকা,
সৈন্য-চিকিৎসক সহ, না দেখি, কেশব!

রণস্থলে ? প্রাণ বড় হয়েছে আকুল ;
সত্বর শিবিরে চল, আসিব ফিরিয়া
সুভদ্রার সহ পুনঃ। কি যে ঘোর রণ,
ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়া, হইয়াছে আজি !—
না পারি দেখিতে আর। পাণ্ডব-সৈন্যের
এই দশা ! নাহি জানি সৈন্যে কৌরবের
হইয়াছে অস্ত্রে মম কি দশা ভীষণ !”
চলিতে লাগিল রথ। বসি অন্যমনা
উভয় সারথি, রথী ; অজ্ঞাতে কেমনে
পড়িয়াছে চক্র এক দেহে অচেতন,—
অভাগা করুণ কণ্ঠে করিল চীৎকার।
উভয় করুণ কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
পড়িলেন ভূমিতলে, লইলেন তুলি
রথে পুনঃ—অচেতন দেহ অভাগার।
“কৌরব সে”—সৈন্য কেহ কহিল বিস্ময়ে।
প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মুখে, কণ্ঠে করুণার,
কহিলেন কৃষ্ণ—“ভাই ! শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা, যুদ্ধ অন্তে ভাই পাণ্ডবের।
ঝটিকায় যে তরঙ্গ উত্তাল ফেণিল
মহাম্বম্বী ঝটিকান্তে অভিন্ন সলিল।”
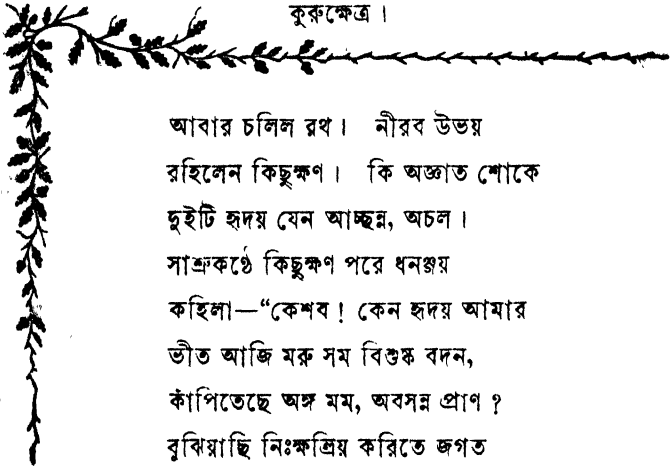
আবার চলিল রথ। নীরব উভয়
রহিলেন কিছুক্ষণ। কি অজ্ঞাত শোকে
দুইটি হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, অচল।
সাশ্রুকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয়
কহিলা—"কেশব! কেন হৃদয় আমার
ভীত আজি মরু সম বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ?
বুঝিয়াছি নিঃক্ষত্রিয় করিতে জগত
জন্ম মম। করিয়াছি আত্মীয় বিনাশ
সে নিয়তি অনুসরি ত্রয়োদশ দিন;—
হয় নাই প্রাণ মম কাতর এমন।
কি যে অমঙ্গল ধ্বনি বাজিছে শ্রবণে,
অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত
তৃষ্ণাতুর অবসন্ন পথিকে
কি যে অমঙ্গল দৃশ্য মনে
ভাসিতেছে, অবসন্ন নে
অনন্ত উত্তপ্ত যেন মরু
চক্রব্যূহ করি, হায়! দুর্বিজয় দ্রোণ
করিলা কি ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি রণে?
কিম্বা অভিমন্যু তব আছে ত কুশলে?

দেখিতে তাহার মুখ, প্রীতি পুষ্পবন,
আজি কেন প্রাণ মম কাতর এমন ?”
চাপি অমঙ্গল চিন্তা স্থিরকণ্ঠে ধীরে
কহিলেন বাসুদেব,—“আছেন কুশলে
ধনঞ্জয় ! মহারাজ অমাত্য সহিত।
দুর্ভাবনা কর দূর। মঙ্গল-নিদান
করিবেন তোমাদের অজস্র কল্যাণ।”
উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
ব্যাকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—“কেশব !
বাজে না মঙ্গলতূরী, দুন্দুভি, পটহ ;
নীরব মুরজ বীণা। পরাভবি সংশপ্তক
আসিতেছি, কই নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল সঙ্গীত।
পুর-নারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় হুলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ। কই পুত্রগণ,

কই অভিমন্যু কই, আসে না ছুটিয়া
প্রীতিপূর্ণ মুখে করি প্রীতি সম্ভাষণ।
নারায়ণ!"—অর্জ্জুনের ভিজিল নয়ন,—
"পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরজন!"
চক্রব্যূহ মহা ক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহা দুর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-স্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক স্রোতে সেই দুর্গ পানে;—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ! চক্রব্যূহ করি
আজি যুঝিলেন দ্রোণ; সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখ কি ভীষণ!
স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর,—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর মত শোভিছে কেমন!
কোন্ বীরমণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্ত্তিমালা পরিল গলায়!
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন।"
আর চলিল না রথ; পড়িলা ভূতলে

পঞ্চদশ সর্গ।

লম্ফ দিয়া দুই জন ; করিয়া লঙ্ঘন
ঊর্দ্ধশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্রে শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব সৈন্য, ঊর্ম্মীর মতন
উদ্বেলিত মহা শোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তুণ।
রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকর তলে।
বাণ-বিদ্ধ মীন মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহা শিশু ! ক্ষত কলেবর
রক্তজবা সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—

নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীর-ধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,

বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।”

মুহূর্ত্ত আগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত।
হইয়া বিদীর্ণ তবে, মুহূর্ত্ত বর্ষিয়া
তরল শোকাগ্নি, বেগে বর্ষিতে লাগিল
বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
“অসি! অসি!”—বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
—বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক,—
“বসাইব কার বুকে কহ, মহারাজ?
অর্জ্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল?—
প্রহারিল এই বজ্র হৃদয়ে তাহার?
কেশব, পার্থের, আহা! দেবী সুভদ্রার
হৃদয় বিদীর্ণ করি, হৃদয়ের ধন
কে হরিল এইরূপে? দেব-প্রতিভায়,
বিক্রমে, মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে, অভিমন্যু মম
কেশবের সমকক্ষ, রথি-গণনায়
আমার অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধগুণে;
হেন মহাবাহু পুত্রে কে জিনিল রণে?
ওই দেখ ভূপতিত আদিত্যের মত
মণ্ডিত কিরণজালে, শোভে পুত্র মম

বিমণ্ডিত শরজালে! সস্মিত বদনে
কুঞ্চিত কেশান্ত মৃদু, ভ্রূযুগ বঙ্কিম,
স্থির নিমীলিত মৃগ-শাবক নয়ন,
সমুন্নত কলেবর শালবৃক্ষ সম,
মৃত্যুরো ছায়ায় দেখ শোভিছে কেমন!
সুদর্শন সংরক্ষিত অমৃত ভাণ্ডার
হরিল কি মৃত্যু আজি? হা পুত্র আমার!
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরী,
মৃতু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার!
জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্ব্বাহ্নে অস্ত? কবিতা জ্যোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে?
প্রকৃতির অতুলিতা তুলী বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্রে প্রথম আভাসে?
হায়! মাত বসুন্ধরে! প্রকৃতি জননি!
ক্ষত্রিয়ের কুল-লক্ষ্মি! এ দারুণ শোক
তোমরা পার্থের মত সহিবে কেমনে?
উঠ বৎস! উঠ! না, না, নাহি মৃত্যু তোর।

দেবীপুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের,
দেবশিশু তুই, ওরে করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। উঠ বৎস! উঠ!
অচেতনা দেবীমাতা বসিয়া শিয়রে;
অভাগিনী সুলোচনা বক্ষে অচেতনা;
অচেতনা পদতলে আনন্দ প্রতিমা
আমার উত্তরা বধূ। নিজে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি,—
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটে রে তোর!
উঠ বৎস! উঠ! এই পাপ ধরাতলে
এখনো ত ধর্ম্মরাজ্য হয় নি স্থাপিত।
মানব-উদ্ধার বৎস! হয় নি সাধিত।
উঠ বৎস! উঠ! চল পিতা পুত্র মিলি
এখনি পশিব রণে, নিশীথ আহবে
বিনাশিয়া কুরুকুল, অধর্ম্ম-খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে,—ভীষণ কানন,—
ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে করিব স্থাপিত।
বাজাও সমর বাদ্য! সাজ সৈন্যগণ!
চল সুখে! পিতা পুত্র আজি এক রথে

যুঝিব, নাশিব শত্রু ; করিব স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য ; উদ্ধারিব নর নিপতিত।"

শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় যাইতে ছুটিয়া
আস্ফালি গাণ্ডীব অসি ধরিলা কেশব,—
জ্ঞানবক্ষে শোকবেগ হইল রোধিত।
"এই বিশ্ব লীলাভূমি"—গদ গদ স্বরে
কহিলেন নারায়ণ,—বিশ্বনিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান,
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে নিবিছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য্য গৃহস্থের,—
আলোক প্রদান, পার্থ! নিয়তি দীপের।
আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।
আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার
জন্মিতেছি, মরিতেছি, নিয়তি আমার
পালিতেছি এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে
নারায়ণ-লীলাভূমে, ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহা লীলাযন্ত্রে, নিয়তি পালন

সুখ মম, ঘোর শোক নিয়তি লঙ্ঘন,—
ধনঞ্জয়! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার।
দেখ বৎস সাধি বীর-নিয়তি তাহার
মানব উদ্ধার ব্রতে, ব্রতে নিয়ন্তার,
লভিয়াছে সুখ-নিদ্রা কোলে জননীর
শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী। নহে শোক-অশ্রু,
ধনঞ্জয়! আনন্দাশ্রু কর বরিষণ।
তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রার,
সার্থক জীবন। আজি ধন্য জগতের
দুই মহাকুল। দুই শক্তি স্রোতস্বতী
অভিমন্যু বীরদর্পে করি সম্মিলিত,
করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত!
কর শোক পরিহার! করি অনুসার
চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে, দুই জনে লভি নিরবাণ!"
ধনঞ্জয় শোকবেগ করি সম্বরণ
পুত্র-সারথির পানে চাহি জিজ্ঞাসিলা—
"কহ সূত! কোন্ মতে করি মহারণ
লভিল এ মহা শয্যা কুমার আমার?"
"ওকি দেখা যায়!—"—ত্রস্তে কহিলা সারথি,

চমকিল শ্রোতাগণ আতঙ্কে বিস্ময়ে—
"ওকি দেখা যায় ওই স্থির, বিভীষণ!—
চতুরঙ্গে বিনির্ম্মিত, অস্ত্রে ঝলসিত,
কণ্টকিত যেন ঘন অটবী-সজ্জিত,
ভাস্কর-প্রদীপ্ত দূর-অদ্রি-শ্রেণী মত!
ওকি চক্রব্যূহ? মনে মানিয়া বিস্ময়
কহিনু,—"কুমার! হায়! লঙ্ঘিবে কেমনে
—এখনো বালক তুমি, এ ব্যূহ ভীষণ!"
হাসিয়া কেশরি-শিশু কহিলা নির্ভয়ে—
খেলিয়াছি এত দিন, করি নাই রণ।
আজি সবিস্ময় সূত! দেখিবে জগত
"অর্জ্জুনের পুত্র আমি শিষ্য গোবিন্দের।"
কালের প্রস্তর বক্ষে আজি অসিধারে
লিখিব কৌরব রক্তে অমর-অক্ষরে,—
অর্জ্জুনের পুত্র আমি শিষ্য গোবিন্দের।
লইলা রথের রশ্মি করে আপনার,
ইরম্মদ বেগে রথ ছুটিল তখন।
দেখিলাম বজ্রাঘাতে মহা শৈলমালা
হয় যথা বিচূর্ণিত, হইল চূর্ণিত
কুমারের অস্ত্রে চক্রব্যূহের প্রাচীর।

বিদারিয়া হুহুঙ্কারে শৈল অবরোধ
ছুটি যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে,
ফেণিল তরঙ্গে সিন্ধু করি প্রকম্পিত,
মুহূর্ত্তে বিদারি চক্রব্যূহ পরাক্রমে,
উড়াইয়া মহাবেগে, তৃণ-মুষ্টি মত,
মত্ত করি সিন্ধুরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
পশিল কুমার কুরু-সৈন্যের সাগরে
উৎক্ষোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত।
বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর।
শোভিতেছে চক্রাকারে চতুরঙ্গ বেলা
মাতঙ্গে, তুরঙ্গে, রথে, সৈন্যে স্তরে স্তরে,
আচ্ছন্ন আয়ুধারণ্যে, ধ্বজ পতাকায়
ঝলসি মার্ত্তণ্ড করে বনরাজিলীলা।
বহির্ম্মুখ অন্তর্ম্মুখে সৈন্য দুই মুখে
সুসজ্জিত ; মহাবনে শৈলশৃঙ্গ মত
মহারথে মহারথী দর্পে স্থানে স্থানে
রক্ষিতেছে মহা ব্যূহ ; হইতেছে রণ
বহির্ভাগে ঘোরতর, হইতেছে আর
পাণ্ডবের হাহাকারে বিদীর্ণ গগন।
মুহূর্ত্তে অন্তর-সিন্ধু নীরব নিশ্চল।

মুহূর্ত্তে কুমার-বীর্য্য প্রভঞ্জন দর্পে
বহিল জলধিগর্ভে, জলধি-নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয় শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি
শত শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়।
কৌরবের সৈন্যারণ্যে উঠিল জ্বলিয়া
হুহুঙ্কারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের ;
কৌরবের হাহাকারে ছাইল গগন।
দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বৃহদ্বল, দুঃশাসন, শল্য—একে একে
করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্ছিত,
পলাইল বার বার শৃগালের মত।
কৌরব-দুর্গতি দেখি কুমার লক্ষ্মণ
পশিলে আহবে, হাসি সুভদ্রা-নন্দন
কহিলা ডাকিয়া স্নেহে,—'ভাই রে লক্ষ্মণ!
আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র নহে এ প্রাঙ্গণ।
পিতার দুলাল তুমি, আদরে পালিত
সুখের শয্যায়, শত সম্ভোগের কোলে।
যে অনল দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,
না পারি সহিতে গেল পলাইয়া ত্রাসে
বার বার, তুমি ভাই ননীর পুতুল

কেন ঝাঁপ দিলে সেই ঘোর দাবানলে ?
কেন তাত দুর্য্যোধন এইরূপে হায় !
করিছেন আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত ?
বিপুলা পৃথিবী,—ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর ;
বিপুল কৌরব-রাজ্য ; কৌরব পাণ্ডব
দুই ভাই ; এ দুয়ের হয় না কি স্থান
এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে দুদিনের তরে ?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার,—
তুমি ভানুমতী-পুত্র, আমি সুভদ্রার ।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে, গলাগলি করি
থাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা ;
পারিব থাকিতে, স্বর্গে ইন্দ্রের মতন,
মাতা ভানুমতী-অঙ্কে, মাতা সুভদ্রার ।
যাও সেই স্বর্গে, যাও শিবিরে তোমার ।'
'ওরে দুরাচার ! এত আস্পর্দ্ধা রে তোর !'
গর্জ্জিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে তেয়াগিলা শর ।
অনিচ্ছায়, অযতনে, কুমার তখন
তেয়াগিলা প্রতি, অস্ত্র । কাটি অর্দ্ধ পথে
লক্ষ্মণের শর, খেলি অগ্নি প্রতিঘাতে,
ছুটিল আয়ুধ দৃপ্ত বিদ্যুতের মত ।

ডাকিল। কুমার ত্রাসে,—'সম্বর লক্ষ্মণ!'
না পারিল সম্বরিতে দেখিলা যখন,
আঁখি নাহি পালটিতে কাটিতে সে শর
আপনি দ্বিতীয় অস্ত্র করিলা প্রেরণ।
প্রবেশিল পূর্ব্ব শর লক্ষ্মণ-গ্রীবায়
যে মুহূর্ত্তে, সে মুহূর্ত্তে নিল উড়াইয়া
সে শর দ্বিতীয় শরে—কি শিক্ষা-কৌশল!—
তবু ছিন্নগ্রীব ভূমে পড়িলা লক্ষ্মণ।
এক লম্ফে রথ হ'তে পড়িয়া ভূতলে
কে যায় ছুটিয়া ওই?—পার্থ! পুত্র তব।
পড়িলা লক্ষ্মণ বক্ষে, শক্তিশেলে হত
লক্ষ্মণের বক্ষে যেন পড়িলা শ্রীরাম!
'লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই! প্রাণের লক্ষ্মণ!'—
শোকেতে অধীর শিশু কহিলা কাঁদিয়া,—
'লও এই অসি ভাই! হান এই বুকে,
দুই ভাই এক সঙ্গে যাইব রে চলি,
এক বৃন্তে দুই ফুল ফুটিব ত্রিদিবে
নারায়ণ পদতলে।' মুছাইয়া অশ্রু,
মৃত্যু-মুখে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণ—
'না না, ভাই অভিমন্যু! থাক তুমি ভাই!

নারায়ণ পদতলে ফুটিয়া এখানে
পবিত্রিয়া পিতৃ-কুল, মোহিয়া জগত !
হায় ! যেই পাপানলে ভস্মিছে কৌরব,
ভস্মিছে ক্ষত্রিয় জাতি, একটি পল্লব
নাহি ছোঁয় যেন তব,—এই ভিক্ষা চাহে
নারায়ণ পদতলে মুমূর্ষ লক্ষ্মণ !'
কুরুক্ষেত্র শোকক্ষেত্র। কিন্তু শোকতর
দৃশ্য আরো ছিল ভাগ্যে ভাবি নি তখন।
বর্ষিল শোকের বর্ষা ; জীমূত গর্জ্জনে
গর্জ্জি দুঃশাসন আসি কহিল গর্জ্জিয়া,—
'ওরে কাপুরুষগণ ! এখনো কি তোরা
রেখেছিস্ এই পুত্র-হন্তায় জীবিত ?
যা রে দুরাচার শিশু ! যা রে রথে তোর,
লক্ষ্মণের সঙ্গী তুই হইবি এখন।'
আবার বাজিল রণ। দম্ভোলি-দর্শন
ছুটিল আয়ুধরাশি। মুহূর্ত্তেক পরে
নির্ব্বাপিত বজ্রমত গেল লুকাইয়া
সংজ্ঞাহীন দুঃশাসন। একে, একে, একে,
সপ্ত মহারথী পুনঃ পশিলা সংগ্রামে।
গর্জ্জিয়া কহিলা কর্ণ,—'কাপুরুষ-সুত !

পিতা তোর নপুংসক করিয়া আশ্রয়
করে রণ লজ্জাহীন ; তোর রণ-সাধ
বড় হাস্যকর। শুধু স্নেহেতে কেবল
এতক্ষণ তোর আমি রেখেছি জীবন।
যা চলি এখন আমি দিলাম অভয়।'
'তাত কর্ণ!'—হাসি শিশু করিল উত্তর,—
'বড় দুঃখ, এ স্নেহের দিতে প্রতিদান
অশক্ত এ ক্ষুদ্র শিশু। হইলে নিধন
তোমরা আমার অস্ত্রে স্নেহ-বিনিময়ে,
হবে পিতা পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
তাই পলায়ণ-পথ উন্মুক্ত এমন।
নাশিব না তরু আমি ; কিন্তু শাখাগণ
তোমাদের কর রক্ষা,—পারিলে না হায়!
রক্ষিতে লক্ষ্মণে কেহ। দিতেছি প্রথম
পিতৃ-নিন্দুকেরে দণ্ড, কর সম্বরণ।'
ছুটিল কর্ণিক অস্ত্র কাক-পক্ষ-ময়,
ফুটিয়া কর্ণের কর্ণে অলক্ষিত বেগে
রহিল ঝুলিয়া,—শল্য উঠিল হাসিয়া ;
অন্য অস্ত্রে কর্ণানুজ পড়িল ভূতলে।
শল্যানুজ এই রূপে শল্যের সম্মুখে

হইল পতিত ; শেষে হইল পতিত
মহারথী বৃহদ্বল ; ছয় রথী আর
সিন্ধু-বেলা-প্রতিহত লহরীর মত,
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে গেল লুকাইয়া।
তখন ব্যূহিত সৈন্যে, ধনু বীরেন্দ্রের
বর্ষিতে লাগিল মৃত্যু বরিষার মত,
পড়িল কৌরব-সৈন্যে মহা হাহাকার।
নিরুপায় সপ্তরথী একত্রে তখন
—ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে ?—
আক্রমিল এক মাত্র শিশু অসহায়,
আক্রমে নিষাদগণে শার্দ্দূল যেমতি
জালাবদ্ধ,—বসুন্ধরে ! যাও রসাতল !
কর্ণ কাটিলেন ধনু ;—অশ্ব ভোজরাজ।
ছিন্নধনু, রথহীন, খড়্গ চর্ম্ম ধরি
রথ হ তে লম্ফ দিয়া পড়িলে ভূতলে
শত্রু মধ্যে, মেষ মধ্যে ক্ষিপ্ত সিংহ যথা,—
দ্রোণ অসি, কর্ণ চর্ম্ম, ফেলিলা কাটিয়া।
তখন ধরিয়া চক্র, চক্রধর মত
শোভিল কুমার তব। কাটিয়া অরাতি
আসিছে ফিরিয়া চক্র করে কুমারের

মুহুর্মুহু, খেলা কার বিদ্যুতের মত।
বরষি অজস্র শর সপ্তরথী মিলি
কাটিলা সে মহাচক্র. বিঁধিলা শরীর
বীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন। সেই বীর-শোভা,
পুষ্পিত কিংশুক সম বিক্ষত মূরতি,
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ, আরক্ত নয়ন
আকর্ণ বিস্তৃত, ঊর্দ্ধে ধৃত-চক্র বাহু,
সপ্তরথী সম্বেষ্টিত সে নির্ভীক রণ,
ঘন ঘন সিংহনাদ, ঘোর অট্টহাসি.
যে দেখেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের
ভুলিবে না ইহ জন্মে। ছিন্ন-চক্র, শিশু
তখন লইয়া গদা, গদাধর মত
ছুটিল, পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাত্মজ
রথ হ'তে তিন লম্ফে গেল পলাইয়া।
সুবলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গান্ধার,
রথী সপ্তদশ, দশ মাতঙ্গ বিনাশি,
চূর্ণ করি অশ্ব রথ সারথি সহিত
দুঃশাসন তনয়ের, গদা যুদ্ধে ঘোর
গদাঘাতে দুই জন পড়িলা ভূতলে।
না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্ন প্রাণ

রণ-শ্রমে, রক্তস্রাবে, —দুঃশাসন সুত
ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,
প্রহারিল গদা অৰ্দ্ধ-উত্থিত মস্তকে,—
ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।
'অধৰ্ম্ম! অধৰ্ম্ম! ঘোর'—ঘোর হাহাকার
জলধি-কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে।
অধোমুখে সপ্তরথী ফিরিলা শিবিরে,—
রাধেয় মূর্চ্ছিত রথে। নিক্ষেপিয়া দূরে
কুরুসৈন্য অস্ত্র শস্ত্র, মুমূর্ষু বেড়িয়া
করিতে লাগিল শোকে অশ্রু বরিষণ!
কহিলা কুমার—'সুত! ললাটে আমার
লেখ হৃদয়ের রক্তে শরের জিহ্বায়,
কৃষ্ণার্জ্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার,
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।'
খুলিলাম শিরস্ত্রাণ, ছিঁড়ি উরস্ত্রাণ
লিখিলাম,—হায়! লেখা যাইতেছে ভাসি
অশ্রুজলে লেখকের। চাহি ঊৰ্দ্ধ পানে
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে, গাইতে গাইতে
পুণ্য নাম চতুষ্টয়, কহিতে কহিতে—
'নারায়ণ—ধৰ্ম্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার,'

শুনিতে শুনিতে—'জয়! অভিমন্যু জয়!'—
অনন্ত কৌরব কণ্ঠে, মুদিল নয়ন,
ঘুমাইল শিশু যেন কোলে জননার;—
দেখিলাম দুই রবি গেল অস্তাচলে।
দেখ এই বীর-শয্যা; এই দেখ আর
মৃত-চক্র-ব্যূহ কিবা বীরত্ব অপার!
দেখ ক্ষত কলেবর তব সারথির।
পুত্র-সারথির দেখ অক্ষত শরীর!"
"অদ্ভুত! অদ্ভুত কথা! এ নহে সম্ভব।
পুত্রের যে এ বীরত্ব পিতার দুর্ল্লভ।"—
ভ্রমি অধোমুখে ধীরে কহিলা ফাল্গুনি।
"শুনিয়াছিলাম যেন কহিছে যুযুৎসু—
'অধার্ম্মিক রথিগণ! এ অধর্ম্ম ফল
অর্জ্জুনের অস্ত্রমুখে লভিবি অচিরে।'
নারায়ণ! তুমি কি তা কর নি শ্রবণ?
হায়! হায়! সুধৌতাগ্র সপ্তরথী শরে
হইয়া পীড়িত বুঝি অসহায় শিশু
স্মরিল—'হা পিত! কোথা, কোথায় মাতুল!'
না না, সে যে পুত্র মম, ভাগিনা তোমার
সুভদ্রার গর্ভজাত, এ বীরত্ব গাথা

যে লিখিল কাল-বক্ষে, হেন আর্ত্তনাদ
সে কেন করিবে ? কিন্তু—ধিক্ ধর্ম্মরাজ !
ভ্রাতৃগণ ! সমবেত পাণ্ডব পঞ্চাল !
এইরূপে ব্যাধগণ বধিল শিশুরে !
ছিলে কি নিদ্রিত সবে ? বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি,
রমণী-ভূষণ মত কর কি ধারণ ?"
নত শিরে যুধিষ্ঠির বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলা কাতর শোকে,—"ধনঞ্জয় ! তুমি
জিজ্ঞাসিলে কার বুকে বসাইবে অসি ?
হান মম বুকে, আমি পুত্রহন্তা তব।
প্রবেশিল অভিমন্যু আদেশে আমার
চক্রব্যূহে বজ্র-বেগে, সার্থক জীবন
দেখিলাম সে বীরত্ব মানব-অতীত !
দাঁড়াইল জয়দ্রথ, অবরোধি দ্বার
হিমাচল শৃঙ্গ সম, টলাইতে তারে
না পারিল সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল।"
"হা পুত্র !"—নিশ্বাসি দীর্ঘ বিধূমিত গিরি
করিতে লাগিল পুনঃ অগ্নি বরিষণ—
"হায় পুত্র ! মত্ত সিংহ-শাবকে এরূপে
লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া কৌশলে,

ভুলিয়া সৌহৃদ্য মম, ভুলি প্রাণ-দান,
জয়দ্রথ করিল কি অবরুদ্ধ দ্বার!
জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!”—কৌরব শিবির
চাহিয়া গর্জ্জিলা ক্রোধে উন্মত্ত অর্জ্জুন,
কুরুক্ষেত্র থর থর উঠিলা কাঁপিয়া।
নিক্ষেপি গাণ্ডীব ধনু বামে ও দক্ষিণে,
কাঁপায়ে কোদণ্ড-শব্দে কুরুক্ষেত্র পুনঃ
কহিলেন,—“ধর্ম্মরাজ! এ প্রতিজ্ঞা মম,—
না লয় আশ্রয় তব কালি জয়দ্রথ,
না লয় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আশ্রয়,
কালি জয়দ্রথে আমি করিয়া সংহার
বরষিব শান্তি-বারি এই শোকানলে
আমাদের। নারায়ণ!”— পড়ি পদতলে
গোবিন্দের—“নারায়ণ! এই পাদপদ্ম,
অর্জ্জুনের শান্তি-ধাম, করিয়া ধারণ,
চাহি পুত্র পানে বীর-শয্যায় শায়িত,
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা,—দেখিয়া জীবিত
জয়দ্রথ কালি রবি হয় অস্তমিত,
এইখানে হুতাশন করি প্রজ্জ্বলিত,
পিতা পুত্র এক চিতা করিবে প্রবেশ
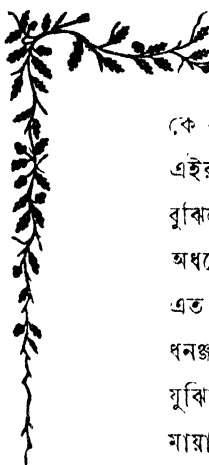
কে বুঝিবে তব লীলা ! ঘোর অমঙ্গলে
এইরূপে সাধ তুমি মানব-মঙ্গল !
বুঝিলাম এই শোক শিক্ষা অর্জ্জুনের।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায় !
এত দিনে, এত দূরে ; বুঝিলাম আর,
ধনঞ্জয় শ্লথ করে, আবৃত অসিতে
যুঝিয়া করিতেছিল বৃদ্ধি নর-মেধ,
মায়াবশে ভ্রান্ত মতি ; সপ্তরথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ-আবরণ,
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথ করে বিদ্যুতাগ্নি, খুলিল নয়ন,—
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বুঝিনু এখন।”
উঠি বেগে নিষ্কোষিত করি ভীমা অসি,
আস্ফালি,—“এখন এই অসি অর্জ্জুনের
অজস্র শোণিত-উৎস করিবে খনন
অধর্ম্মী অরাতি-বক্ষে ; গর্জ্জিবে গাণ্ডীব
প্রলয়ের মেঘ মন্দ্রে ; ছুটিবে আয়ুধ
কেন্দ্রভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্য্যগণ মত।
পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্ম্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান।

বাজাও বিজয় শঙ্খ মহারথিগণ!
কালি জয়দ্রথে বধি, ষষ্ঠাহ অতীত
না হইতে অরিকুল করি নির্ম্মূলিত,
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত।”
মহাশব্দে পাঞ্চজন্য উঠিল বাজিয়া
দেবদত্ত শঙ্খ সহ; বাজিল তখন
সহস্র সহস্র শঙ্খ; ঝটিকা গর্জ্জন
উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্ন গগন।

ষোড়শ সর্গ।

শোকে শান্তি।
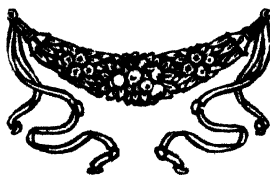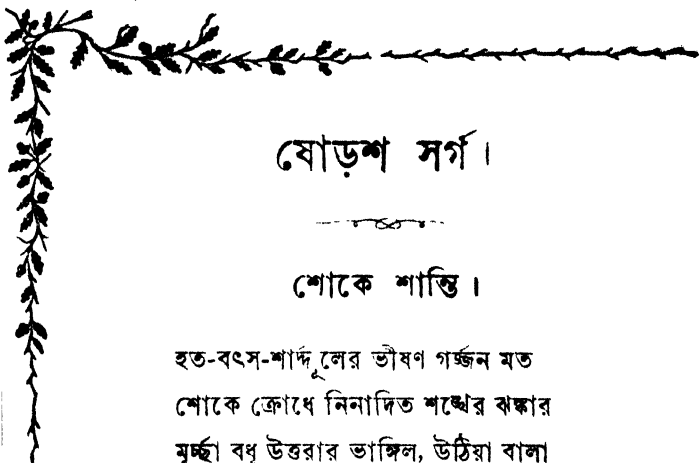
হত-বৎস-শার্দ্দূলের ভীষণ গর্জ্জন মত
শোকে ক্রোধে নিনাদিত শঙ্খের ঝঙ্কার
মূর্চ্ছা বধূ উত্তরার ভাঙ্গিল, উঠিয়া বালা
দাঁড়াইল উন্মাদিনী চিত্রিতা আকার।
কুন্তল আলুলায়িত করিয়াছে বিমণ্ডিত
সোণার প্রতিমাখানি ; হাসি খল খল
কহে বাহু প্রসারিয়া,—"সুলিমা! সুলিমা!
চক্রব্যূহ যিনি অভি আসিছে রে, চল
আজি বীর-পত্নী মত রণজয়ী বীরে
চল্ যাই আবাহণ করিব অভিরে।
উঠ্ পোড়ামুখি! উঠ্! তোর এই চিরকাল,—
দুঃখের সময়ে তুই কাঁদিস্ সতত,
সুখের সময়ে নিদ্রা যাস্ এই মত।
উঠ অভাগিনি! উঠ!"—কহে করে ঠেলি।
"নারায়ণ! নারায়ণ!"—পড়িয়া গলায়

গোবিন্দেরে কহে পার্থ—"এই দৃশ্য আর
না পারি সহিতে, বুক বিদরিয়া যায়।"

"একি? রক্ত! একি? অস্থি! কোথা আমি?"—
চারি দিক চাহি উন্মাদিনী মত ঘূর্ণিত নয়নে,—
"ও কে কাঁদিতেছে? বাবা! ও কে অধোমুখে ওই?
নারায়ণ! কেন দেব! বিষণ্ণ বদনে?"
ছুটি উন্মাদিনী গলা ধরি গোবিন্দের
কহিল কাঁদিয়া,—"দেব! কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে, নাথ!
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীব ধন্বা,
জননী সুভদ্রাদেবী, এই দশা তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার,
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি,
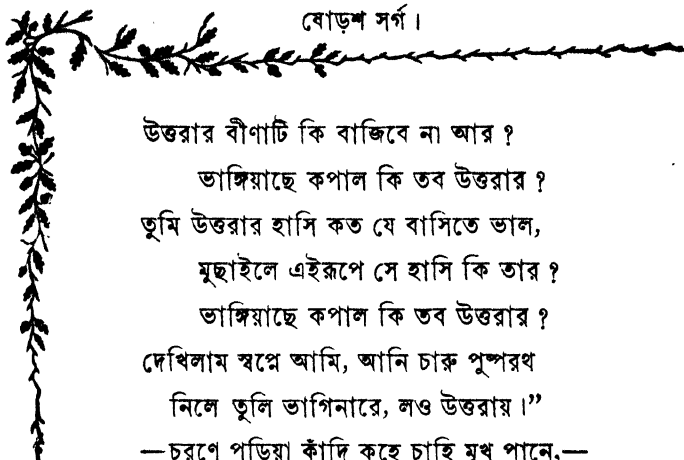
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
দেখিলাম স্বপ্নে আমি, আনি চারু পুষ্পরথ
নিলে তুলি ভাগিনারে, লও উত্তরায়।”
—চরণে পড়িয়া কাঁদি কহে চাহি মুখ পানে,—
“দয়াময় ! কর দয়া দুঃখিনী কন্যায়।
নহে যুগ, নহে বর্ষ, কেবল ছয়টি মাস
লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?”
“হা হত হৃদয় !”—পার্থ না পারি করিতে রুদ্ধ
শোকবাষ্প, উচ্চৈঃস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া।
বালিকা সে মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
আবার উঠিল হাসি, ভ্রান্তি কুজ্মটিকা আসি
আবার ছাইল ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার ;
পার্থের গলায় পড়ি সুবর্ণের হার
কহে,—“বাবা ! না না তুমি কাঁদিও না, অভি তব
করিয়াছে অভিমান আমি তাহা জানি,

জান না কি অভিমন্যু বড় অভিমানী।
পিতামহ-শর-শয্যা কালি সে আঁকিতেছিল,
আমি সেই ছবিখানি লইনু কাড়িয়া ;
শর-শয্যা অভিনয় করি তাই নিরদয়,
জননীর কোলে দেখ রয়েছে শুইয়া,
ওই দেখ রাখিয়াছে হাসিটি চাপিয়া।
পোড়ামুখী সুলোচনা কত জানে ছল ওমা !
দেখ সত্য সত্য যেন রয়েছে মরিয়া ;
কেমন রেখেছে বিষ-জিহ্বাটি চাপিয়া !
কাঁদিও না বাবা তুমি, যাই আমি বীণা আনি,
এখনি দেখিবে, শুনি বীণার ঝঙ্কার
দু'জনের অভিনয় হবে চূরমার।"
যায় ছুটি উন্মাদিনী, ধরিলেন ধনঞ্জয়,
মূর্চ্ছিতা হইয়া বামা পড়িল গলায়।
পুত্রপাশে পুত্র-বধূ রাখিয়া ধরায়,
অতৃপ্ত নয়নে পার্থ নিরখিয়া কিছুক্ষণ
কহিলেন—"যদুনাথ ! দেখ একবার,
হুত হুতাশন পার্শ্বে ছিন্ন পুষ্পহার।
উঠ মা আনন্দময়ি ! কালি জয়দ্রথ-জয়ী
ধনঞ্জয় আনিবে মা ! বসন ভূষণ,

ষোড়শ সর্গ ।

উঠ মা বিরাটবালা ! আবার সাজাবে ডালা
পুতুলের ; আমরা মা পুতুল যে তোর ;
তোর এ পুতুল খেলা হয় নাই ভোর ।
উঠ বোন্ সুলোচনা ! তোর এ পুতুল দুটি
কি খেলা খেলিছে আজ বুঝিতে না পারি,
ওই দেখ ধরাতলে রহিয়াছে পড়ি ।
সত্য বুঝি অভিমন্যু করিয়াছে অভিমান,
করিয়াছে এই শর-শয্যা অভিনয় ।
উঠ মা উত্তরা ! তোর কথা মিথ্যা নয় ।
এক দিন দ্বারকায় যাদব শিশুর সনে
খেলিতে খেলিতে শিশু কহিল ডাকিয়া—
"দেখ বাবা, মামা তুমি, দেখ না চাহিয়া
কেমন সুন্দর খেলা, খেলেছি আমরা আজি ।"
ছিনু অন্যমনে কেহ না দিনু উত্তর ।
খেলিল না শিশু, করি অভিমান ঘোর
রহিল ভূতলে বসি, দুই নেত্রে অশ্রু খসি
শোভিল নক্ষত্র দুটি, কেশব ছুটিয়া.
অভিমানী পুতুলটি লইলা তুলিয়া ।
আজি বুঝি সেই মতে চক্রব্যূহ একরথে
ভেদিয়া, করিয়া এই ভীষণ প্রলয়,

—আমি যে অর্জ্জুন যাহা আমার বিস্ময়।—
হাসি শিশু খল খল, উল্লাসে কহিল বুঝি,—
'দেখ বাবা, মামা তুমি দেখ না আসিয়া,
বার বার সপ্তরথী যায় পলাইয়া!
ছিনু সংশপ্তক রণে, না শুনিনু দুই জনে,
সেই অভিমানে বুঝি শর-শয্যা করি
রহিয়াছে ধরাতলে এইরূপে পড়ি।
উঠ বাবা! উঠ চল! মনে বড় কুতূহল
জনক মাতুল তোর সেই মহারণ
দেখিবে, করিবে আর সার্থক জীবন।
উঠ ভদ্রা, উঠ দেবী, বীর জননীর মত
সাজাইয়া বীরপুত্রে বীর আভরণে
চল যাই, এই রণ দেখি তিন জনে।
পতি-রথ-রশ্মি ধরি দেখেছিলে একবার
যে বীরত্ব, রথ-রশ্মি ধরি আরবার
পুত্রের বীরত্ব দেখ কত কল্প শ্রেষ্ঠতর,
কোথায় সরসী, আর পয়োধি ফেণিল!
কোথায় ঝটিকা, আর মলয় অনিল!"
"না না, ধনঞ্জয়!"—কৃষ্ণ কহিলা করুণ কণ্ঠে—
কুরুক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র, রঙ্গভূমি নয়।

বড় ভাগ্য আমাদের, বড় ভাগ্য মানবের,
এই মহা শর-শয্যা নহে অভিনয়।
ওই শর-শয্যা পার্থ! এই শর-শয্যা আর
উভয় মহিমাময়। কিন্তু কত দূর
প্রৌঢ়ের বীরত্বে, আর শূরত্বে শিশুর!
ভীষ্মদেব মরুভূমি; অভিমন্যু উপবন
নব কিসলয়ে পুষ্পে সুন্দর শ্যামল।
সে ভীষণ লবণাম্বু; এ পবিত্র সুধা সিন্ধু।
সে বন্ধুর বিন্ধ্যগিরি; এই হিমাচল।
শিরে দেবী মন্দাকিনী সুভদ্রা রূপিনী ওই,
বহে বক্ষে দুইধারা, জাহ্নবী যমুনা,
পত্নী-প্রেম মাতৃ-প্রেম, উত্তরা ও সুলোচনা,
বারাণসী-বক্ষে যেন অসি ও বরুণা!
সম্মিলিত এই স্রোতে, বীরত্বের ব্রহ্মপুত্র
মিশিয়া করেছে কিবা তীর্থের সৃজন—
এই শর-শয্যা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম!
সেই সিন্ধু নারায়ণ। মাতৃ-প্রেম, ধাতৃ-প্রেম,
পতি-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম আর,
এই রূপে শত প্রেম, উপজিয়া শত ক্ষেত্রে,
মিলি এক স্রোতে,—নর-প্রেম দুর্নিবার,

পশিয়াছে শত মুখে প্রেম-পারাবার।
কুরুক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র ; কিন্তু কত রূপান্তর,
বীর ব্রতে প্রৌঢ়ের সে সমর্পণ প্রাণ !
নরহিতে শিশুর এ আত্ম-বলিদান !
সুভদ্রে !"—ডাকিলা কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে।
পশে নাই যেই কর্ণে শঙ্খের গর্জ্জন
শত শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণ।
ধীরে ঊর্দ্ধ-দুনয়ন নামিল, রহিল চাহি
কেশবের মুখপানে, ভক্তি ছল ছল।
"সুভদ্রে !"—কহিলা কৃষ্ণ—"নাহি আমাদের শোক,
গাও প্রেমপূর্ণ স্বরে মানব মঙ্গল !
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
কোন জননীর পুত্র লভেছে কখন ?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সফল জীবন-ব্রত, অধর্ম্ম হয়েছে হত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাইছে মানবজাতি কি মঙ্গল গীত !"
এতক্ষণে জননীর বহিল নয়নে দুই
নিরমল বারিধারা, নহে শোক-জল,

আনন্দাশ্রু ভকতির আলোকে উজ্জ্বল।
"দয়াময়! নাহি শোক"—বাজিল ত্রিতন্ত্রী যেন
ভকতির পরশনে করুণা হিল্লোলে,—
"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীষণাহবে
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?
ক্ষুদ্র লতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল,
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল;
তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহা ফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব-মঙ্গল,—
লতার ত এই সুখ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক

মাতৃ-প্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার ?
সমগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক নর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর !
বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ !
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণনাম হয় নি প্রচার।
অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে, শিখাইব নাম নিরমল ;
কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব মঙ্গল।”
নীরব নিশ্চল কৃষ্ণ, বিস্ফারিত দুই নেত্রে
চাহি আকাশের পানে শান্তির আধার।
শোক-ঝড়-বিলোড়িত হৃদয়েতে অর্জ্জুনের,
শান্তির অনিল ধীরে হইল সঞ্চার।
চাহি দূর শূন্য পানে অস্ফুট অস্ফুট যেন
দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত অমর,
ছুটিল হৃদয়ে নব প্রীতির নির্ঝর।

মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণ ডাকিলেন—"সুলোচনে!"
শুনিল না সুলোচনা, শুনিবে না আর।
পরশি ললাট কৃষ্ণ দেখিলেন, রহিলেন
চাহিয়া নীরবে, মুখ গাম্ভীর্য্য আধার।
"না না, দেব! নিদ্রা তার"—কহিলেন ভদ্রা দেবী—
"না না, দেব! নিদ্রা তার ভাঙ্গিবে না আর।
তাঁহারো নিয়তি পূর্ণ, কি দয়া তোমার!
তব পদ হিমাচলে উপজি আনন্দ কলে
যে অনন্ত নির্ঝরিণী বহিল ছুটিয়া,
তার এক ক্ষুদ্র ধারা—পুণ্যময়ী সুলোচনা—
ভদ্রার্জ্জুন প্রেম-স্রোতে গেল মিলাইয়া,
অভিমন্যু পুত্রে আজি হৃদয়ে লইয়া।
হাসে নাহি নিজ সুখে, কাঁদে নাহি নিজ দুঃখে,
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত।
তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেব! কি গম্ভীর,
কি নিষ্কাম, নিরমল, কিবা পুণ্যাধার!
অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম পথে, মানব যাইতে পারে
অনন্ত সুখের পার, বৈকুণ্ঠে তোমার,
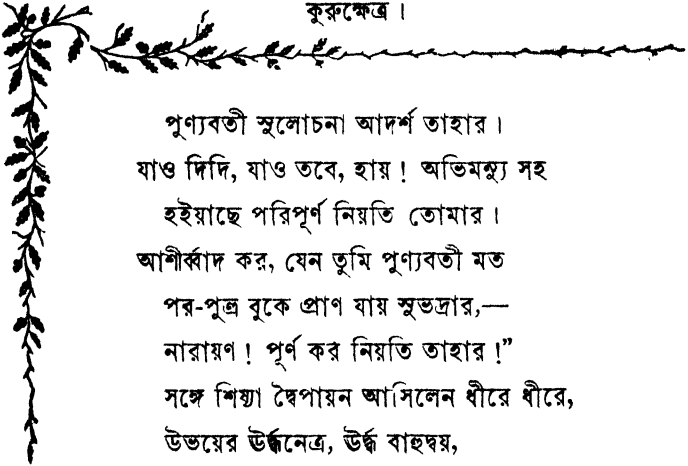
পুণ্যবতী সুলোচনা আদর্শ তাহার ।
যাও দিদি, যাও তবে, হায় ! অভিমন্যু সহ
হইয়াছে পরিপূর্ণ নিয়তি তোমার ।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন তুমি পুণ্যবতী মত
পর-পুত্র বুকে প্রাণ যায় সুভদ্রার,—
নারায়ণ ! পূর্ণ কর নিয়তি তাহার !"
সঙ্গে শিষ্য দ্বৈপায়ন আসিলেন ধীরে ধীরে,
উভয়ের ঊর্দ্ধনেত্র, ঊর্দ্ধ বাহুদ্বয়,
সুপবিত্র হরিনাম, উভয়ে করিছে গান,
বিগলিত প্রেম-অশ্রু দুনয়নে বয় ।
স্থির গাত্র, ঊর্দ্ধনেত্র, চিত্রার্পিত কুরুক্ষেত্র
এ সঙ্গীত ভক্তিভরে করিল শ্রবণ ।
চাহি অর্জ্জুনের পানে শান্ত স্থির দুনয়নে
কহিলেন দ্বৈপায়ন উচ্ছ্বসিত মন,—
"ধনঞ্জয় ! শোক তব কর পরিহার
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার ।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়,—নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীব-বীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ।

ছিল কত শত জীব, আজি নাহি আর;
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিবা মহা কালের হুঙ্কার
উঠিছে পশ্চাতে, আর সম্মুখে তোমার!
কালের তরঙ্গে যদি লয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হ'তে মানবের নাম,
সর্ব্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান,
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।
এই বিবর্ত্তন গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর,
কেমনে রহিব স্থির, হইব অমর?
পুত্র যাবে, পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্ত্তনে,—শোক কর পরিহার।
সৃজন, পালন, লয়, করিছে সাধন,
মুহূর্ত্তে অনন্ত এই নীতি-বিবর্ত্তন।
কি সে নীতি, কে নিয়ন্তা, কিছুই না জানি;
আছেন উভয়, জানি ক্ষুদ্র নর আমি।

চেয়ে দেখ বীণা যন্ত্র কত ভিন্ন তার।
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার।
কিন্তু সর্ব্ব তার হয় এক স্বরে লয়,
সেই মূল স্বরে তার বাঁধা সমুদয়।
মহা যন্ত্র বিশ্ব-রাজ্য কর দরশন!
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন!
আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল,
নিত্য বিবর্ত্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল
এক মহা নীতি বলে; কি নীতি না জানি,
কে নিয়ন্তা নাহি জানি, এই মাত্র জানি
সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ
বিশ্বের সে মূল নীতি, ধর্ম্ম সনাতন।
আর জানি সে নিয়ন্তা এই বিশ্ব-স্বামী;
তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি অন্তর্য্যামী।
তাঁহার নীতিতে বিশ্ব হতেছে চালিত
কল্প কল্পান্তর, হ'য়ে ঘোর বিবর্ত্তিত,
অনন্ত উন্নতি পথে। এই বিবর্ত্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব নয়নে,
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব-বদনে।

ষোড়শ সর্গ।
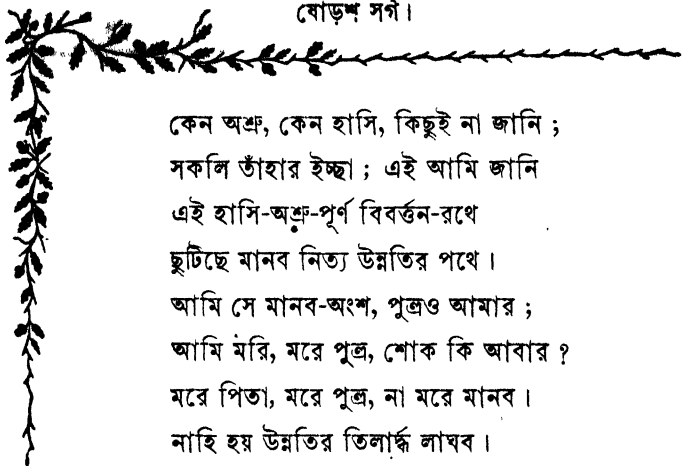
কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি ;
সকলি তাঁহার ইচ্ছা ; এই আমি জানি
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্ত্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার ;
আমি মরি, মরে পুত্র, শোক কি আবার ?
মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব।
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ ! মিশাইয়া জলে।
একে ভাটা, অন্য দিকে জোয়ার উছলে।
এই উন্নতিই সুখ ; শোক, বিঘ্ন তার।
এ শোকে মানব আজি করে হাহাকার।
নর-শোকে পুত্র-শোক করি নিমজ্জিত,
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,
তব বীর-পুত্র মত, হও অগ্রসর
মানব-উন্নতি পথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি !
চারি দিকে উন্নতির বিবর্ত্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া !

চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
আনন্দে গাইয়া "হরে! মুরারে" কেবল।
শিষ্যা উদাসিনী স্থির দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
ঊর্দ্ধনেত্রে আত্মহারা হৃদয় অচল।
জানু পাতি বসি ধীরে, মৃত কুমারের শিরে
বর্ষিল চুম্বন, দুই বিন্দু অশ্রুজল।
নীরবে উঠিয়া গিয়া পড়ি পার্থ-পদতলে,
কহিল—"চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তাহার।"
"শৈলজে! শৈলজে!" পার্থ উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত প্রায়
লইলা তুলিয়া বুকে নীলাব্জ প্রতিমা,
শোভিল সুনীলাকাশে সন্ধ্যার নীলিমা।
"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—সরিল না কথা আর
শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে ছুটিল উচ্ছ্বাস,
নাহি তার ভাষা, পার্থ স্থির চিত্রাঙ্কিত প্রায়
রহিলেন আত্মহারা চাহিয়া আকাশ।
শৈলজা পড়িয়া পুনঃ অর্জ্জুনের পদতলে,
চাহি শান্ত দুনয়নে, কহে পুনর্ব্বার—
"অজ্ঞানী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া যথা
নারায়ণ রূপ, পূজা করি দেবতার,

ষোড়শ সর্গ।

হয় পূর্ণ মনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
দেখে শান্তি-সুধা-পূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর ;
তেমনি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়,
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন,
পূজি নর, পাইয়াছি নর নারায়ণ।
পতিত-পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজি পুত্র পুণ্যবান দিয়া আত্ম বলিদান,
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দ্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ !
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার,
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া,
পতি, পিতা, পুত্র, তুমি আজি শৈলজার ;
পুণ্যবতী,—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।
আমি তার বনমাতা, বনে তার কত ভ্রাতা
করিবে বিরহে তার বনে হাহাকার,
বনের আলোক আজি হইল আঁধার।
পুত্র-প্রেম প্রস্রবণ, উদ্ধার করিতে বন,
শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
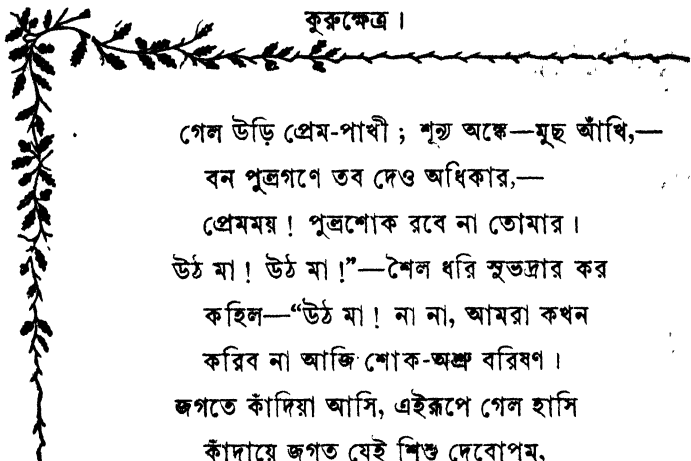
গেল উড়ি প্রেম-পাখী; শূন্য অঙ্কে—মুছ আঁখি,—
বন পুত্রগণে তব দেও অধিকার,—
প্রেমময়! পুত্রশোক রবে না তোমার।
উঠ মা! উঠ মা!"—শৈল ধরি সুভদ্রার কর
কহিল—"উঠ মা! না না, আমরা কখন
করিব না আজি শোক-অশ্রু বরিষণ।
জগতে কাঁদিয়া আসি, এইরূপে গেল হাসি
কাঁদায়ে জগত যেই শিশু দেবোপম,
আমরা তাহার তরে কাঁদিব না, তার তরে
করিবে অনন্ত কাল অশ্রু বরিষণ।
বর্ষিব না অশ্রুবিন্দু আমরা কখন।
উঠ মা! উঠ মা! ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে পুত্র সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাই কৃষ্ণনাম, মা গো! জুড়াই জীবন!
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর,
কাটিলেন বিধি যদি, উধাও উড়িয়া
তুই গৃহে, আমি বনে বন-বিহঙ্গিনী মত,
গাব কৃষ্ণনাম মা গো! বিশ্ব যুড়াইয়া।"
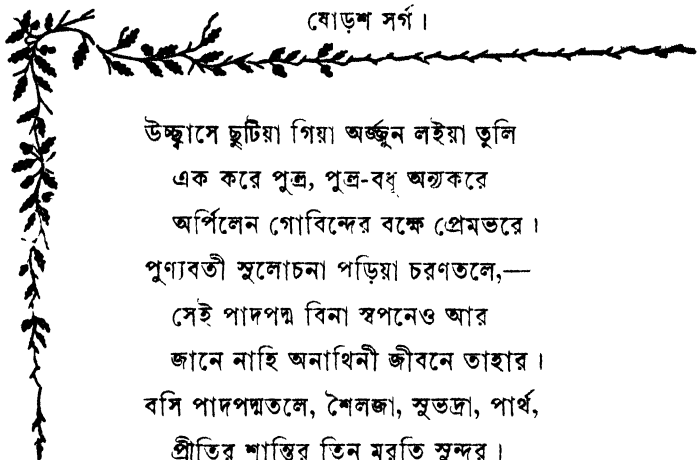
উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া অর্জ্জুন লইয়া তুলি
এক করে পুত্র, পুত্র-বধূ অন্যকরে
অর্পিলেন গোবিন্দের বক্ষে প্রেমভরে।
পুণ্যবতী সুলোচনা পড়িয়া চরণতলে,—
সেই পাদপদ্ম বিনা স্বপনেও আর
জানে নাহি অনাথিনী জীবনে তাহার।
বসি পাদপদ্মতলে, শৈলজা, সুভদ্রা, পার্থ,
প্রীতির শান্তির তিন মূরতি সুন্দর।
এতক্ষণ সুভদ্রার বহিল যুগল নেত্রে
পতিত-পাবনী প্রীতিধারা দরদর।
এক করে মৃত-পুত্র, অন্য করে পুত্র-বধূ
মূর্চ্ছিতা বিমুক্তকেশী লইয়া হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া নারায়ণ; কি মূর্ত্তি মহিমাময়!
ঊর্দ্ধনেত্রে নিরমল প্রীতিধারা বয়।
ঊর্দ্ধবাহু দ্বৈপায়ন, ঊর্দ্ধবাহু কুরুক্ষেত্র,
অশ্রুনেত্রে, প্রেমকণ্ঠে সায়াহ্ন-গগন
পূরিয়া গাইল "হরে! মুরারে!" তখন।
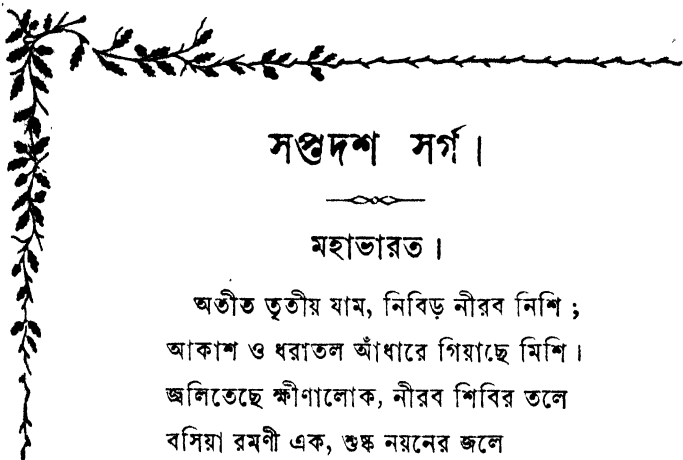
সপ্তদশ সর্গ।

মহাভারত।

অতীত তৃতীয় যাম, নিবিড় নীরব নিশি ;
আকাশ ও ধরাতল আঁধারে গিয়াছে মিশি।
জ্বলিতেছে ক্ষীণালোক, নীরব শিবির তলে
বসিয়া রমণী এক, শুষ্ক নয়নের জলে
অঙ্কিত কপোল শুষ্ক, যেন দেবী নিশীথিনী
হেমন্তের মূর্ত্তিমতী, শিশিরাক্ত, বিষাদিনী।
পড়েছে গৈরিক ঢাকি ধূসরিত কেশভার,
হেমন্তে বিষাদ-মাখা শিশিরাক্ত অন্ধকার।
দক্ষিণ কপোল বামা রাখিয়া দক্ষিণ করে
চেয়ে আছে অধোমুখে শোকের আবেগ ভরে।
শোভিতেছে অঙ্কে সুপ্তা মূর্চ্ছিতা রমণী আর,
নিশীথিনী কোলে যেন বিশুষ্ক কুসুম-হার।
আচ্ছন্ন করিয়া অঙ্ক পড়িয়াছে কেশাবলী,
শৈবালে পড়িয়া যেন ছিন্ন কমলের কলি।
শোকে শুভ্র অর্দ্ধ কেশ, নয়ন গিয়াছে বসি ;
শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী।

বিশুষ্ক আরক্তাধার ; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস ;
নিদ্রা যাইতেছে যেন ছিন্ন-বীণা-শোকোচ্ছ্বাস ।
বহুক্ষণ পরে বালা মেলিল নয়ন ধীরে ;
চাহি আত্মহারা মত স্থির নেত্রে রমণীরে
জিজ্ঞাসে—"কে আমি ?"
"তুমি উত্তরা মা ! আদরিণী !"
"উত্তরা কে ?"—"উত্তরা মা ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী ।"
"উত্তরা ! উত্তরা আমি ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী !"—
বিস্ময়ে কহিয়া, রহে শূন্য চাহি বিষাদিনী ।
শিবির প্রাচীরে দীর্ঘ প্রশস্ত দর্পণ পানে
চাহিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ—"কারা বসি ওইখানে ?"
আত্মহারা বালিকার ভগ্ন-কণ্ঠে নারীপ্রাণ
উঠিল কাঁদিয়া, বামা করিল উত্তর দান,—
"কেহ নহে, দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা ! তোমার
দেখিতেছ, দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা ! আমার !"
"উত্তরা—উত্তরা আমি ! প্রতিবিম্ব উত্তরার !
উত্তরার শুভ্র কেশ ! ওই মুখ ! চোক আর !"
ভিজিল তাপসী আঁখি,—ছয় দিনে উত্তরার
কি দারুণ শোকে শুভ্র হইয়াছে কেশ ভার !

"কে তুমি ?"—"শৈলজা আমি বনবালা উদাসিনী"
"না, তুমি মা ! স্বপ্ন-দেবী। স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি,
পূর্ণচন্দ্র বক্ষ হ'তে হায় মা ! পড়িনু আমি
আঁধার পাতালে, শৈলে,—কি কঠিন শিলাখানি !
চূর্ণিত হইল দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক।
আসিলেন নারায়ণ,—কি করুণাপূর্ণ মুখ !
পাতাল হইল পূর্ণ কি আলোকে নিরমল,
কি মধুর হরিনামে পূর্ণ হ'ল রসাতল।
চুম্বিয়া ললাট, করি সঞ্জীবনী সুধা দান,
পবিত্রা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান।
তুমি কি সে স্বপ্ন দেবী ? এবা কোন্ পুণ্যভূমি ?—
স্বপ্ন-রাজ্য ? দেব-রাজ্য ?"—"তোমার শিবিরে তুমি।"
"শিবিরে ! শিবির কোথা ?"—"কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে।"
রহিল বালিকা শুনি চাহি শূন্যস্থির নেত্রে।
কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্র-কর-লেখা,
যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
স্মৃতির আলোক ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরার
ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম-ভ্রান্তি অন্ধকার।
অনেক দিনের দূর-বিস্মৃত সঙ্গীত মত
পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত

সপ্তদশ সর্গ।

সুখপূর্ণ, শোকপূর্ণ ;—পিতৃগৃহ নাট্যালয়,
বৃহন্নলা, সে অপূর্ব্ব উত্তর গোগৃহ-জয়,
কৌরবের বেশ ভূষা, আনন্দে পুতুল খেলা,
পাণ্ডবের পরকাশ, বিবাহ—আনন্দ মেলা,
ছয় মাস সুখস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র মহারণ,
এ শিবির, চক্রব্যূহ, হত-পতি-দরশন,—
তার পর অন্ধকার, মনে পড়িল না আর ;
পড়ে গেল যবনিকা, রুদ্ধ নাট্যগৃহ-দ্বার !
স্মৃতির সমীরে ধীরে জ্বালাইল শোকানল,
কাঁদিতে চাহিল বালা, কিন্তু কোথা অশ্রুজল ?
শোকের সন্তাপে তীব্র নয়নের নিরঝর
গিয়াছে শুকায়ে ; শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখ ইন্দীবর
লুকা'ল শৈলজা-বক্ষে, হায় ! শৈলজার প্রাণ
আবার উঠিল কাঁদি। করিতে চুম্বন দান
উষ্ণ দুই অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া মুখে
উত্তরার বিমলিন, শুষ্ক শতদল বুকে
নিশির শিশির যথা ; বিস্ময়ে কহিল বালা,—
"কেন মা কাঁদিস্ তুই ? তোর বুকে এই জ্বালা
কে জ্বালিল ? বনমাতা তুই কি অভির হায় ?
শৈলজার অশ্রুধারা বহিল বেগে ধারায়।

"আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী।"
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল কাতরে অতি—
"হায় মা! হায় মা! তোরো এ অমৃত প্রস্রবণে
জ্বালিলা বাড়বানল বিধি অকরুণ মনে?"
"না মা!"—উত্তরিলা শৈল—"মরুভূমে অভাগীর,
দিয়া আত্ম-প্রাণ বাছা ঢালিয়াছে প্রেমনীড়
বরিষার মেঘ মত, সহি বুকে বজ্রাঘাত;
ধর্ম্মরাজ্য তরে করি এইরূপে প্রাণ পাত।
বনমাতা হয় যেন হায়! যোগ্য মাতা তার!
স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার।"
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে"—মূর্চ্ছাগতা উত্তরার
নাহি জ্ঞান ছয় দিন গিয়াছে বহিয়া আর,—
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে, বসি এই বাতায়নে
নবোদিত চন্দ্রকরে, প্রেম-উচ্ছ্বসিত মনে'
মা গো! তোর প্রেম কথা গাইল সঙ্গীত মত,
অপূর্ব্ব কল্পনা বলে সৃজি স্বর্গ শত শত
ফলিল না একটীও ভাগ্যে হায়! উত্তরার,
অভাগিনী তার মত কে আছে জগতে আর?
বালকের ধূলা সৃষ্টি একই নিশ্বাসে হায়!
নিল মা গো! উড়াইয়া নিদারুণ বিধাতায়।

বড় সাধ ছিল মনে যুদ্ধ অন্তে অভাগীরে
ল'য়ে যাবে বনে তোর, মা গো! তোর স্নেহ নীড়ে।
ভাবে নাই, ভাবি নাই, হায়! হেন অনাথিনী
আসিব মা অঙ্কে তোর!"—রুদ্ধ শোক নির্ঝরিণী
উথলিল যেই বেগে বক্ষে চক্ষে শৈলজার,
বুঝিল বিরাটবালা, কথা কহিল না আর।
"রেখে গেছে অভিমন্যু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি ওর"—
চাপি শোক কহে শৈল—"মা গো! পুণ্যগর্ভে তোর।
পুত্র কোলে করি তুই যাইবি আমার বনে।
এ অভির বন-খেলা নিরখিব দুইজনে।
গৃহভূমি, বনভূমি, বাঁধিয়া প্রেম-বন্ধনে
নির্ম্মাইব ধর্ম্ম-রাজ্য, বসাইব সিংহাসনে
পুত্রে তোর, রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার।
পুত্র সুখে, প্রজা সুখে, রহিবে না শোক আর।

"রবি অস্ত গেলে হায়!"—ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস,
কহিতে লাগিল বালা চাপিয়া শোক-উচ্ছ্বাস,—
"রবি অস্ত গেলে হায়! দিবা কি থাকিতে পারে?
অস্ত গেলে শশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে।
পাদপ হইলে ভস্ম, ছায়া কি থাকে কখন?
নির্ঝর হইলে শুষ্ক ধারা হয় অদর্শন।

প্রদীপ হইলে ভগ্ন, শিখা কি কখনো রয় ?
বাঁচে কি নলিনী, যদি শুষ্ক হয় জলাশয় ?
কুরুক্ষেত্র-মহাঝড়ে তরু উত্তরার হায় !
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
আশীর্ব্বাদ কর মা গো ! সমর্পিয়া ফল তার
করে মাতা সুভদ্রার, সুলোচনা, শৈলজার,
তরু পদ মূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ ;
আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান।
তৃতীয়ার চন্দ্র যদি হলো অস্তমিত হায় !
অস্ফুট জ্যোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায়।
হায় মা ! হায় মা ! বিধি"—দর্পণে পড়িল আঁখি,
মুহূর্ত্ত বিরাট-বালা নীরবে চাহিয়া থাকি—
"হায় মা ! হায় মা ! বিধি সে আশাও উত্তরার
বুঝি বিনাশিলা, মন কি কঠিন বিধাতার !
ওই মুখ, ওই চোক, ওই শুক্ল কেশ, হায় !
নিরখিয়া প্রাণনাথ চিনিবে কি উত্তরায় ?"

উভয় নীরব রহে শোকবেগে কিছুক্ষণ।
উত্তরা কহিল পুনঃ পর-দুঃখে আর্দ্র মন—

সপ্তদশ সর্গ।

"নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক-পারাবার—
ভাঙ্গিবে কপাল মা গো! আরো কত উত্তরার!"
"হইয়াছে যুদ্ধ শেষ।"
"শেষ!"—চমকিল বালা।
"শেষ"—উত্তরিল শৈল বিষাদিনী—"মহাজ্বালা
নিবিয়াছে জগতের; ভস্মিয়া ক্ষত্রিয়-বন
নিবিয়াছে অধর্ম্মের যুগব্যাপী হুতাশন।
ছিল যেই স্নেহে সিক্ত অর্জ্জুনের বীর্য্যানল,
হরিলে কৌরব সেই অভিমন্যু স্নেহ-জল,
উদ্গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন,
দুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পরাক্রম;
দুই দিনে কর্ণ আর,—কর্ণ করে নাহি রণ,
শিশু-হত্যা-পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জ্জন।
এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুর্য্যোধন।
কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান
অধর্ম্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান!
কৃপ, কৃতবর্ম্মা, আর দ্রোণ-পুত্র দুরাশয়,—
আছে মাত্র কৌরবের এই মহারথী ত্রয়।

উ। পাণ্ডব ও নারায়ণ?

শৈ। আছেন মঙ্গলে সব;

পরিণামে ধর্ম্মের মা। নাহি হয় পরাভব।

উ। মা সুভদ্রা?

শৈ। দেবী তিনি, তাঁর অমঙ্গল নয়

সম্ভব মা!

উ। সুলোচনা?

শৈলজা নীরবে রয়।

উত্তরা আকুল শোকে কহিল উচ্ছ্বাসে—"হায়!

তুই ও মা! গেলি চলি ফেলি তোর উত্তরায়।

আছিল হৃদয় তোর ক্রীড়া গোলকের মত

অভিমন্যু সমীরণে প্রপূরিত অবিরত!

হায়! নিদারুণ কাল কেমনে লইল হরি

সেই স্নেহ-সমীরণ গোলক বিদীর্ণ করি!

যেই শিশু-বৃক্ষ মা গো! হৃদয়ে করি রোপণ

পালিলি ষোড়শ বর্ষ, কুরুক্ষেত্র প্রভঞ্জন

উপাড়ি ফেলিল ভূমে, কোমল হৃদয় তোর

ফেলিল উপাড়ি, তবু ছিঁড়িল না স্নেহ-ডোর!"

নীরবে রহিয়া বালা জিজ্ঞাসিল আরবার—

"কুশলে ত আছে বল পিতা ভ্রাতা মা! আমার?"

নীরব রহিলা শৈল। সে নীরব সমাচার
পশিল বালিকা-প্রাণে, তুলিল কি হাহাকার!
অশ্রুবিন্দু নাহি দিল স্তিমিত নয়নে দেখা।
না হইল রূপান্তর মুখের একটী রেখা।
করিতে সে শোকচিত্রে রেখাটী গভীরতর
না পারিল পিতৃ-শোক ভ্রাতৃ-শোক চিত্রকর!
হায়! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার,
শত বিষধরে দংশি কি আর করিবে তার?
হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ?
কেবল কহিল বালা—"হায়! তবে উত্তরার
পিতার গৃহও শূন্য, হইয়াছে অন্ধকার!
সে বিরাট-রাজপুরী, বিরাট শ্মশানপ্রায়,
করিতেছে হাহাকার, করাল কাল ছায়ায়!
হায় বাবা! হায় দাদা! বড় আদরের ছায়া
ছিল যে উত্তরা, হায়! কেমনে কাটিয়া মায়া
এক সঙ্গে পিতা পুত্র গেলে চলি পতি সনে,
ফেলি এই বালিকায় হেন অকরুণ মনে?
হায় মা! আছিল অঙ্কে উত্তর উত্তরা তোর।
উত্তর গিয়াছে চলি, উত্তরার স্বপ্ন ভোর!

সকলে মা! গেল চলি"—চাহি শৈলজার মুখ—
"তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক!
ছয় দিন মৃতপ্রায় ছিলাম মূর্চ্ছিতা আমি,
তবু নাহি মরিলাম,—আমি কি পাষাণখানি!"

শৈ। জীবনের আশা বাছা! ছিল কি তোমার আর?
যোগস্থ হইয়া হরি জাগাইলা পুনর্ব্বার!

উ। কেন দয়াময় হরি অনাথিনী এ কন্যায়
বাচাইয়া, শুষ্কলতা অর্পিলা অনলে হায়?

শৈ। তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা! গর্ভে তোমার,
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশা-তরু, ধর্ম্মরাজ্য-ভিত্তিভূমি,
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্ম-রাজ্য-লক্ষ্মী তুমি।

উ। আছে ত কুশলে মাত! দেবর পঞ্চ আমার?

শৈ। পাণ্ডব, সাত্যকি, কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি আর।
নিশীথে পশিয়া, মেষ-শালায় শার্দ্দূল মত,
অশ্বত্থামা পঞ্চ শিশু নিদ্রায় করেছে হত।
কালী নিশীথিনী অঙ্কে হইয়াছে অভিনীত
অধর্ম্মের শেষ অঙ্ক, পাপপূর্ণ, শোকান্বিত।
পড়িয়াছে যবনিকা, জ্বলিয়াছে কি শ্মশান
কুরুক্ষেত্রে!—নারায়ণ! কর পূর্ণ মনস্কাম!
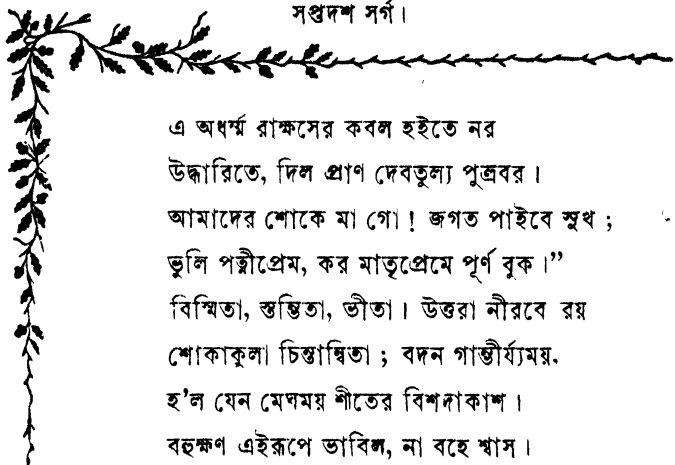
এ অধর্ম্ম রাক্ষসের কবল হইতে নর
উদ্ধারিতে, দিল প্রাণ দেবতুল্য পুত্রবর।
আমাদের শোকে মা গো! জগত পাইবে সুখ;
ভুলি পত্নীপ্রেম, কর মাতৃপ্রেমে পূর্ণ বুক।”
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভীতা। উত্তরা নীরবে রয়
শোকাকুলা চিন্তান্বিতা; বদন গাম্ভীর্য্যময়.
হ'ল যেন মেঘময় শীতের বিশদাকাশ।
বহুক্ষণ এইরূপে ভাবিল, না বহে শ্বাস।
উঠি ধীরে ধীরে শেষে, কহিল—“মা! চল যাই।”

শৈ। কোথায়?

উ। মা! উত্তরার এক ভিন্ন স্থান নাই,—
পতির জ্বলন্ত চিতা।

কাঁপিয়া উঠিল বুক
শৈলজার দুরু দুরু; কহে অশ্রুপূর্ণ মুখ—
“পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর
নাহি কি রমণী-ব্রত উচ্চতম, মা আমার?”
“আছে”—স্থিরকণ্ঠে বামা কহি দাঁড়াইল ধীরে—
“পালিব তা, মাখিয়া মা! পতিপদ-ভস্ম শিরে।”
নীরবে শিবির হ'তে বাহিরিল দুই জন।
আর চলিল না পদ—ও কি দৃশ্য বিভীষণ!

কুরুক্ষেত্র।

তৃতীয় প্রহর নিশি ; জ্বলিতেছে অগণিত
চিতা কুরুক্ষেত্র-বক্ষে,—জ্বলিতেছে সংখ্যাতীত
চিতা বক্ষে ভারতের, জ্বলিতেছে অনিবার
ক্ষত্রিয়ের গৃহে গৃহে, বক্ষে বক্ষে অনাথার।
নিবিড় সূচিকাবিদ্ধ অমাবস্যা অন্ধকারে
জ্বলিতেছে চিতাশ্রেণী ; কুরুক্ষেত্র চিতাহারে
কালের জীবন্ত মূর্ত্তি করি যেন অভিনয়,
দেখাইছে কাল-গর্ভ বিরাট শ্মশানালয়।
যোজন যোজন ব্যাপী, স্থানে স্থানে নদীতীরে
জ্বলে রথীদের চিতা, প্রতিবিম্বে নদীনীড়ে
জ্বলিছে অনন্ত চিতা,—কি যে কি ভীষণ ছবি!
নদীগর্ভে অস্ত যেন হতেছে অনন্ত রবি!
হায়! এক মহাচিতা ততোধিক বিভীষণ
যথায় হইল ভস্ম অনাথ সৈনিকগণ,—
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,—ক্ষুদ্র অগ্নি পারাবার,—
জ্বলিতেছে দূরে, মনে আতঙ্ক করি সঞ্চার।
মহা নরমেধযজ্ঞ হইয়াছে সমাপন,
নিশিশেষে ধীরে ধীরে নিবিতেছে হুতাশন।
অনন্ত শ্মশান-ধূমে সমাচ্ছন্ন শীতাকাশ।
একটি নক্ষত্র নাহি হইতেছে পরকাশ।

সপ্তদশ সর্গ।
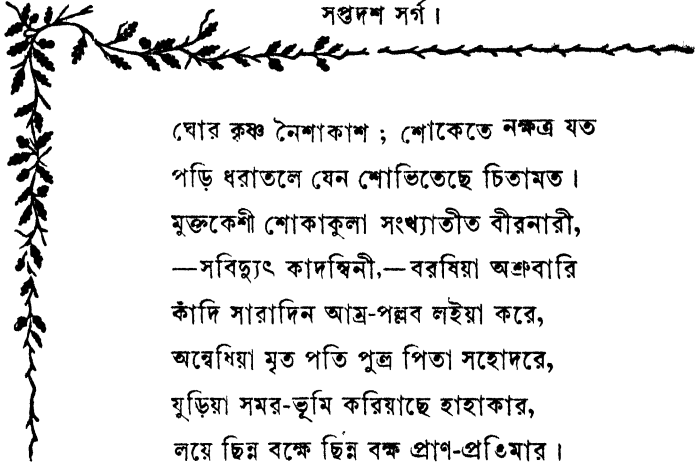
ঘোর কৃষ্ণ নৈশাকাশ ; শোকেতে নক্ষত্র যত
পড়ি ধরাতলে যেন শোভিতেছে চিতামত।
মুক্তকেশী শোকাকুলা সংখ্যাতীত বীরনারী,
—সবিদ্যুৎ কাদম্বিনী,—বরষিয়া অশ্রুবারি
কাঁদি সারাদিন আম্র-পল্লব লইয়া করে,
অন্বেষিয়া মৃত পতি পুত্র পিতা সহোদরে,
যুড়িয়া সমর-ভূমি করিয়াছে হাহাকার,
লয়ে ছিন্ন বক্ষে ছিন্ন বক্ষ প্রাণ-প্রতিমার।
শোকের বরিষা এবে হইয়াছে অবসান,
এখনো কাঁদিছে কেহ ভগ্নকণ্ঠ, ভগ্নপ্রাণ,
আঁধার শিবিরে ধীরে। শকুনী শৃগালদল
ঘন নৈশ নীরবতা বিদারিয়া কোলাহল
করিতেছে স্থানে স্থানে, করিতেছে ছুটাছুটি ;
কত বিভীষিকা যেন আঁধারে উঠিছে ফুটি।
কাঁপিল বালিকা-বক্ষ, ধরি শৈলজার গলা,
রাখি বুকে মুখ, কহে বালিকা শোকবিহ্বলা—
"হায় মাতঃ! ধীরে ধীরে নিবিছে ঐ চিতাগণ,
আমাদের বক্ষ-চিতা এরূপে কি নির্ব্বাপণ
হইবে মা? হইবে মা! এইরূপে অবসান
আমাদের শোক-নিশি, হায়! জুড়াইবে প্রাণ?"

"কয় চিতা আমাদের ?"—কহে শৈল সাশ্রুচক্ষে,—
"দেখ মা ! অনন্ত চিতা ভারত-মাতার বক্ষে !
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম্ম তিমির রাশি,
নব-ধর্ম্ম উষা ওই আনন্দে উঠিছে ভাসি।
ওই কাকলির কলে উঠিছে মা ! কৃষ্ণনাম
জুড়াতে জগত-প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ।"
লয়ে উত্তরায় বক্ষে বনবালা ধীরে ধীরে
গেল পতি চিতামূলে। দূর হিরণ্বতী-তীরে,
অশোক পাদপ-মূলে সে পবিত্র তীর্থধাম
প্রণমিলা কি উচ্ছ্বাসে উছলিল দুটী প্রাণ !
প্রিয় পুত্র লয়ে বক্ষে সুলোচনা পুণ্যবতী
লভিয়াছে নিরবাণ একই চিতায় সতী।
ত্রিদিব বীণার বক্ষে যেন পুণ্যময় গীত
হইয়াছে লয়, বীণা হইয়াছে অন্তর্হিত।
ব্যোম-বিহারিণী তরী হইয়া গগনোত্থিত,
আলোক সহিত যেন হইয়াছে অলক্ষিত।
নির্ব্বাপিত প্রায় চিতা ! ক্ষীণালোকে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া অন্তরালে করিলেন দরশন
উত্তরার শোক-ছবি, বিদীর্ণ হইল বুক,—
কি আলোকে, ও কে বসি, হায় ! এ কাহার মুখ !

সপ্তদশ সর্গ।
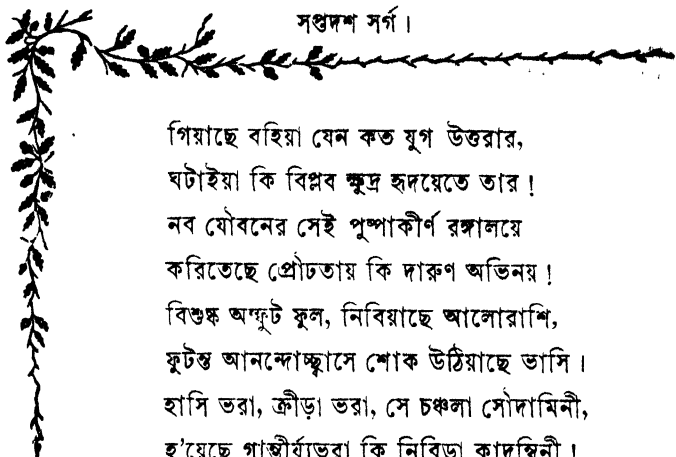
গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার,
ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার !
নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ রঙ্গালয়ে
করিতেছে প্রৌঢ়তায় কি দারুণ অভিনয় !
বিশুষ্ক অস্ফুট ফুল, নিবিয়াছে আলোরাশি,
ফুটন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে শোক উঠিয়াছে ভাসি।
হাসি ভরা, ক্রীড়া ভরা, সে চঞ্চলা সৌদামিনী,
হ'য়েছে গাম্ভীর্য্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী !
জ্যোৎস্না-প্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুম লতা,
এবে শুষ্কা, অর্দ্ধদগ্ধা হায় ! বজ্রাঘাতে যথা !

অশোক পাদপ মূলে শোকে দাঁড়াইয়া হরি,
অদৃশ্য, আঁধারে স্থির, বৃক্ষে শির রক্ষা করি,
ঘোর ঝটিকায় পূর্ণ যেন মহা জলধর,
রুদ্ধ করি সে বিপ্লব রহিয়াছে স্থিরতর।
অনিমিষ-নেত্রে কৃষ্ণ চাহি উত্তরার পানে ;
দেখে না উত্তরা, কহে উদ্দেশে আকুল প্রাণে,—
"কোথায় রহিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি !
এই শোক-পারাবারে দেও নাথ ! পদতরী !

তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়,
ছিল তব রূপ সম যে রূপ মাধুর্য্যময়,
মাতা সুভদ্রার ছবি সেই মুখ মনোরম,
তোমার দেবত্বে মাখা পার্থ-বীর্য্যে হুতাশন,
বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার,
এরূপে কি হ'ল ভস্ম ? চিহ্ন রহিল না তার !
অর্জ্জুনের প্রাণ-পুত্র, প্রাণ-পুত্র সুভদ্রার,
গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য, না, না, নাহি মৃত্যু তার।
ঝলসিয়া চন্দ্রলোক কি গৌরবে প্রাণেশ্বর !
বিরাজিছ ! শিরে কিবা কিরণ-কিরীটিবর !
কি সুন্দর বীর বেশ ! কিবা স্বর্গ মনোহর !
আনন্দে অপ্সরাগণ বর্ষিতেছে নিরন্তর
কি কুসুম সুবাসিত ! কি সঙ্গীত সুকোমল
উথলিছে ! বরষিছে কি অমৃত সুশীতল !
সতৃষ্ণ নয়নে নাথ ! দেখিছ কি উত্তরায় ?
চিনিতে কি পার তারে ? তার এই দশা, হায়,
কেমনে রয়েছ চাহি ? লও বুকে এক বার,
কহিয়া একটি কথা জুড়াও জীবন তার।
পৃথিবীতে ছয় মাস দিয়া তারে স্বর্গ সুখ,
কেমনে চলিয়া গেলে বিদীর্ণ করিয়া বুক !

প্রেমের মুকুল তব সঞ্চারিয়া এ লতায়,
কেমনে চলিয়া গেলে অকরুণ প্রাণে হায় !
ক্ষমা কর ছয় মাস ; প্রসবিয়া সেই ফুল,
রাখি তব প্রতিরূপ, রক্ষা করি কুরুকুল,
ছয় মাস পরে,—নাথ ! ছয় যুগ উত্তরার—
উত্তরা আসিবে অঙ্কে, স্বর্গে তার তপস্যার ।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু, অনাথার দীর্ঘ মৃত্যু এ জীবন ।
কর আশীর্ব্বাদ, নাথ ! এ অনন্ত মৃত্যু-ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ !”

বসি আত্ম-হারা শৈল চাহি আকাশের পানে
সেই চন্দ্রলোক, চন্দ্র, নিরখিতেছিল ধ্যানে ।
স্বপ্ন-উত্থিতার মত চিতা ভস্ম লয়ে করে,
উভয় ললাটে মাখি কহিল উচ্ছ্বাস ভরে—
“কর আশীর্ব্বাদ, বৎস ! তব বনমাতা ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ !”
বিরাট, উত্তর, চিতা পার্শ্বে প্রণমিয়া, ধীরে
নীরবে উভয় শোকে চলিলা শূন্য শিবিরে ।
এখনো অশোক মূলে দাঁড়াইয়া নারায়ণ,
প্রস্তর মূরতি যেন অনিমিষ দুনয়ন ।

আসিলেন ধনঞ্জয় সুভদ্রা জননী সঙ্গে,
বসিলেন চিতামূলে ;—উত্তাল শোক তরঙ্গে
অর্জ্জুনের ভাসিতেছে শান্তি ছায়া ; জননীর
অনন্ত অতলস্পর্শী শোক সিন্ধু এবে স্থির ।
একটি লহরী মাত্র, তুলিল এক উচ্ছ্বাস,
পুত্রের শ্মশান ছায়া ; বহিল একটি শ্বাস
কেবল একটি কথা কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয় ।"
"না না, নাথ !"—ভদ্রাদেবী উত্তরিলা কণ্ঠস্থির
"পবিত্রিত, বিগলিত, তরলিত প্রেমনীড়
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ,
জুড়াতে জগত-প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণনাম ।
সুলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু আত্ম-দান,—
নব ধর্ম্ম-রাজ্য ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম ।
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্ম্মব্রত শ্রেষ্ঠতর,
মাখি পুত্র-ভস্ম বুকে হও কর্ম্মে অগ্রসর ।
পুত্রের সুযোগ্যা মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা,
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্ম্মামৃতে ; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখ শান্তি পারাবার ।

শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্ব-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতি পত্নী নিরবাণ!"
পুত্রের চিতার ভস্ম উভয় মাখিয়া বুকে,
যোগী যোগিনীর বেশে, চলিলা শিবিরমুখে।
হইল ঝটিকাপূর্ণ জলধর বিচলিত,—
হয়ে অগ্রসর কৃষ্ণ, হৃদয়েতে উদ্বেলিত
মাখিলেন সেই ভস্ম; ঊষার আকাশ পানে
চাহিয়া কহিলা শোক-প্রীতি-উদ্বেলিত প্রাণে—
"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি; মানবের মুক্তি-পথ
রক্ত-সিন্ধু গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শ্মশান মাত্র করি নাথ! প্রজ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত-পারাবার, কৃষ্ণের তপ্তশোণিত
প্রতি বিন্দু সে সিন্ধুর; হা নাথ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।

প্রতি রমণীর কণ্ঠ, অনাথার হাহাকার,
গান্ধারীর শোকোচ্ছ্বাস, শোক-ছবি উত্তরার,
অর্জ্জুনের উন্মত্ততা, সে বৈরাগ্য সুভদ্রার,
করিয়াছে কৃষ্ণ-প্রাণে শেলাঘাত অনিবার।
রাজসূয়ে বিনির্ম্মিত ধর্ম্মরাজ্য বাতাহত
পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির সৃজন মত,
বুঝিলাম তব ইচ্ছা, বিনা এই রক্ত দান,
এ অগ্নি পরীক্ষা বিনা, হইবে না নিরমাণ
ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে ; হইবে না কদাচিত
খণ্ড এ ভারতে মহাভারতরাজ্য স্থাপিত।
দিলাম অনলে ঝাঁপ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্ত-ধারা অষ্টাদশ দিন ধরি,
তথাপিও প্রাণাধিক কুমারের এ শ্মশান
জ্বালালে কৃষ্ণের প্রাণে হায় নাথ! অনির্ব্বাণ।
নিষ্পাপ মানব-পুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ?
নাহি দুঃখ, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
তুমি সহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান
পাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনস্কাম!—
কর এবে ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য নিরমাণ।

ওকি দৃশ্য !"—নারায়ণ স্বপনে যেন নিদ্রিত
দেখিলেন কুমারের চিতা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত
হইল, ছুঁইল অগ্নি প্রভাত-নভঃমণ্ডল,
ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্বলিত চিতানল।
উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি,—মাতা রাজরাজেশ্বরী।
নব ধর্ম্ম-বেদি-মূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য্য অনার্য্যের—ধ্যানে ; বেদি-বক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি ; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম্ম মল, রক্তবর্ণ কলেবর ;
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
—সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র,—হইয়াছে শোভমান
চারি ভুজে চারি দিকে ; ত্রিনেত্রে ত্রিকাল-জ্ঞান।
ধর্ম্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বাল-রবি।
অনন্ত মানব ব্যাপী ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম।
পূর্ণ জীবনের ব্রত ; মন প্রাণ উদ্বেলিত,
"মা ! মা !"—বলি নারায়ণ আনন্দাশ্রু বিগলিত,

পড়িলেন ধরাতলে মানব-প্রেমে মূর্চ্ছিত
কুমারের চিতাপার্শ্বে ;—পূর্ব্বাকাশ বিভাসিত
হইল প্রভাতালোকে, বাজিয়া উঠিল ধীরে
অনন্ত মঙ্গল বাদ্য, প্লাবিয়া আনন্দনীড়ে
কুরুক্ষেত্র সুমঙ্গল উঠিল আনন্দ গীত,
ধর্ম্মরাজ,—ধর্ম্মরাজ্য,—করি উচ্চে বিঘোষিত।
আসিলেন ভদ্রার্জ্জুন, উঠিলেন নারায়ণ,
আসিলেন ধীরে ধীরে শৈল সহ দ্বৈপায়ন।
অগ্রে কুমারের চিতা, পূরব গগন পানে
চাহি স্থির নারায়ণ রহিলেন যোগধ্যানে।
পার্শ্বে স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে
উভয়ের, তিন মুখ ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে।
তিনের গৈরিক বেশ, বুক চিতাভস্মে মাথা,
ভদ্রার গৈরিক আলুলায়িত কুন্তলে ঢাকা।
চিতার অপর পার্শ্বে জানু পাতি ধরাতলে
বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল ধারা-যুগলে।
পার্শ্বে স্থির দ্বৈপায়ন, কপোলে যুগল ধারা,
কহিলেন দেব-ঋষি প্রেমানন্দে আত্ম-হারা—
"কি ত্রিমূর্ত্তি অপার্থিব ! ভারত—জগত—বাসি !
দেবগণ ! ঋষিগণ ! একবার দেখ আসি !

জ্ঞানদেব নারায়ণ ; বলদেব ধনঞ্জয় ;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা ; সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্ম-বিসর্জ্জন ; জ্ঞান, বল, আত্ম-দান,
ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।
এই চতুর্ব্বর্গ, এই মানবের মোক্ষধাম,—
দ্বাপরের অবতার ! পূর্ণ তব মনস্কাম !
পূর্ণকাম দ্বৈপায়ন, এই মহাতীর্থ ধাম
দেখিল নয়ন ভরি, দেখিল ভরিয়া প্রাণ।
নারায়ণ ! জগন্নাথ ! দেও শক্তি ধরি ধ্যান,
আনন্দে গাইব তব এ মহাভারত গান।
শুনিয়া সে গীত, করি কৃষ্ণনামামৃত পান,
মানব লভিবে মুক্তি, ধরা হবে স্বর্গধাম।"

গুরু দেব পদরজ শৈলজা লইয়া শিরে,
আকুল কাঁদিয়া বালা কহিতে লাগিল ধীরে,—
"হে গুরো ! কৃপায় তব, হা পুত্র ! স্নেহেতে তোর,
অনার্য্য মাতার তোর আজি নারী-জন্ম ভোর।
জগন্নাথ ! জগৎপতে ! আর্য্য অনার্য্যের হরি !
হে নীলমাধব ! দেও পদাম্বুজ দয়া করি
পতিত অনার্য্যগণে, পতিতপাবন নাম
দেও বনপুত্র-মুখে, ধর্ম্মরাজ্যে দেও স্থান !"

নিগুর্ণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দুটী ফুল,
একটী পড়িল ঝরি অকালে পুষ্প-মুকুল
তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্ম্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম-বৃন্তে। এই কলি সুকুমার
ফুটাইয়া প্রেম-করে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃ-প্রেম-অশ্রুজলে।
দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল! দিও শিক্ষা আত্ম-দান!
দিও পদাম্বুজ-ছায়া! ধর্ম্মরাজ্যে দিও স্থান!
শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান!

অষ্টম সর্গ

সূর্য্যমুখী ।
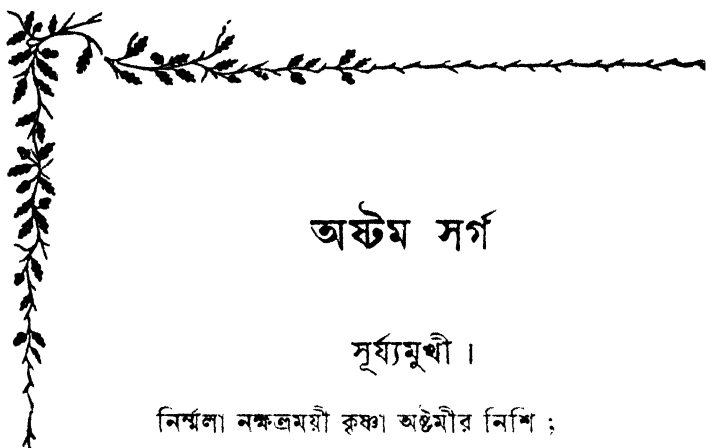
নির্ম্মলা নক্ষত্রময়ী কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি ;
স্বচ্ছ সলিলের মত স্বচ্ছ অন্ধকার ।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি ফুটেছে নির্ম্মলাকাশে,
ফুটিয়াছে হিরণ্বতি ! বক্ষেতে তোমার ।
বসিয়া রমণী এক নীরব আনতমুখী ।
দ্বিতীয়া শায়িতা অঙ্কে, নীলাব্জের হার,
মূর্চ্ছিতা, মুদ্রিত-নেত্রা ; পার্শ্বে এক বীরোত্তম
জানু পাতি ভূমে ; মুখে কথা নাহি কার ।
অঞ্জলি করিয়া বারি বর্ষিছেন বীরবর,
নিমীলিত নেত্রে, চারু ললাটে বামার ।
কুন্তল আলুলায়িত পড়িয়াছে ধরাতলে,
অষ্টমীর অন্ধকার করিয়া আঁধার ।
নিমীলিত নীলোৎপল ধীরে ধীরে উন্মোষিল
একবার আত্মহারা চাহি শূন্য পানে,
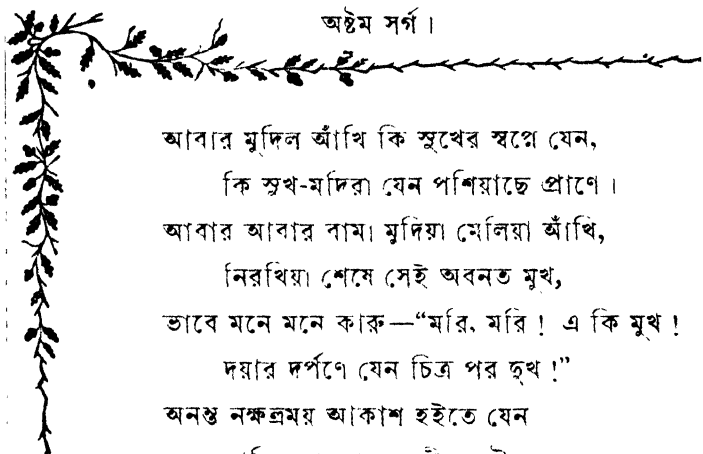
আবার মুদিল আঁখি কি সুখের স্বপ্নে যেন,
কি সুখ-মদিরা যেন পশিয়াছে প্রাণে।
আবার আবার বামা মুদিয়া মেলিয়া আঁখি,
নিরখিয়া শেষে সেই অবনত মুখ,
ভাবে মনে মনে কারু—"মরি, মরি! এ কি মুখ!
দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পর দুখ!"
অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশ হইতে যেন
নামিয়া নক্ষত্র এক শীতল উজ্জ্বল,
রহিয়াছে স্থিরভাবে বামার বদন'পরে
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহি ছল ছল।
জরৎকারু কিছুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে
চাহি সেই মুখ, সেই করুণার ছবি,
জিজ্ঞাসে বিস্ময়ে বামা, ক্ষীণ অস্ফুটিত কণ্ঠে,—
"কে তুমি রমণী? তুমি দেবী, কি মানবী?"
"ভগিনী! রমণী আমি, সুভদ্রা আমার নাম"—
উত্তরিলা ভদ্রা—"কথা কহিও না আর।"
জ্যোৎস্নাময়ীর কণ্ঠে বাসন্তী জ্যোৎস্না যেন
বরষি অমৃত প্রাণে পশিল বামার।
সুভদ্রা!—চমকি কারু, আবার রহিল চাহি
সেই মুখ পানে, স্থির বিস্মিত অন্তরে।
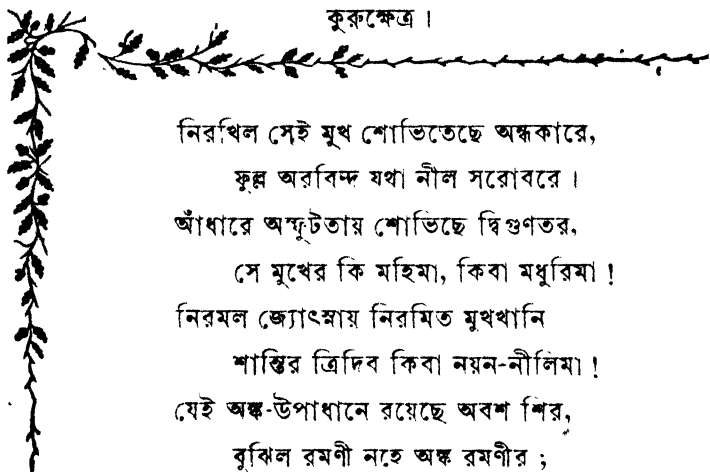
নিরখিল সেই মুখ শোভিতেছে অন্ধকারে,
ফুল্ল অরবিন্দ যথা নীল সরোবরে।
আঁধারে অস্ফুটতায় শোভিছে দ্বিগুণতর,
সে মুখের কি মহিমা, কিবা মধুরিমা!
নিরমল জ্যোৎস্নায় নিরমিত মুখখানি
শান্তির ত্রিদিব কিবা নয়ন-নীলিমা!
যেই অঙ্ক-উপাধানে রয়েছে অবশ শির,
বুঝিল রমণী নহে অঙ্ক রমণীর;
ত্রিদিব-কুসুম-রাশি স্তবকে স্তবকে যেন,—
সুশীতল সুকোমল স্বর্গ অবনীর।
কোমল কোমল কর বুলাইতেছিলা দেবী
ললাটে, কপোলে, সিক্ত কেশে রমণীর,
কোমল—কোমলতর—স্বপনে কোমলতার,
বুঝিল সে কর কারু নহে মানবীর।
হায় রে! বুঝিল কারু এত দিনে বাসুকির
সে দারুণ নিরাশার তীব্র দাবানল।
বুঝিল এ রূপ নহে, ভূতলে রূপের স্বপ্ন;
বুঝিল, হইল দুই চক্ষু ছল ছল।
"ভ্রাতা যথা নরোত্তম"—ভাবিতে লাগিল কারু—
"হায় রে! ভগিনী তথা রমণীর মণি।
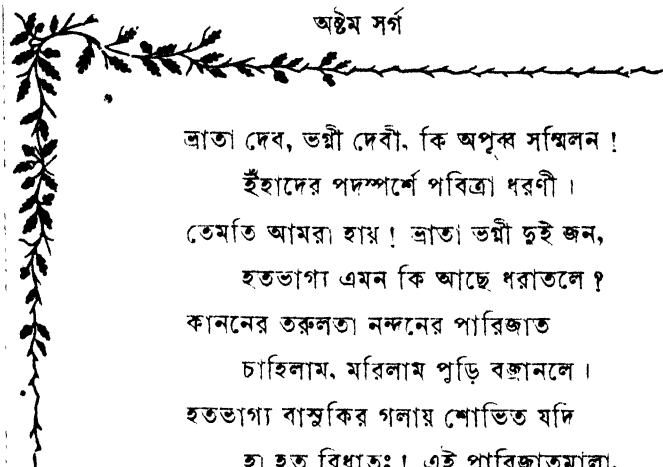
ভ্রাতা দেব, ভগ্নী দেবী, কি অপূর্ব্ব সম্মিলন !
ইঁহাদের পদস্পর্শে পবিত্রা ধরণী ।
তেমতি আমরা হায় ! ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন,
হতভাগা এমন কি আছে ধরাতলে ?
কাননের তরুলতা নন্দনের পারিজাত
চাহিলাম, মরিলাম পুড়ি বজ্রানলে ।
হতভাগ্য বাসুকির গলায় শোভিত যদি
হা হত বিধাতঃ ! এই পারিজাতমালা,
নিরখি তাহার সুখ, নিরখি এ দেবী-মুখ,
জুড়া'তেম মরু-দগ্ধ জীবনের জ্বালা ।
সেই মুখ, সেই বুক, সেই চক্ষু, সেই নাসা,
সে মহিমা, সে ভঙ্গিমা, শোভা নিরুপমা !
উভয়ের কিবা রূপ ! অনন্ত হৃদয়প্লাবী !
কিবা শোভা উভয়ের,—আকাশ, জ্যোৎস্না !
ইহাকে লইয়া বুকে, ভাবি এই কৃষ্ণ মম,
পাইতাম কিবা সুখ সে ভ্রান্তিস্বপনে !
ইহার সুরভি শ্বাস, ইহার কোমল কণ্ঠ,
জাগাইত কি উচ্ছ্বাস মরমে মরমে ।”
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, চাপিয়া বিষাদ কান্না
জিজ্ঞাসে—“কেমনে আমি আসিনু এখানে ?”

ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, কহিলা সুভদ্রা, যং
কহে নৈশ সমীরণ কুসুমের কাণে ;
"হত ও আহতদের করিয়া সৎকার সেবা,
ভীষ্মদেব পাদপদ্ম করি প্রদক্ষিণ,
শিবিরে যাইতেছিনু ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন,
দেখিলাম আঁধারে কি হইল পতন।
কাছে গিয়া দেখিলাম নিরাশ্রিতা লতা মত
রয়েছ ভগিনী ! তুমি পড়িয়া ধরায়—
মূর্চ্ছিতা, ধূলি-লুণ্ঠিতা ; দয়াময় ভ্রাতা মম
তোমায় লইয়া অঙ্কে আনিলা হেথায়
"ভ্রাতা কে ?"—জিজ্ঞাসে কারু ; কহে ভদ্রা "বাসুদেব।"
মুখ ফিরাইয়া কারু করিল দর্শন।
সে মূর্ত্তি মহিমাময়, দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে,
নীরবে চাহিয়া আছে তাহার বদন।
অষ্টমীর অন্ধকারে অস্ফুট অস্ফুট মাত্র
ভাসিয়াছে সেই দেব মূর্ত্তি মনোহর।
তথাপি দেখিল কারু যেন অন্ধকার পটে
রেখেছে আঁকিয়া কোনে দক্ষ চিত্রকর
কত দিন, কত বর্ষ, কত বর্ষ, কত যুগ,
এই রূপ জরৎকারু দেখে নিনয়নে !
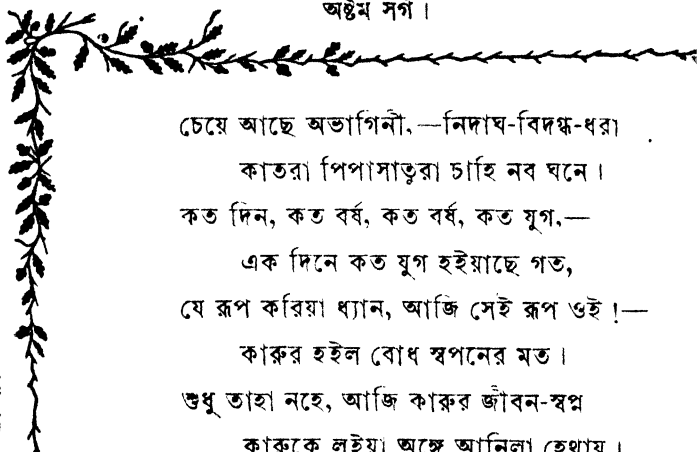
চেয়ে আছে অভাগিনী,—নিদাঘ-বিদগ্ধ-ধরা
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নব ঘনে।
কত দিন, কত বর্ষ, কত বর্ষ, কত যুগ,—
এক দিনে কত যুগ হইয়াছে গত,
যে রূপ করিয়া ধ্যান, আজি সেই রূপ ওই!—
কারুর হইল বোধ স্বপনের মত।
শুধু তাহা নহে, আজি কারুর জীবন-স্বপ্ন
কারুকে লইয়া অঙ্গে আনিলা হেথায়।
লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ, লাগিয়াছে, হায় কারু!
হৃদয়ে হৃদয় বুঝি! শিহরিল কায়।
অঞ্জলি-বারিতে তাঁর ভিজিছে ললাট মুখ,
লাগিয়াছে অঞ্জলি কি কপোলে তাহার,—
নীলোৎপলে রক্তোৎপল! আর না, হইল বামা
সেই স্মৃতিসুখাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার।
হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে;
বাসুদেব দ্রুত করে আনি নদী-জল
বর্ষিলেন মুখে, চক্ষে; এবার কাঁপিল কর,
হইল কৃষ্ণের দুই চক্ষু ছল ছল।
পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্পনিভ কম করে
মুছিছেন পুষ্পমুখ সুপ্তা রমণীর;

প্রভাতসমীরে খেলি পুষ্পে পুষ্প আলিঙ্গিয়া
সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির।
দেখিছেন সুতন্বীর আঁধারেও যেই শোভা
ভদ্রা দেবী. সে কি শোভা!—রূপ পারাবার!
পুষ্পিতা বাসন্তী নিশি রূপের স্বপন খুলি,
শায়িতা নিদ্রিতা যেন অঙ্কেতে তাঁহার।
রমণী মেলিল আঁখি,—সরিয়া গেলেন কৃষ্ণ,—
সুভদ্রার মুখ পানে রহিল চাহিয়া।
শ্বেত নীলাম্বুজ দুটি—যেন এক বৃন্তে ফুটি,
চেয়ে আছে পরস্পরে মোহিত হইয়া।
ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
আসিল ফিরিয়া, বামা ভাবে মনে মনে—
"হায়! নিদারুণ নাথ! যেই অঙ্গ আলিঙ্গন
দিলে মূর্চ্ছিতায়, তাহা পাব কি জীবনে?
মূর্চ্ছায় পাইনু যাহা, মরিলেও পাই যদি,
লও, পদে সমর্পিব দুঃখিনীর প্রাণ।
সহিতে না পারি আর, এবে দয়া কর নাথ!—"
ফিরাইল মুখ বামা; কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
"চিনিতেও দুঃখিনীরে হা নাথ! পারিলে না কি?"
বহিতে লাগিল নারী-অশ্রু অবিরল।
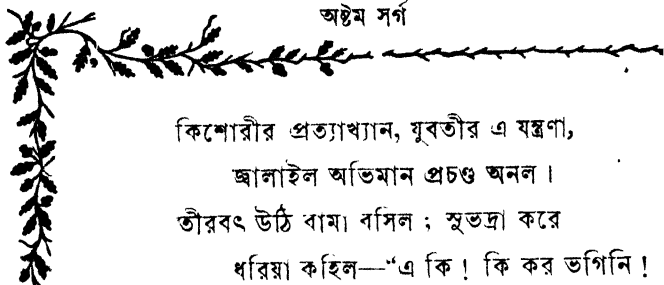
কিশোরীর প্রত্যাখ্যান, যুবতীর এ যন্ত্রণা,
জ্বালাইল অভিমান প্রচণ্ড অনল।
তীরবৎ উঠি বামা বসিল ; সুভদ্রা করে
ধরিয়া কহিল—"এ কি! কি কর ভগিনি!
হতেছে কি কষ্ট তব শুইয়া অঙ্কেতে মম ?"
"কষ্ট!"—কহে গদ গদ নাগেন্দ্রনন্দিনী,
"এমন পবিত্র স্বর্গে অনার্য্যা বনবাসিনী
নাহি জানি কোন্ পুণ্যে করিনু শয়ন।
এই দয়া, এই সুখ, ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন-শয্যা
এই অঙ্ক, আমি নাহি ভুলিব কখন।
কি ভাগ্য আমার! আমি ভগিনী হইব তব,
হবে হীনা বনলতা ভগ্নী মাধবীর।
যদি জন্ম-জন্মান্তরে তোমার ভগিনী হই,
সার্থক হইবে সেই জন্ম দুঃখিনীর।
তুমি ত মানবী নহ, অপরিচিতায় হায়!
এই দয়া, এই স্নেহ, মানবের নহে।
নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায়!
কোথা এইরূপ দয়া-মন্দাকিনী বহে ?"
"সে কি কথা ?"—কহে ভদ্রা—"মূর্চ্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া ?
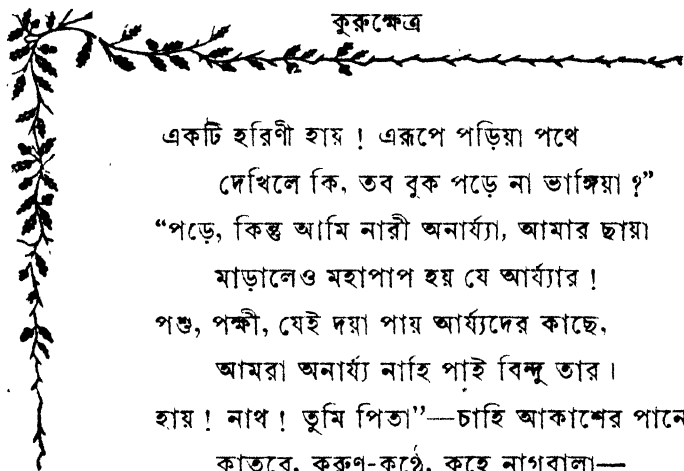
একটি হরিণী হায় ! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া ?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা, আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার !
পশু, পক্ষী, যেই দয়া পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্য নাহি পাই বিন্দু তার।
হায় ! নাথ ! তুমি পিতা"—চাহি আকাশের পানে
কাতরে, করুণ-কণ্ঠে, কহে নাগবালা—
"হায় নাথ ! তুমি পিতা নহ কি অনার্য্যদের,
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা ?
মানব তাহারা নহে যদি নাথ ! তবে কেন
একরূপ রক্ত মাংস করিলা সৃজন ?
কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন ?"
দয়াময়ী সুভদ্রার দুই আঁখি ছল ছল,
অন্তরালে আঁখি ছল ছল নারায়ণ।
করুণার এ উচ্ছ্বাস পরশি উভয় প্রাণ
কাঁদাইল এক তান বীণার মতন।
"না বোন ! অনার্য্য আর্য্য"—কহিতে লাগিলা ভদ্রা—
"একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়।

অষ্টম সর্গ।

এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয়।
স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, কর্ম্ম-ভেদে জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্ম্মল।
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্ম্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল।
মানুষ যে গুণবলে অন্য জীব হ'তে শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মনুষ্যত্ব সেই গুণচয়
করিছে ধারণ, ভগ্নি! উহাই মানব-ধর্ম্ম,
সে গুণের মহাদর্শ সর্ব্ব বিশ্বময়
বিরাজিত নারায়ণ, অনন্ত, অপরিজ্ঞাত!
আমরা মানব ক্ষুদ্র নৌকাযাত্রীগণ,
ভাসি এই গুণস্রোতে, চলেছি অনন্ত পথে;
এই যাত্রা মানবের ধর্ম্ম সনাতন।
যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর
এই মহাধর্ম্ম-পথে, তত নিরমল
আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধর্ম্ম,—মনুষ্যত্ব;
এই মনুষ্যত্বে নর বিভিন্ন কেবল।
এই ধর্ম্মে, মনুষ্যত্বে, আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠতর;
অনার্য্য হইল হীন এই হীনতায়।
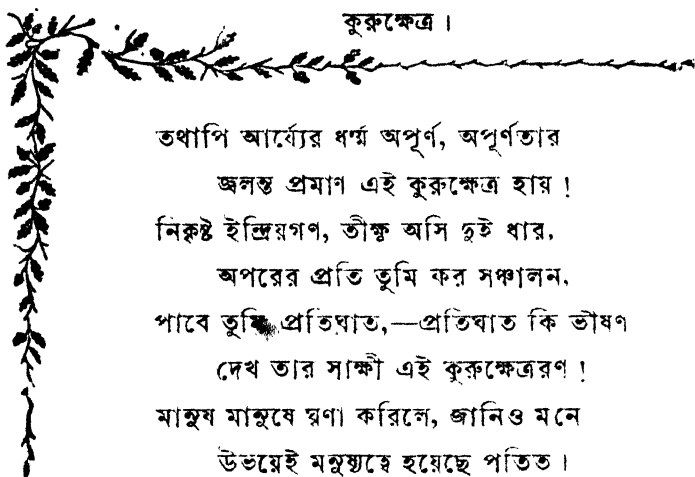
তথাপি আর্য্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার
জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায়!
নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ, তীক্ষ্ণ অসি দুই ধার,
অপরের প্রতি তুমি কর সঞ্চালন,
পাবে তুমি প্রতিঘাত,—প্রতিঘাত কি ভীষণ
দেখ তার সাক্ষী এই কুরুক্ষেত্ররণ!
মানুষ মানুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে
উভয়েই মনুষ্যত্বে হয়েছে পতিত।
প্রস্তরেও পরস্পরে আঘাতিলে, দেখিয়াছ
কেমন উভয়ে হয় চূর্ণিত, ধ্বংসিত।
ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! ঘৃণিয়া অনার্য্যগণে,
আজি পরস্পরে ঘৃণা করিছে কেমন
ওই দেখ আর্য্যজাতি! দেখ মহা আত্মহত্যা,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের পতন!
ঈশ্বর মঙ্গলময়! এই ঘোর অমঙ্গলে
কি মঙ্গল নীতি তাঁর আছে বিদ্যমান!
এই ঝটিকার শেষে কিবা শান্তি বিরাজিবে!
করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান!
অবতীর্ণ নারায়ণ! ভস্মিয়া অধর্ম্ম যবে
এ মহাশ্মশান হায়! হবে নির্ব্বাপিত;
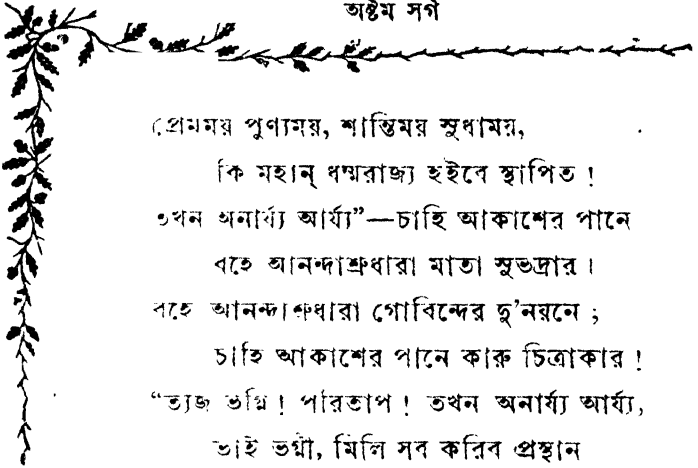
প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় সুধাময়,
কি মহান্ ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপিত !
তখন অনার্য্য আর্য্য"—চাহি আকাশের পানে
বহে আনন্দাশ্রুধারা মাতা সুভদ্রার।
বহে আনন্দাশ্রুধারা গোবিন্দের দু'নয়নে ;
চাহি আকাশের পানে কারু চিত্রাকার !
"ত্যজ ভগ্নি! পরিতাপ! তখন অনার্য্য আর্য্য,
ভাই ভগ্নী, মিলি সব করিব প্রস্থান
সে অনন্ত সুখ পথে, অনন্ত কালের তরে.
গাইয়া তারকব্রহ্ম-মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
অগ্রবর্ত্তী আর্য্যগণ, অনার্য্য পশ্চাদগামী
প্রীতির দক্ষিণ কর করি প্রসারিত
আনন্দে লইয়া সঙ্গে, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
করি, মনুষ্যত্ব-পথে হইবে ধাবিত।
বুঝিবে মানবগণ,—সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নব ধর্ম্মে, ভগ্নি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"
কারুর পড়িল মনে এরূপ পাতালে ব'সে
গাইত কিশোর কেহ, বহু বর্ষ গত,

এইরূপ স্বর্গ-গীতি মোহি কিশোরীর মন,—
কারুর সে সুখ আজি স্বপ্নে পরিণত!
সেই কৃষ্ণ সেই কারু,—কারুর হইল ভ্রম
সেরূপ পাতালে যেন বসিয়া দু'জন।
জীবনের সে প্রভাত, সে প্রভাতে সেই স্বর্গ,
খুলিয়া মুহূর্ত্তে যাহা হইল স্বপন,—
কারুর পড়িল মনে। সেই স্মৃতি সুখে দুঃখে,
তরঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে, হায় রে! বামার
কি দারুণ বেদনায় হইল অধীর প্রাণ,
ভাবিল দু'হাতে চাপি হৃদয় তাহার,—
"গাইয়া সে কৃষ্ণনাম, করি কৃষ্ণপদ ধ্যান,
পাবে নর দুঃখে শান্তি, পাপে পরিত্রাণ,
সেই নামে, সেই পদে, সর্ব্বস্ব অর্পণ করি
লভিল কি দাসী, নাথ! এ মহাশ্মশান?'
অধীরা রমণী কহে বিকলিত কণ্ঠে—"দেবি!
বাড়িছে রজনী, চাহি চরণে বিদায়।
এ দয়ার প্রতিদান নাহি সাধ্য দিব আমি,
পূজিবে এ দাসী নিত্য হৃদয়ে তোমায়!'
দুই করে দুই কর, কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
চারি রক্ত কমলের কিবা সম্মিলন—

অষ্টম সর্গ

"যাইবার আগে ভগ্নি! দেও আত্ম-পরিচয়
কে তুমি রমণীরত্ন? হেথা কি কারণ?"

নিশ্চয় কি কৃষ্ণ তবে কারুকে পারেন নাই
চিনিতে? কারুর বুক পড়িল ভাঙ্গিয়া।
মনেতে করিল স্থির নাহি দিবে পরিচয়,
কহিতে লাগিল তবে অবনী চাহিয়া,—
"নাগকন্যা, ঋষিপত্নী, মনসা দাসীর নাম,
দারুণ কপালগুণে যৌবনে যোগিনী।
বেড়ায় সে বনে বনে, শৈলে শৈলে নিরজনে,
বনমাতা প্রকৃতির প্রেমে উন্মাদিনী।
যথায় ঝটিকা গর্জ্জে করি বন বিলোড়িত,
করিয়া তরঙ্গভঙ্গে সিন্ধু বিধূনিত;
যথায় জলদযুদ্ধে দৃপ্ত বজ্র বিস্ফুরিত
ঘন দীপ্ত দিঙ্মণ্ডল, ধরা প্রকম্পিত,
তথায় বেড়াই আমি। প্রকৃতির মহাপটে
হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখি আমার
পাই বড় শান্তি মনে,—আসিয়াছিলাম তাই
দেখিতে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-পারাবার।
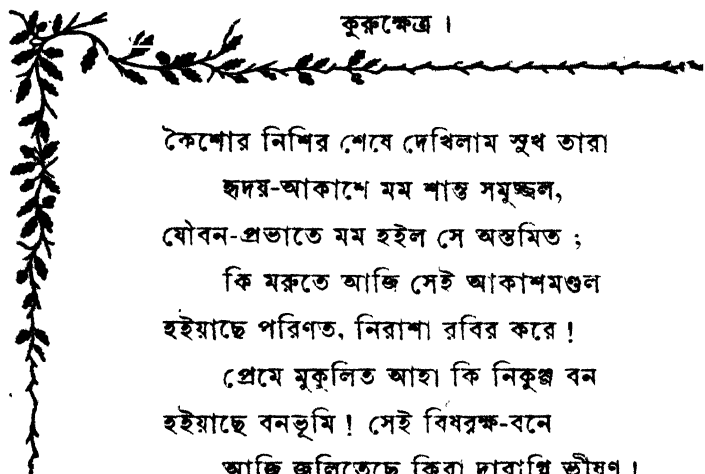
কৈশোর নিশির শেষে দেখিলাম সুখ তারা

হৃদয়-আকাশে মম শান্ত সমুজ্জ্বল,

যৌবন-প্রভাতে মম হইল সে অস্তমিত ;

কি মরুতে আজি সেই আকাশমণ্ডল

হইয়াছে পরিণত, নিরাশা রবির করে !

প্রেমে মুকুলিত আহা কি নিকুঞ্জ বন

হইয়াছে বনভূমি ! সেই বিষবৃক্ষ-বনে

আজি জ্বলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ !

অভিমান শিলাখণ্ডে প্রজ্বলিত হুতাশন

চাপিয়াছিলাম এই দ্বাদশ বৎসর।

উড়াইয়া শিলাখণ্ড, হুঙ্কারিয়া হৃদয়েতে

আজি গর্জ্জিতেছে কিবা আগ্নেয় ভূধর।"

"নাগবালা ! ঋষিপত্নি !" কহিতে লাগিলা ভদ্রা,

জরৎকারু উচ্চ হাসি কহিল হাসিয়া—

"ভগিনি ! বলিতে আর পারিলে না পাপিনীরে।"

গেল সুভদ্রার মুখ লজ্জায় ছাইয়া।

"না না, ভগ্নি ! পাপিনী যে তাকে সমধিক ভাল

বাসি আমি, তার তরে কাঁদে এ মরম।

অনন্ত মানবধর্ম্ম, কে পায় তাহার অন্ত,
কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম্ম পালন ?
হৃদয় হইতে এই করাল কামনা ছায়া
মুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।
তুমি আমি, কে আমরা ? যিনি করিলেন সৃষ্টি,
তিনি করিবেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি আকাশে ফুটিয়া ওই,
আপনার কি কামনা করিছে সাধন ?
চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, তারা, মস্তক পাতিয়া ধরা,
মঙ্গলকামনা তাঁর করিছে পালন।
মুছে ফেল, মুছে ফেল, করাল কামনা-ছায়া !—
আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায় ;
রমণী সৃজনে তাঁর আছে যে মঙ্গল নীতি,
জীবন অর্পণ কর তার সাধনায়।”

“মুছিব কি ? মুছিবে কে ? রমণী”—কহিল কারু-
“পারে কি প্রেমের ছবি মুছিতে কখন ?
অনন্ত সিন্ধুর বক্ষে ভাসে সুধাকর-ছবি,
সিন্ধুও ত পারে না তা’ মুছিতে কখন !
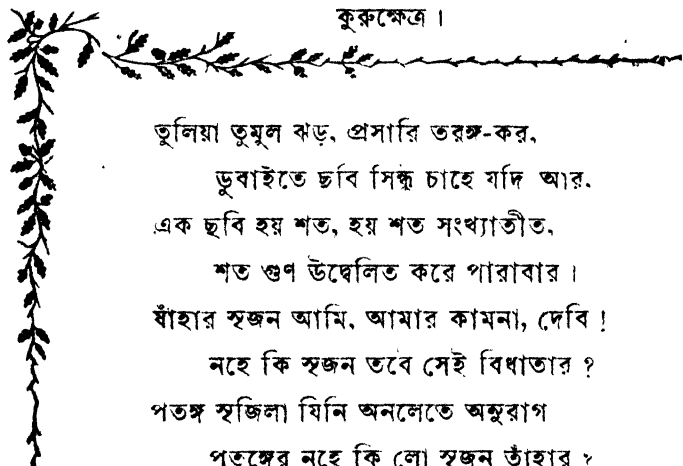
তুলিয়া তুমুল ঝড়, প্রসারি তরঙ্গ-কর,
ডুবাইতে ছবি সিন্ধু চাহে যদি আর,
এক ছবি হয় শত, হয় শত সংখ্যাতীত,
শত গুণ উদ্বেলিত করে পারাবার ।
যাঁহার সৃজন আমি, আমার কামনা, দেবি !
নহে কি সৃজন তবে সেই বিধাতার ?
পতঙ্গ সৃজিলা যিনি অনলেতে অনুরাগ
পতঙ্গের নহে কি লো সৃজন তাঁহার ?
চাতকীর বিধাতায় অতৃপ্ত পিপাসা তার
নাহি কি মেঘের তরে করিলা সৃজন ?
মানবের এত আশা হইবে নিরাশা যদি,
নিষ্ফল আশার সৃষ্টি কেন নিরমম ?

"কেন ?"—কহিলেন ভদ্রা—"জগতের এই 'কেন' ?
কি সাধ্য বুঝিব বল ক্ষুদ্র নরনারী ।
কেন এ অনন্ত সৃষ্টি ? রবি শশী গ্রহ তারা ?
কেন ক্ষুদ্র বালুকণা ?—কে বলিতে পারি !
আছে বিশ্ব নীতিরাজ্য, সে নীতি মঙ্গলময়,
সেই নীতি জগতের ধর্ম্ম সনাতন ;
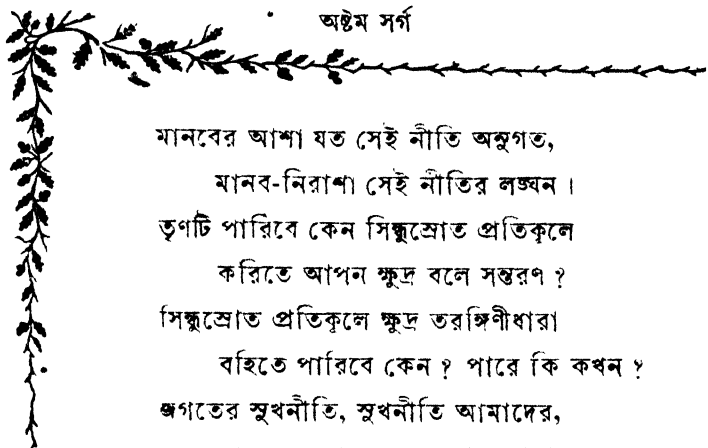
মানবের আশা যত সেই নীতি অনুগত,
মানব-নিরাশা সেই নীতির লঙ্ঘন।
তৃণটি পারিবে কেন সিন্ধুস্রোত প্রতিকূলে
করিতে আপন ক্ষুদ্র বলে সন্তরণ ?
সিন্ধুস্রোত প্রতিকূলে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীধারা
বহিতে পারিবে কেন ? পারে কি কখন ?
জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের,
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার।
সেই মহাসুখ-স্রোতে, যাই তুমি আমি ভাসি,
পাইব অনন্ত সিন্ধু, সুখপারাবার।
কেমনে জানিলে তুমি, এ কামনা-লতিকায়
ফুটিত ফলিত সুখ দুঃখ কি তোমার ?
এ আশায়, নিরাশায়, কেমনে জানিলে নাহি
মানব-মঙ্গল কোন নীতি নিয়ন্তার ?
এ তীব্র কামনা কেন, হায় ! মানবের তরে ?
চাহ রূপ ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর ?
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা যাঁহার অনন্ত রূপ,
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সুন্দর ?
চাহ গুণ ? এই বিশ্ব যাঁর গুণ-লীলাভূমি,
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার ?

চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম পারাবার,
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার।
সেই প্রেমপারাবারে ঝাঁপ দেও নাগবালা,
এই প্রেমমরীচিকা কর নিমজ্জিত !
অনন্ত প্রেম-পিপাসা মানবের, মানবে কি
পূরাইতে, জুড়াইতে, পারে কদাচিত ?"

আকাশের পানে চাহি দু'নয়নে প্রেমধারা
বহিতেছে সুভদ্রার পবিত্র শীতল।
"হায় ! এক বিন্দু বারি"—নাগেন্দ্রনন্দিনী কহে
চাহি আকাশের পানে হৃদয় বিহ্বল,
"হায় ! এক বিন্দু বারি দেখিল না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার ?
হায় রে ! যাহার প্রেম অঙ্কুরে পুড়িয়া গেল,
সে অনন্ত প্রেমে দিবে কেমনে সাঁতার ?"

চমকি কহিলা ভদ্রা—সে কি কথা সুচরিত্রে ?
ঋষিপত্নী তুমি, তব পতি শ্রেষ্ঠতম।
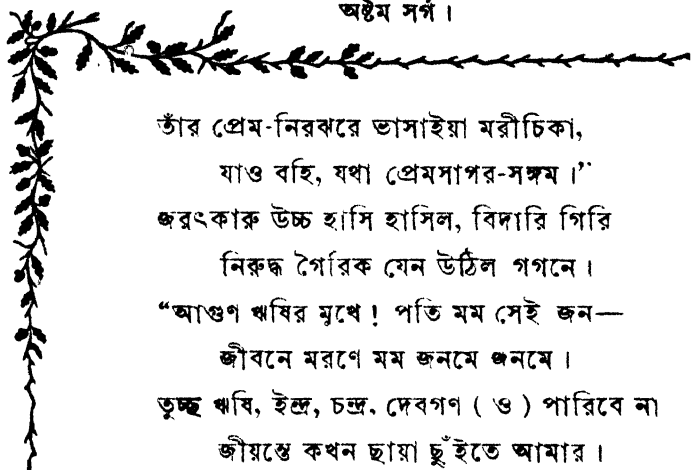
তাঁর প্রেম-নিরঝরে ভাসাইয়া মরীচিকা,
যাও বহি, যথা প্রেমসাগর-সঙ্গম।"
জরৎকারু উচ্চ হাসি হাসিল, বিদারি গিরি
নিরুদ্ধ গৈরিক যেন উঠিল গগনে।
"আগুণ ঋষির মুখে! পতি মম সেই জন—
জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।
তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ (ও) পারিবে না
জীয়ন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার।
অভাগিনী সূর্য্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
অন্য দিকে তবু নাহি দেখে এক বার।
হায়! সূর্য্যমুখী মত চাহি সেই রবিপানে
এরূপে জীবন-বৃন্তে যাব শুকাইয়া।
আর,—নাগবালা আমি দংশিয়া তাঁহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া!"
বুকে করি করাঘাত, হাসি পুনঃ উচ্চ হাসি,
উন্মাদিনী বনমধ্যে চলিল ছুটিয়া;
ছুটিলা, ডাকিলা কৃষ্ণ বারেক অস্ফুটে,—"কারু!"
গেল বামা উল্কা যেন আঁধারে মিশিয়া।
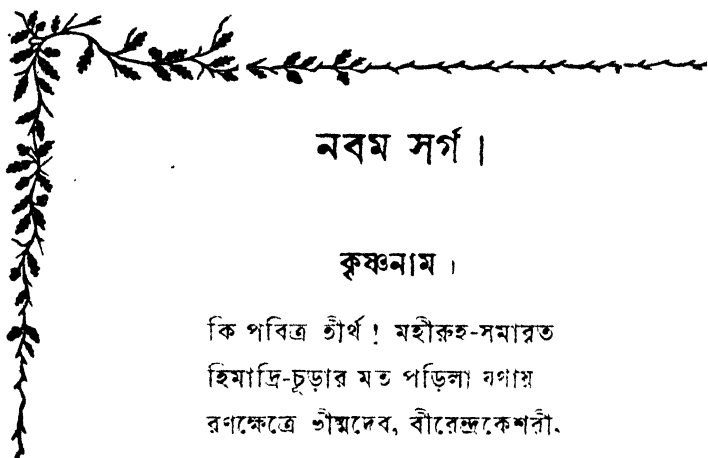
নবম সর্গ।

কৃষ্ণনাম।

কি পবিত্র তীর্থ! মহীরুহ-সমাবৃত
হিমাদ্রি-চূড়ার মত পড়িলা ধরায়
রণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব, বীরেন্দ্রকেশরী,
শরসমাবৃত অঙ্গে, শরের শয্যায়,
তথায় শিবির চারু হয়েছে স্থাপিত।
শিবিরে শান্তনু-সুত, বীরমূর্ত্তি ক্ষত,
অসংখ্য জবায় যেন পুষ্পিত, পূজিত,
শোভিতেছে অস্তগামী দিনকর মত।
বীরত্বের কি পবিত্র তীর্থ সেই স্থান!
সে শিবির কাল-বক্ষে মৈনাক মহান্।

অতীত প্রহর নিশি, ব্যাস, বাসুদেব
সে শিবিরে ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ।
জ্বলিতেছে দীপাবলী হেমদীপাধারে;
দেখিলেন ভীষ্ম করি নয়ন উন্মেষ।
কহিলেন—"বড় ভাগ্য, আসন্ন সময়ে
দেখিলাম মহর্ষির চরণপঙ্কজ।"

লইলেন পদধূলি বাড়াইয়া কর,
ধরিলেন শিরে সেই পুণ্য পদরজঃ।
ভক্তিভরে বাসুদেব নমিলে চরণে,
কহিলেন গদগদ কণ্ঠে কুরুপতি,—
"কে নমে কাহারে? হরি এ লীলা তোমার
কেমনে বুঝিব হায়! আমি অল্পমতি!
কে নমে কাহারে? হায়! আবির্ভাবে যাঁর
উচ্চ যদুকুল, নরকুল পবিত্রিত;
যাঁর আবির্ভাবে, এই জগতের হায়!
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত;
যাঁর পদতরী ভর করি যুগে যুগে
সংসার-অর্ণবযাত্রী যাবে মোক্ষধাম:
পাপের ঝটিকা দুঃখ-তরঙ্গ ভীষণ
উত্তরিবে করি যাঁর নামামৃত পান;
নারায়ণ! একি লীলা-রহস্য তোমার,
সেই কৃষ্ণ প্রণমিছে চরণে আমার!"
ভক্তিবিগলিত দুই নয়নধারায়,
বীরের ভিজিতেছিল অস্ত্র-উপাধান।
কহিলেন কৃষ্ণ—"আর্য্য! একি কথা হায়
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম?
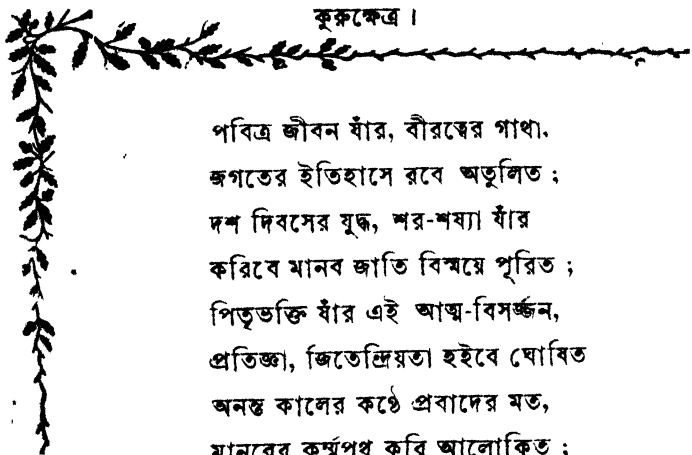
পবিত্র জীবন যাঁর, বীরত্বের গাথা,
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত ;
দশ দিবসের যুদ্ধ, শর-শয্যা যাঁর
করিবে মানব জাতি বিস্ময়ে পূরিত ;
পিতৃভক্তি যাঁর এই আত্ম-বিসর্জ্জন,
প্রতিজ্ঞা, জিতেন্দ্রিয়তা হইবে ঘোষিত
অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
মানবের কর্ম্মপথ করি আলোকিত ;
মানব-জগতে রবে হিমাদ্রির মত
বিরাট গগনস্পর্শী মূরতি যাঁহার ;
তাঁর পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিয়া হায় !
নমিব মানব আমি চরণে কাহার ?”

ভীষ্ম। মানব !—মানব তুমি !—তুমিও মানব !
দেবতার ঊর্দ্ধে তবে মানবের স্থান।
রবি, শশী, বালুকণা ! পারাবার কূপ !
বল্মীকের স্তূপ তবে গিরি হিমবান !
ভীষ্ম কি এতই পাপী হা কৃষ্ণ ! এরূপে
আসন্ন কালেও তুমি বঞ্চিবে তাহায় ?
সেই রাজসূয়যজ্ঞে, সর্ব্বাগ্রে কেশব !
চিনিয়াও না চিনিল ভীষ্ম কি তোমায় ?

এই মাত্র অভিমন্যু—আহা! বৎস মম
কৌরব-খনির শিশু মণি সর্ব্বোত্তম!
এই বাল-শশী হবে পূর্ণিত যখন
তাহার আলোকে ধরা হবে স্বর্গোপম।
মাতা পুত্র দুই জন আজি দুই দিন
কি অমৃত ক্ষত দেহে বর্ষিছে আমার।
হইয়াছে শর-শয্যা স্বর্গশয্যা মম
স্নেহ শুশ্রূষায় অভিমন্যু সুভদ্রার!—
এই মাত্র অভিমন্যু গম্ভীর ঝঙ্কারে
শুনাইল কি স্বর্গীয় গীতা সুধাময়!
সর্গে সর্গে কিবা স্বর্গ জ্ঞানের নয়নে
খুলিল, হইল আত্মা কি অনন্তে লয়।
কৃষ্ণের গগনব্যাপী জ্ঞান উচ্চতম,
মহর্ষির সুললিত ভাষা নিরুপম.—
হিমাদ্রিশেখরস্থিত সুধা সুশীতল
পতিতপাবনী গঙ্গা করিয়া বহন
অবতীর্ণা ধরাতলে, ধর্ম্মের পিপাসা
জুড়াইতে, মানবের পূরাইতে আশা।

ব্যাস। আমি মাত্র মালাকার। জ্ঞানের উদ্যানে
ফুটিয়াছে গোবিন্দের যে ফুলনিচয়
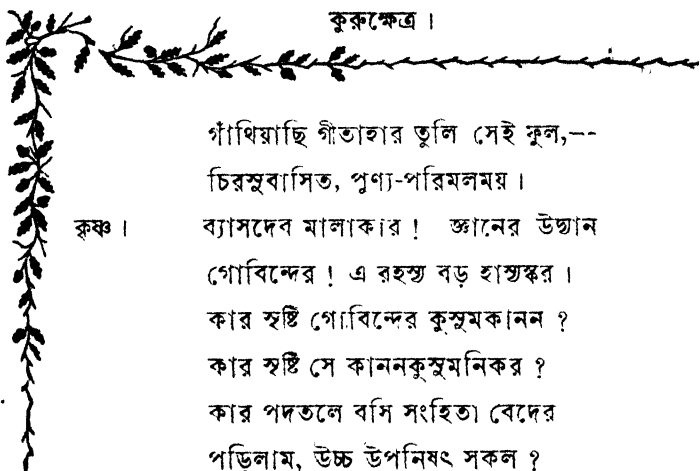
গাঁথিয়াছি গীতাহার তুলি সেই ফুল,--
চিরসুবাসিত, পুণ্য-পরিমলময়।

কৃষ্ণ। ব্যাসদেব মালাকার! জ্ঞানের উদ্যান
গোবিন্দের! এ রহস্য বড় হাস্যস্কর।
কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুসুমকানন?
কার সৃষ্টি সে কাননকুসুমনিকর?
কার পদতলে বসি সংহিতা বেদের
পড়িলাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল?
কাহার অনন্ত জ্ঞান কৃষ্ণের নয়নে
উন্মেষিল এ বিশ্বের রহস্য অতল?
শিষ্যের উদ্যান, আর গুরু মালাকার,—
বড় অসঙ্গত কথা! এই পুষ্পবন
তোমারি সৃজিত প্রভু! রচনা তোমার,
তোমারি কুসুম তুমি করেছ চয়ন।
জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।
আমি মাত্র ভবালোকে দীপ্ত শশধর।

ব্যাস। যেই আলোকের বৎস! তুমি অবতার,
যে আলোক পূর্ণ প্রতিফলিত তোমায়,
আমি এক ক্ষীণ রশ্মি সেই আলোকের
অনন্ত, খদ্যোত ক্ষুদ্র তার তুলনায়।
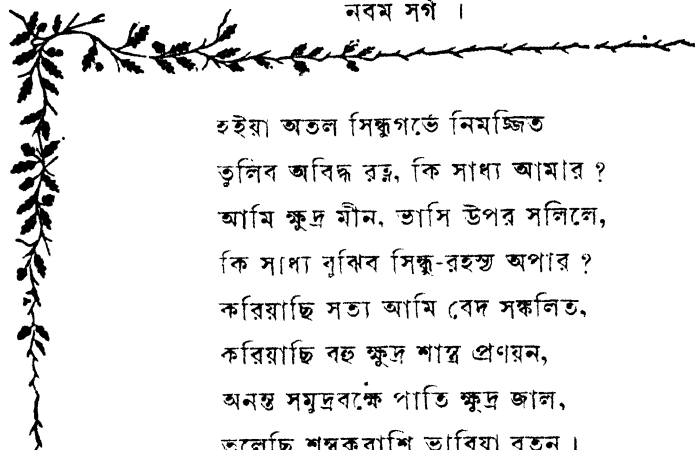
হইয়া অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত
তুলিব অবিদ্ধ রত্ন, কি সাধ্য আমার ?
আমি ক্ষুদ্র মীন, ভাসি উপর সলিলে,
কি সাধ্য বুঝিব সিন্ধু-রহস্য অপার ?
করিয়াছি সত্য আমি বেদ সঙ্কলিত,
করিয়াছি বহু ক্ষুদ্র শাস্ত্র প্রণয়ন,
অনন্ত সমুদ্রবক্ষে পাতি ক্ষুদ্র জাল,
তুলেছি শম্বুকরাশি ভাবিয়া রতন ।
মানবের মোক্ষসুধা চন্দ্রনিকেতন,
কেমনে পাইবে হায় ! দরিদ্র বামন ?

ভীষ্ম । যথায় ব্যাসের এই ভাষা আত্মগ্লানি,
যে অনন্ত কাছে ব্যাস এত ক্ষুদ্র হায় !
পশুবলে বলীয়ান্ আমরা সকল,
সেই অনন্তের জ্ঞান পাইব কোথায় ?
তথাপি পতঙ্গ মত উড়ি দুই হাত
ভাবিতাম এ অনন্ত করায়ত্ত মম,
আজি এই মহাগীতা শুনিয়া বিস্ময়ে
বুঝেছি পতঙ্গ আমি কত ক্ষুদ্রতম ।
বড় শুভদিন আর্য্য ! আজি মানবের ।
মানবের অন্ধকার অদৃষ্ট-গগনে

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রূপে সূর্য্য শশধর
এত দিনে সমুদিত পবিত্র কিরণে !
বড় শুভদিন আর্য্য আজি মানবের !
মানব ভাসিতেছিল সংসারসাগরে
দিকহীন, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়বিহীন ;
মানব ডুবিতেছিল মহাপাপভরে।
বড় শুভদিন আজি ! অদৃষ্টে তাহার
মিলিয়াছে এত দিনে আলোক যুগল !
মিলিয়াছে এত দিনে গীতার তরণী !
লক্ষ্য,—নারায়ণ ; পথ,—প্রশস্ত, উজ্জ্বল
উপজিল যথা সুধা সমুদ্রমন্থন
উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্ররণ !
মহাযোগী যেইরূপে ধরি মহাধ্যান,
জীবাত্মা পরমাত্মায় করি নিমজ্জিত,
কহিয়া এ মহাধর্ম্ম পার্থে পুণ্যবান,
করিলা এ মহাধর্ম্ম-যুদ্ধে নিয়োজিত,
মহর্ষির মহাবীণা গগনে উঠিয়া
সেইরূপে এই গীতা না করিলে গান,
পারিত কি ভবিষ্যৎ যুগযুগান্তর,
এই নব ধর্ম্মামৃত করিবারে পান ?

নবম সর্গ।
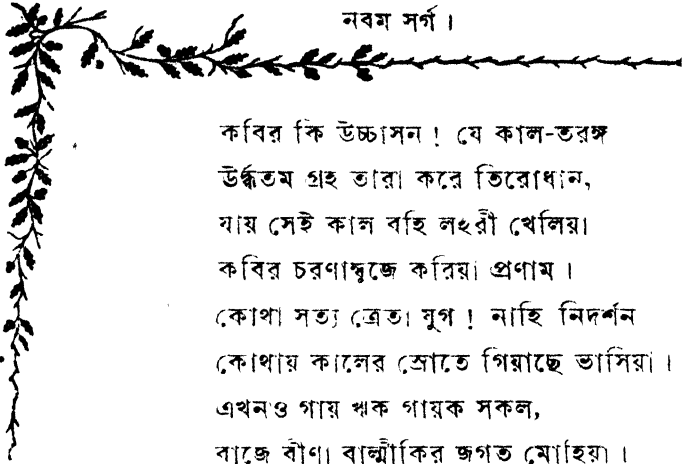
কবির কি উচ্চাসন! যে কাল-তরঙ্গ
উর্দ্ধতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।
কোথা সত্য ত্রেতা যুগ! নাহি নিদর্শন
কোথায় কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
এখনও গায় ঋক গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাল্মীকির জগত মোহিয়া।
দ্বাপর হইবে স্বপ্ন; এই রঙ্গভূমি
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত;
মানব অনন্তকাল করিবেক পান
মহর্ষির গীতামৃত আনন্দে সতত।
কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক;
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ সত্যযুগের সরল;
কে শুনিত রামসীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল?
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য জগত নশ্বর;—
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।

ব্যাস। মহাকবি মহেশ্বর! বিশ্বচরাচর
মহাকাব্য! কবিত্বের মহাপারাবার
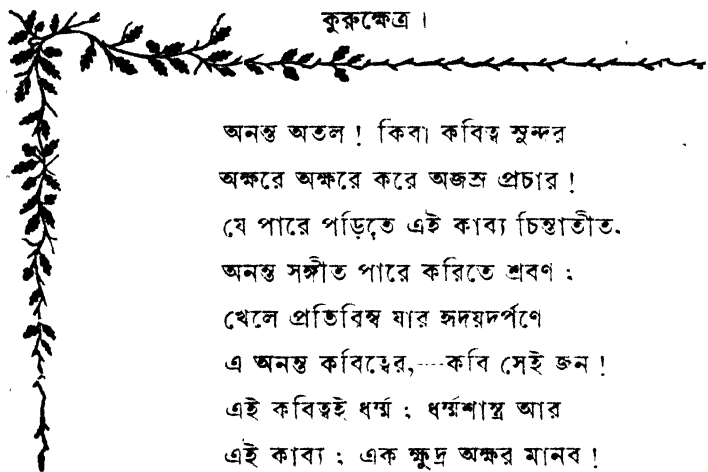
অনন্ত অতল! কিবা কবিত্ব সুন্দর
অক্ষরে অক্ষরে করে অজস্র প্রচার!
যে পারে পড়িতে এই কাব্য চিন্তাতীত,
অনন্ত সঙ্গীত পারে করিতে শ্রবণ:
খেলে প্রতিবিম্ব যার হৃদয়দর্পণে
এ অনন্ত কবিত্বের,—কবি সেই জন!
এই কবিত্বই ধর্ম্ম: ধর্ম্মশাস্ত্র আর
এই কাব্য: এক ক্ষুদ্র অক্ষর মানব!
মানব কে, নিয়তির কবিত্ব তাহার,—
যে পারে বুঝিতে, কবি সেই বীরর্ষভ!
মানবের এই ধর্ম্ম, কবিত্ব তাহার,
আসৃষ্টি মানবকবি বুঝিতে কাতর;
জ্বালিয়া খদ্যোতালোক নিয়তি তিমিরে
খুঁজেছে মানব কত কাল নিরন্তর!
সফল ত্রিযুগ-শ্রম; কৃষ্ণ অবতার
মহাকবি, গীতা সেই ধর্ম্মের আধার।

কৃষ্ণ। ক্ষীণা স্রোতস্বতী, প্রভু! সিন্ধু অভিমুখে
যত হয় অগ্রসর, হইয়া মিলিত
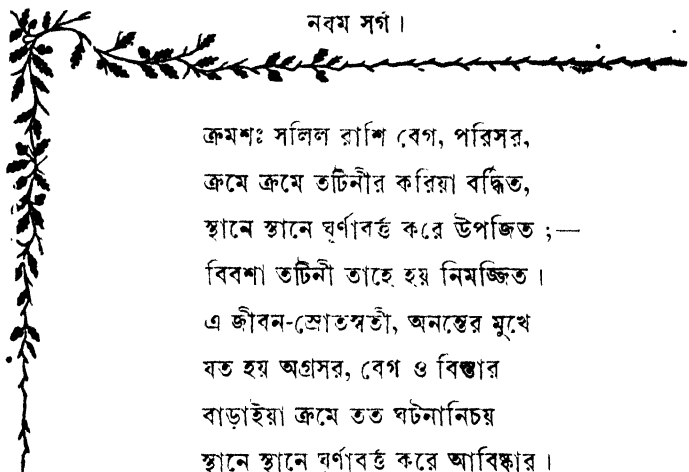
ক্রমশঃ সলিল রাশি বেগ, পরিসর,
ক্রমে ক্রমে তটিনীর করিয়া বর্দ্ধিত,
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে উপজিত ;—
বিবশা তটিনী তাহে হয় নিমজ্জিত।
এ জীবন-স্রোতস্বতী, অনন্তের মুখে
যত হয় অগ্রসর, বেগ ও বিস্তার
বাড়াইয়া ক্রমে তত ঘটনানিচয়
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে আবিষ্কার।
মানব সে ঘূর্ণাবর্ত্তে হইয়া পতিত,
হয় এক চিন্তাতীত শক্তির অধীন
অজ্ঞাতে আপনাহারা : মানব তখন
হয় পূর্ণরূপে সেই শক্তিতে বিলীন।
কুরুনাথ! বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত!
কি শক্তি শরীরে, মনে, করিত সঞ্চার!
চালা'ত শিশুকে ক্রীড়াপুতুলের মত!
সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত
নাচিতাম, হাসিতাম, করিতাম রণ ;
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল,
নাচিত, হাসিত গোপ, গোপাঙ্গনাগণ।
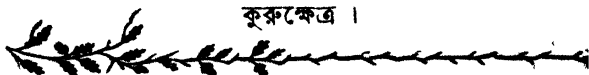
বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরজনে
শুনিতাম, যেন দূর সমুদ্র গর্জ্জন,
ভারতের কি বিরাট হাহাকার ধ্বনি
অশান্তির, অধর্ম্মের, প্লাবিছে কানন !
বন-অন্তরালে বসি দেখিতাম হায় !
অশান্তির, অধর্ম্মের, শিখা প্রধূমিত,
মিশি ঘোর জীব-ঘাতী যজ্ঞ-ধূমসহ,
করিতেছে কি ভীষণ মেঘ সঞ্চারিত !
শুনিতাম গোপমুখে বসি নিরজনে
মথুরার নিদারুণ শোক সমাচার ।
পীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুঃখীর রোদন,
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর ।
প্রধূমিত অগ্নিমাঝে,—করিলাম স্থির,—
দিব ঝাঁপ, ধর্ম্মবারি করিব সিঞ্চন ;
সেই মহাশক্তি বলে ঝটিকা তুমুল
নিবারিব,—মহা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভীষণ ।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিব সাধন ।
স্থাপন করিব ধর্ম্ম, এক মহা ধর্ম্মরাজ্য
করিয়া সৃজন ।

নবম সর্গ।
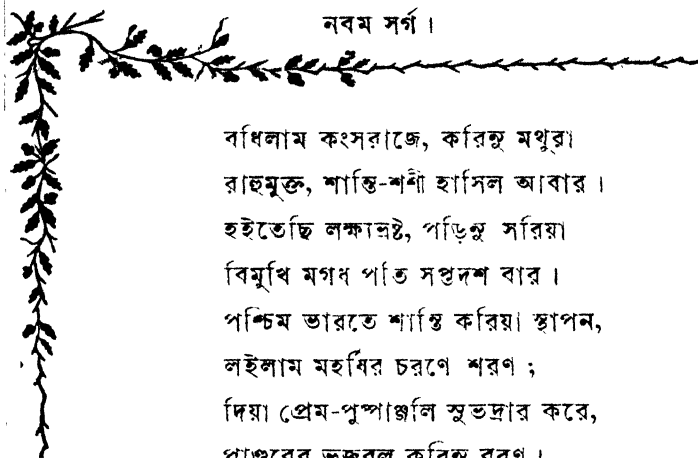
বধিলাম কংসরাজে, করিনু মথুরা
রাহুমুক্ত, শান্তি-শশী হাসিল আবার।
হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সরিয়া
বিমুখি মগধ পতি সপ্তদশ বার।
পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন,
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ ;
দিয়া প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে,
পাণ্ডবের ভুজবল করিনু বরণ।
জ্ঞানবল, ভুজবল, করিয়া আশ্রয়
হইলাম কর্ম্মক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর ;
বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়,
করিনু পাণ্ডব শক্তি, শান্তি, দৃঢ়তর।
দ্বন্দ-যুদ্ধে জরাসন্ধে করিয়া নিধন
নিবারিনু রাজমেধ, ঘোর পাপাচার।
করিল বিমুক্ত, বশী, নৃপতিমণ্ডল
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার।
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; বসি বৃন্দাবনে
গোচারণে যেই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্বপন
সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত ;--
এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন।
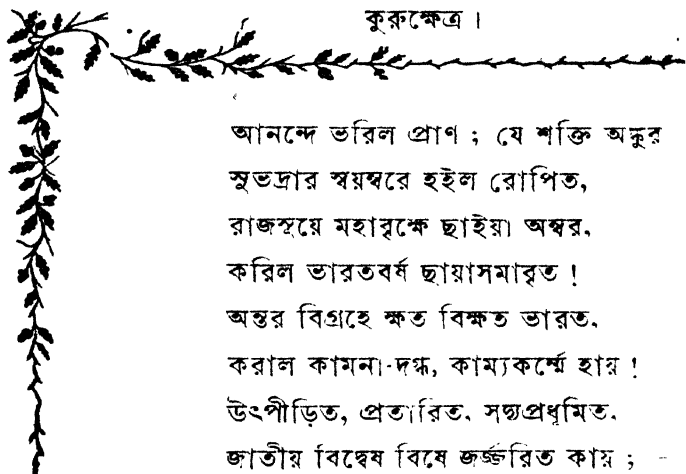
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; যে শক্তি অঙ্কুর
সুভদ্রার স্বয়ম্বরে হইল রোপিত,
রাজসূয়ে মহাবৃক্ষে ছাইয়া অম্বর,
করিল ভারতবর্ষ ছায়াসমাবৃত !
অন্তর বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত,
করাল কামনা-দগ্ধ, কাম্যকর্ম্মে হায় !
উৎপীড়িত, প্রতারিত, সন্তপ্রধূমিত,
জাতীয় বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত কায় ;
ইহার ছায়ায় শান্তি পাবে নিরমল,
লভিবে অনন্তকাল মোক্ষসুখফল !
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, করিয়া সঞ্চার
নিষ্কামমন্ত্র, দেখাইয়া সর্ব্বভূতময়
নারায়ণ কি নিষ্কাম, করিব সংসার
প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব্বসুখালয়।
আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে
দেখা দিল ; করিতেছি যবে নির্ব্বাপণ,
হায় ! মুষিকের মত পাপিষ্ঠ শকুনি
সেই মহীরুহমূল করিল ছেদন।
হইল নির্ম্মলাকাশে অশনির মত
পাণ্ডবের বনবাস মস্তকে পতন ;

নবম সর্গ।
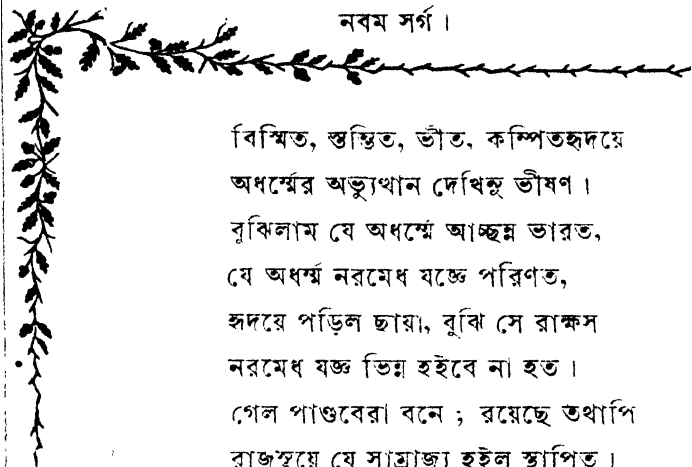
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, কম্পিতহৃদয়ে
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিনু ভীষণ।
বুঝিলাম যে অধর্ম্মে আচ্ছন্ন ভারত,
যে অধর্ম্ম নরমেধ যজ্ঞে পরিণত,
হৃদয়ে পড়িল ছায়া, বুঝি সে রাক্ষস
নরমেধ যজ্ঞ ভিন্ন হইবে না হত।
গেল পাণ্ডবেরা বনে ; রয়েছে তথাপি
রাজসূয়ে যে সাম্রাজ্য হইল স্থাপিত।
পালিছে নৃপতিগণ আনত মস্তকে
রাজসূয়ে যেই মন্ত্রে হইল দীক্ষিত।
ভারত লভিছে শান্তি ; নাহি জরাসন্ধ
ভারতের শান্তি-বিঘ্ন, নাহি শিশুপাল!
থাক কর্ণ দুর্য্যোধন তরু নব মূলে,
আছে তথা ভীষ্ম, দ্রোণ, বহু মহীপাল।
এইরূপে এই ভিত্তি হবে দৃঢ়তর,
ত্রয়োদশ বর্ষ ; শক্তি করিয়া সঞ্চয়,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে করিব নির্ম্মাণ
ধর্ম্মরাজ্য-অট্টালিকা, অমর, অক্ষয়।
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত
আকাশ হইতে ভূমে হইনু পতিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত,
বিরাট-বিজয়ে চক্ষে করিনু দর্শন
অধর্ম্মও করিতেছে শক্তির সঞ্চয়,
ধর্ম্মের সহিত হায়! অনিবার্য্য রণ।
কি যত্ন না করিলাম! পঞ্চখানি গ্রাম
চাহিনু এ নরমেধ করিতে বারণ।
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী"—
শুনিলাম অধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
দ্রবিবে না শিলা, নাহি কর বিচূর্ণিত;
বিষবৃক্ষমূলে কর অমৃত সিঞ্চন,
তথাপি সুফল নাহি ফলে কদাচিত;—
অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নিয়তি ভীষণ!
বাজিল সমরভেরী যুড়িয়া ভারত
শুনিলাম, দেখিলাম পঙ্গপালমত
ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,—
বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসব্রত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ,—
করিলাম দ্বারকায় শোকেতে প্রস্থান।
হইলে আহূত যুদ্ধে, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
পালিলাম, করিলাম যুদ্ধে যোগদান
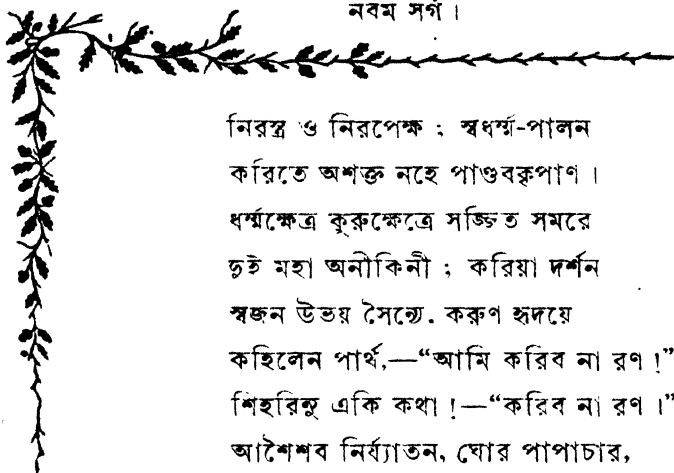
নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ : স্বধর্ম্ম-পালন
করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডবকৃপাণ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত সমরে
দুই মহা অনীকিনী ; করিয়া দর্শন
স্বজন উভয় সৈন্যে, করুণ হৃদয়ে
কহিলেন পার্থ,—"আমি করিব না রণ !"
শিহরিনু একি কথা !—"করিব না রণ।"
আশৈশব নির্য্যাতন, ঘোর পাপাচার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সেই কপট দ্যূতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সেই অপমান লোমহর্ষন ভীষণ,
পুনঃ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হায় !
সর্ব্ব শেষ বিনিময়ে সেই সাম্রাজ্যের
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায় !—
থাকে যদি অধর্ম্মের এই অভ্যুত্থান
অক্ষুণ্ণ, হা ধর্ম্ম ! তব কে লইবে নাম !
পার্থ করিবে না রণ ! করিবে গ্রহণ
কৌরব-অধর্ম্ম তবে ধর্ম্মের আসন ;
অধর্ম্ম-অশান্তি-শিখা জ্বলিবে এমন ;
আমার সে ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্বপন !
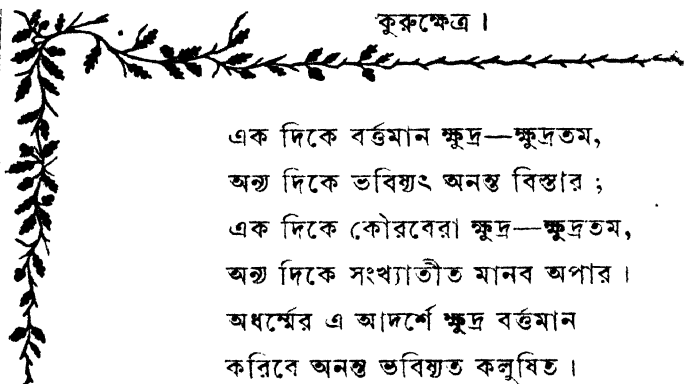
এক দিকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্য দিকে ভবিষ্যৎ অনন্ত বিস্তার ;
এক দিকে কৌরবেরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্য দিকে সংখ্যাতীত মানব অপার।
অধর্ম্মের এ আদর্শে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান
করিবে অনন্ত ভবিষ্যত কলুষিত।
কৌরবের এ আদর্শে মানব দুর্ব্বল
করিবে অনন্তকাল পাপে প্রবর্ত্তিত !
জগতের এ অশান্তি রবে চিরদিন !
অন্তর-বিগ্রহানল জ্বলিবে এমন !
ধর্ম্মের এ দুরবস্থা, দুঃখ মানবের,
নারায়ণ ! পারিব না করিতে মোচন ?
কর্ম্ম,—যাগযজ্ঞ ! জ্ঞান,—সংসারবর্জ্জন !
বৈদিক ধর্ম্মের এই ঘোর পরিণাম !
কত দিন আর্য্যজাতি রহিবে জীবিত
নিরন্তর করি এই মহাবিষ পান ?
যেই ধর্ম্মামৃত পানে পাবে মোক্ষ নর,
না পাইল এক বিন্দু সেই শান্তিজল,
আমার জীবন-ব্রত চলিল ভাসিয়া ;
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল।
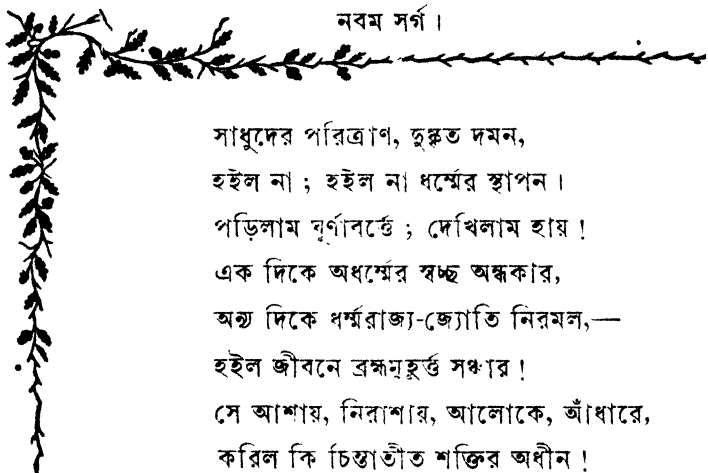
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
হইল না ; হইল না ধর্ম্মের স্থাপন।
পড়িলাম ঘূর্ণাবর্ত্তে ; দেখিলাম হায় !
এক দিকে অধর্ম্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
অন্য দিকে ধর্ম্মরাজ্য-জ্যোতি নিরমল,—
হইল জীবনে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত সঞ্চার !
সে আশায়, নিরাশায়, আলোকে, আঁধারে,
করিল কি চিন্তাতীত শক্তির অধীন !
কহিনু অর্জ্জুনে এই ধর্ম্ম সনাতন
হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ, বিলীন।
গায়ক সে নারায়ণ ; এই গীতা তাঁর ;
আমি ও মহর্ষিমাত্র নিমিত্ত ইহার।

ভীষ্ম। মানব—মানব তুমি ! মানবজীবন
এই লীলা ! মানবের এ অনন্ত জ্ঞান !
আজি দুই দিন কৃষ্ণ ! এ শরশয্যায়
অপূর্ব্ব চরিত তব করিয়াছি ধ্যান।
সামান্য মানব তুমি নহে কদাচন
বুঝিতাম, বুঝি নাহি আকাশ-বিস্তার
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত ! আসন্ন শয্যায়
আজি কি খুলিল ক্ষুদ্র নয়ন আমার ?
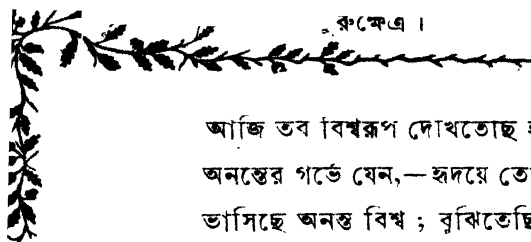
আজি তব বিশ্বরূপ দেখিতেছি হায় !—
অনন্তের গর্ভে যেন,—হৃদয়ে তোমার—
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব ; বুঝিতেছি হায় !
তোমার জীবন-ব্রত জগত উদ্ধার।
তব কুরুক্ষেত্র বিশ্ব ; জীবাত্মা অর্জ্জুন ;
ধর্ম্মাধর্ম্মে পাপ পুণ্যে বাজিয়াছে রণ !
হইয়া সারথি যুদ্ধে জীবাত্মার জয়
সাধিতেছ, নররূপী তুমি নারায়ণ !
এ ধর্ম্মসাম্রাজ্য-পথে ভীষণ কণ্টক
হইল কি ভীষ্ম ? হায় ! ভীষ্ম দুরাচার
ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্মকে করিয়া আশ্রয়
করিল কি সংখ্যাতীত জীবের সংহার ?
বাসুদেব ! বনমালি ! কৃষ্ণ ! নারায়ণ !
ভীষ্মের কি গতি হবে কহ জনার্দ্দন !

কৃষ্ণ। হে রাজর্ষি ! বৃথা এই অনুতাপ তব।
মানুষ কালের ক্রীড়া। কাল-স্রোতঃ হায় !
যখন যে পথে বহে, সে পথে ভাসিয়া
যায় নরগণ, তৃণসমষ্টির প্রায়।
অধর্ম্মের কি প্লাবনে প্লাবিত ভারত !
অন্যের কি কথা, ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যতম

ভাবেন অধর্ম্মে ধর্ম্ম, কুজ্ঝটিকা মত
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায়! তাঁদেরও নয়ন।
অনিবার্য্য হ'লে যুদ্ধ, ছিল এক আশা—
ভীষ্ম দ্রোণ কদাচিৎ করিবে না রণ।
কৌরব পাণ্ডব তুল্য তাঁদের নয়নে,
রহিবেন অস্ত্রহীন আমার মতন।
সে আশাও গেল ভাসি অধর্ম্মের স্রোতে।
কৌরবের আশৈশব ক্রূর ব্যবহার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সে কপট দ্যূতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সভাস্থলে নিরমম সেই নির্য্যাতন,
"না দিব সূচ্যগ্র স্থান"—প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
ভুলিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, মোহের আবেশে।
"ধৃতরাষ্ট্র অন্নে প্রতিপালিত আমরা,
হইবে অধর্ম্ম"—মনে করিলেন স্থির,—
"কৌরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ।"
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হায়! কি গভীর!
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত,
হইতে হইবে তবু সহায় তাহার!—
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম হায়! বলিব ইহারে?
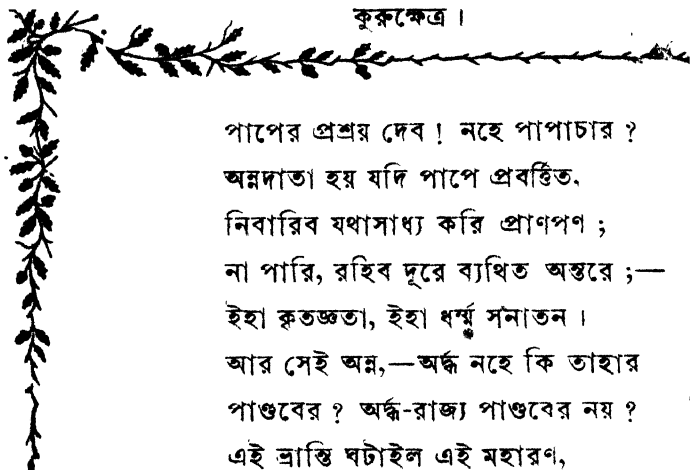
পাপের প্রশ্রয় দেব! নহে পাপাচার?
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত,
নিবারিব যথাসাধ্য করি প্রাণপণ;
না পারি, রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে;—
ইহা কৃতজ্ঞতা, ইহা ধর্ম্ম সনাতন।
আর সেই অন্ন,—অর্দ্ধ নহে কি তাহার
পাণ্ডবের? অর্দ্ধ-রাজ্য পাণ্ডবের নয়?
এই ভ্রান্তি ঘটাইল এই মহারণ,
করিল ভারত-ভাগ্য চির ছায়াময়!
ভীষ্ম, দ্রোণ, অস্ত্র নাহি করিলে গ্রহণ,
হইত কি দুর্য্যোধন রণে অগ্রসর?
হইলে, এ কুরুক্ষেত্র হইত নিশ্চয়
উত্তর গোগৃহ,—সেই ক্রীড়া হাস্যকর!
কিন্তু অধর্ম্মের ধ্বংস হইত কি হায়!
থাকিতে অধর্ম্মী এই ক্ষত্রিয় নিচয়?
থাকিতে প্রাচীর, স্তম্ভ, আশ্রয় প্রবল,
নাহি পড়ে অট্টালিকা, নাহি হয় লয়!
এই মহারক্ত-স্রোতে যেতেছে কি ভাসি
যুগের অধর্ম্ম? তব মহিমা অপার
কি বুঝিব নারায়ণ! আমি ক্ষুদ্র নর!
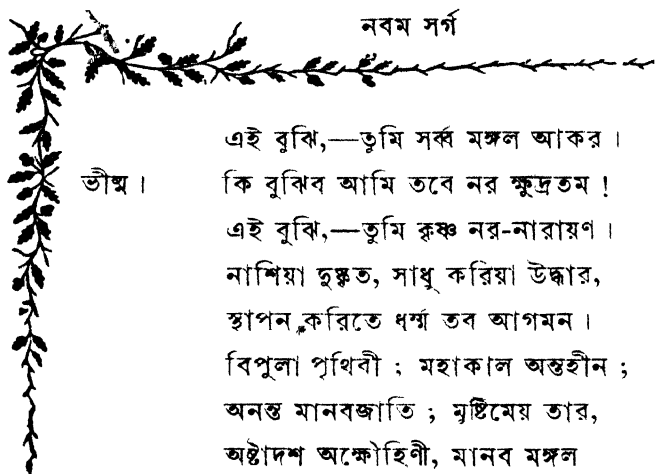
এই বুঝি,—তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আকর।

ভীষ্ম। কি বুঝিব আমি তবে নর ক্ষুদ্রতম!
এই বুঝি,—তুমি কৃষ্ণ নর-নারায়ণ।
নাশিয়া দুষ্কৃত, সাধু করিয়া উদ্ধার,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম তব আগমন।
বিপুলা পৃথিবী; মহাকাল অন্তহীন;
অনন্ত মানবজাতি; মুষ্টিমেয় তার,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, মানব মঙ্গল
রোধিতেছে,—কুরুক্ষেত্র করুণা অপার!
মানবের ভবিষ্যৎ কি আনন্দময়!
দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি আত্মক্ষয়
অধর্ম্মের ঘনঘটা, হিংসা বজ্রানল
নিবিল; উঠিল কিবা ধর্ম্ম-সুধাকর!
পুণ্যজ্যোৎস্নায় স্নাত অনন্ত মানব
লভিতেছে কিবা সুখ যুগ যুগান্তর!
ভূতল আনন্দরাজ্য! বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে এক মহা বেদিমূলে লয়।
ত্রিপথে ত্রিবৈজয়ন্তী উড়িছে সুন্দর—
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—কিবা স্বর্গ শোভাময়!
সৌর-সরসিজ বক্ষে ঊর্দ্ধে নারায়ণ

বসি কৃষ্ণরূপী, মূর্ত্তি পূর্ণ মহিমায়।
মধুর বাঁশরীস্বরে ডাকিছে—"মানব!
আইস যে পথে পার, পাইবে আমায়।"
দেখিতেছি ছুটিয়াছে ত্রিপথে মানব।
চারু বৈজয়ন্তীত্রয় করিয়া আশ্রয়:
সুমধুর কৃষ্ণনাম, ভূতল গগন
করিতেছে কি পবিত্র, কি আনন্দময়!
গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, হৃদয়ে হৃদয়ে।
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর!
দেখিতেছি পাপতাপ-পূর্ণ ধরাতল
হইতেছে ক্রমে স্বর্গ, স্বর্গ উচ্চতর।
নারায়ণ! জনার্দ্দন!"

—চাহি বীরর্ষভ

কৃষ্ণপানে ভক্তিপূর্ণ সজলনয়নে—
"ভীষ্ম মহাপাপী নাহি পাইল কি স্থান
সে আনন্দরাজ্য-স্বর্গে, হায়! এ জীবনে?
জন্ম জন্মান্তরে তারে, ভকতবৎসল!
সেই স্বর্গে, পদাম্বুজ-প্রান্তে, দিও স্থান!
দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসারবন্ধন,
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম!
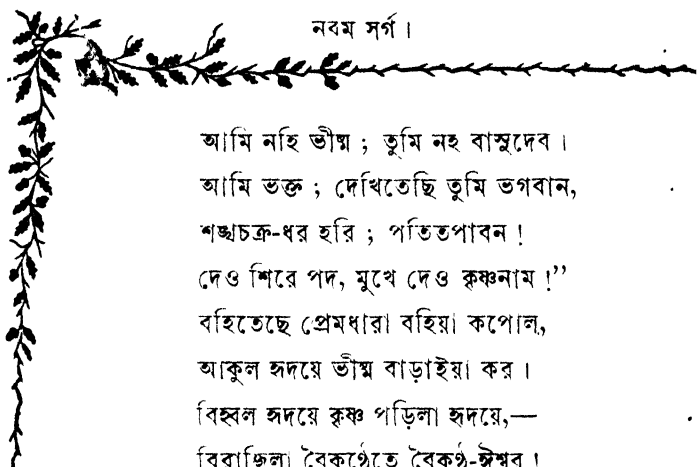
আমি নহি ভীষ্ম ; তুমি নহ বাসুদেব।
আমি ভক্ত ; দেখিতেছি তুমি ভগবান,
শঙ্খচক্র-ধর হরি ; পতিতপাবন !
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম !"
বহিতেছে প্রেমধারা বহিয়া কপোল,
আকুল হৃদয়ে ভীষ্ম বাড়াইয়া কর।
বিহ্বল হৃদয়ে কৃষ্ণ পড়িলা হৃদয়ে,—
বিরাজিলা বৈকুণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর !
ভক্তিতে বিহ্বল ব্যাস, আকুলিত প্রাণ,
গাইতে লাগিলা প্রেমকণ্ঠে কৃষ্ণনাম।
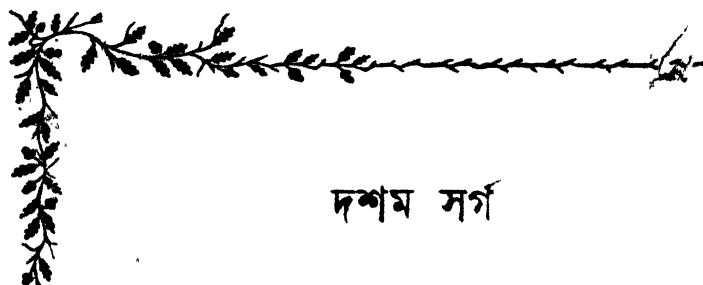
দশম সর্গ

ব্যাধ।

কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি অতীত প্রহর।
অদূরে অরণ্যে পত্রপল্লবকুটীরে
বসিয়া দুর্ব্বাসা, কর্ণ, চিন্তাকুল মন।
দূর প্রান্তরের শেষে চিতাগ্নির মত
জ্বলিতেছে কাষ্ঠধুনি জ্বলিয়া নিবিয়া।
জপিছেন ঋষিবর রুদ্রাক্ষের মালা
ধীরে ধীরে; বনরাজি নীরব, নির্জ্জন।

কর্ণ। দশ দিন মহারথী করি মহারণ,
বিনাশি অসংখ্য সৈন্য, চতুরঙ্গদল,
লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি কালের হৃদয়ে
অস্ত্রমুখে, রণক্ষেত্রে রুধিরপ্লাবিত,
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালীমত,
ভীমকর্ম্মা ভীষ্মদেব শর-শয্যাগত!
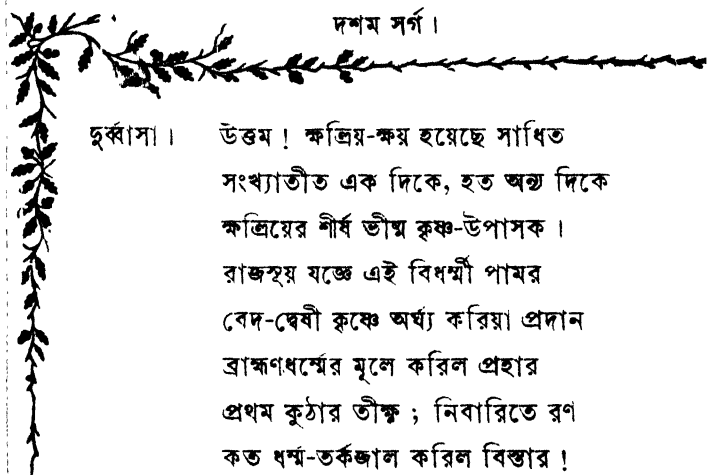
দুর্ব্বাসা। উত্তম! ক্ষত্রিয়-ক্ষয় হয়েছে সাধিত
সংখ্যাতীত এক দিকে, হত অন্য দিকে
ক্ষত্রিয়ের শীর্ষ ভীষ্ম কৃষ্ণ-উপাসক।
রাজসূয় যজ্ঞে এই বিধর্ম্মী পামর
বেদ-দ্বেষী কৃষ্ণে অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূলে করিল প্রহার
প্রথম কুঠার তীক্ষ্ণ; নিবারিতে রণ
কত ধর্ম্ম-তর্কজাল করিল বিস্তার!
উত্তম, সে বাহু, জিহ্বা, নড়িবে না আর!
তুমি?

কর্ণ। ধরে নাই অস্ত্র প্রভুর আদেশে
দাস এই দশ দিন, উপদেশ মত
সৃজিয়া কলহ-ছল ভীষ্মের সহিত।

দুর্ব্বাসা। উত্তম! সন্ধ্যান্তে আজি কি আনন্দধ্বনি
হইল কৌরব সৈন্যে?

কর্ণ। প্রতিশ্রুত দ্রোণ
বধিবেন কালি যুদ্ধে করি ঘোর রণ
পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী এক জন।

দুর্ব্বাসা। উত্তম! উত্তম! আর সংশপ্তকগণ?

কর্ণ। প্রভুর মন্ত্রণা দাস করেছে পালন।

তাহার কৌশলে প্রভু! সংশপ্তকগণ
করিয়াছে ধনঞ্জয়ে যুদ্ধে আবাহন.
হইতেছে সংশপ্তকে ধনঞ্জয়ে রণ
ঘোরতর!

হাসি ঋষি—"অতীব উত্তম।
মন্ত্রযুদ্ধে জয়ী বৎস! হইলে আমরা,
তব করে ঘৃতাহুতি করিয়া প্রদান
কৌরবের রাজ্যলোভে. করিলে বিফল
পঞ্চগ্রাম-ভিক্ষা চক্র গোপ পামরের,—
নিবারিতে এই যুদ্ধ, শান্তির কমল
ফুটাইয়া ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
আপনার বেদ-দ্বেষী, কতই কৌশল
করেছিল দুরাচার! অজস্র শিশির
বরষিয়া তব করে করিলে নির্ম্মূল
অঙ্কুরে সে শতদল, গেল দ্বারিকায়।
রহি নিরপেক্ষ চক্রী ভেবেছিল মনে
রক্ষিবেক এই মহাক্ষত্রিয় খাণ্ডবে
আপনার কুলত্রয়! দেখিলাম আমি
দিব্য চক্ষে. থাকে যদি পশ্চিম ভারতে
এ বিশাল কুলত্রয়, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের,
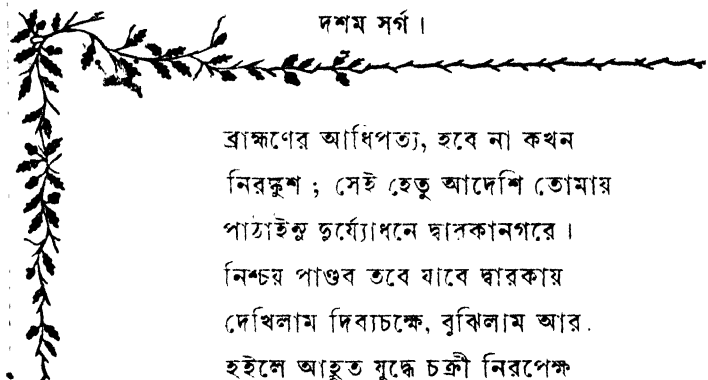
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, হবে না কখন
নিরঙ্কুশ ; সেই হেতু আদেশি তোমায়
পাঠাইনু দুর্য্যোধনে দ্বারকানগরে।
নিশ্চয় পাণ্ডব তবে যাবে দ্বারকায়
দেখিলাম দিব্যচক্ষে, বুঝিলাম আর.
হইলে আহূত যুদ্ধে চক্রী নিরপেক্ষ
অনিচ্ছায় দুইপক্ষ করিবে গ্রহণ,—
পড়িয়াছে ঊর্ণনাভ আপনার জালে !
সারথ্য করিয়া আজি দেখ নারায়ণ
নাশিছেন নারায়ণী সেনা আপনার,—
কণ্টকে কণ্টক দিব্য হতেছে উদ্ধার !
কাপুরুষ বাঁচাইতে আপনার প্রাণ
করিয়াছে নীচকর্ম্ম সারথ্য গ্রহণ।
দুর্ব্বাসার যোগ-মন্ত্র কাল সেই প্রাণে
করিবেক বজ্রাঘাত অমোঘ সন্ধানে।
সব্যসাচি সংশপ্তকে হ'লে কাল রণ,
রবে একমাত্র যোদ্ধা পাণ্ডব শিবিরে
দ্রোণ-কর্ণ প্রতিদ্বন্দী, রক্ষিতে পাণ্ডবে
হইবেক মহারথী যুদ্ধে অগ্রসর,
তাহাকে বধিতে কালি হইবে নিশ্চয় !"

কর্ণ　　কে সে প্রভো !

　　　　　　　কাণে কাণে কহিলা দুর্ব্বাসা।

অঙ্গপতি বীর অঙ্গ উঠিল শিহরি।

দুর্ব্বাসা।　পাণ্ডবের দুই ভুজ—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়।

ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,

উন্মত্ত, কটাক্ষে করি ধ্বংস কুরুকুল,

বিশ্বত্রাস বজ্রাগ্নিতে তৃণরাশি যথা,

হইবেক অবসন্ন।　কাটিবে হেলায়

সপাণ্ডব এক ভুজ তুমি পরাক্রমে;

নিক্ষেপিব অন্য ভুজ পশ্চিম সাগরে।

অব্যর্থ তপস্যা মম;—দুই দিন আর

বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু যাবে রসাতল;

কর্ণের সাম্রাজ্য-ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল।

ও কি !!

　　　　চমকিলা ঋষি—"কি যেন নড়িল !

আইস দেখিয়া।"　কর্ণ কহিলা ফিরিয়া—

"কিছুই না, আঁধারের পশ্চাতে আঁধার।"

বসিলেন পূর্ব্বাসনে চিন্তাকুল মনে।

কর্ণ।　এ দ্বাদশ দিন সে ত করে নাই রণ,

রণক্ষেত্র তার যেন ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ !
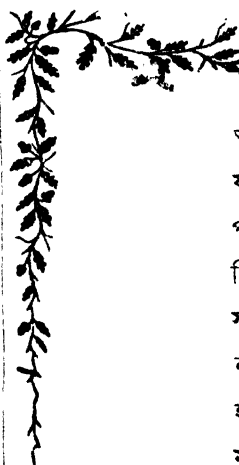
আসিলে সে রণক্ষেত্রে, মহারথী কেহ
যদি হয় সম্মুখীন, অপূর্ব্ব কৌশলে
পরাভবি যায় শিশু উপহাস করি।
স্থির চিত্তে যদি রণে হয় অগ্রসর,
সহজে জিনিবে তারে দ্রোণ কি কর্ণের
নাহি সাধ্য, সিংহ-শিশু সিংহ-পরাক্রম।
হউক যতই ক্ষুদ্র ভীম বজ্রানল,
মহামহীরুহ নাহি সবে তার বল।

দুর্ব্বাসা। একা কর্ণ, একা দ্রোণ, নাহি পারে যদি,
দ্রোণ কর্ণে মিলি তবে করিবে সমর।
নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে ; বধে যেই মতে
মৃগেন্দ্রে ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ,
আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন।

কর্ণ। এই ব্যাধ-বৃত্তি প্রভু ! বীরধর্ম্ম নয়।
পারিবে না দ্রোণ কর্ণ।

দুর্ব্বাসা। না পারুক দ্রোণ,
অবশ্য পারিবে কর্ণ।

কর্ণ। পারিবে না দাস।

দুর্ব্বাসা। হেলায় গুরুর আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন !

কর্ণ। অনুমতি কর গুরো! ধনুর্ব্বাণ করে
ন্যায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রণ,—
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী! আসুন আহবে
বজ্রপাণি, শূলপাণি, দেব-সেনাপতি,
পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সমর।
হানিয়াছিলাম খড়্গ তোমার আজ্ঞায়
পুত্র বৃষকেতু শিরে; আজ্ঞা কর যদি
হানিব আপন শিরে, কাটি এই শির
গুরু ভক্তি উপহার দিব পদাম্বুজে।
এক মাত্র চাহি ভিক্ষা—বীরত্বে কর্ণের
করিও না এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ।

দুর্ব্বাসা। নিজ পুত্র হইতে কি তবে প্রিয়তর
শত্রুপুত্র? তার বধে পাপ সমধিক?

কর্ণ। প্রতিশ্রুত ছিল দাস পাদপদ্মে তব,—
গুরু, বিপ্রে, যেই ভিক্ষা চাহিবে যখন
অম্লান বদনে তাহা করিবে প্রদান।
আপনি চাহিলে ভিক্ষা; তুলিলাম অসি
পুত্রশিরে; ভাবিলাম রহিবে জগতে
দাতাকর্ণ নাম মম; রবে ভবে আর
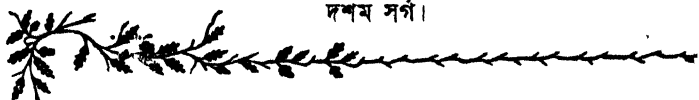
পুত্রত্যাগী গুরুভক্তি আদর্শ অতুল।

দুর্ব্বাসা। আজিও চাহি এ ভিক্ষা।

কর্ণ। দিবে ভিক্ষা দাস ;
কালি কর্ণ তার সনে করিবে সংগ্রাম
ঘোরতর। হা অদৃষ্ট! জয়, পরাজয়,
কর্ণের কলঙ্ক মাত্র ঘটাবে উভয়।

দুর্ব্বাসা। দ্রোণ, কর্ণ, উভয়ের স্নেহ-শ্লথ কর
পারিবে না দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বহুরথী মিলি,
ন্যায় কি অন্যায় যুদ্ধে, বধিবে তাহারে—
দুর্ব্বাসা চাহিছে ভিক্ষা।

কর্ণ। হা পুত্র আমার!
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত হিংসা-মরু মাঝে
কি অমৃত বাছা মম করে বিকীরণ!
কি কৌরব, কি পাণ্ডব, উভয় শিবিরে
বেড়ায় মনের সুখে, কৈশোর উচ্ছ্বাসে
পরিপূর্ণ বুক তার, পরিপূর্ণ মুখ।
শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ে সমান ভক্তি, প্রীতি সমতুল ;
আকাশের সুধাপূর্ণ সুধাকর সম
সর্ব্বত্র বরষে সুধা অজস্র ধারায়।

শিশুরা সকলে ভাই ; পিতৃব্য আমরা
সকলেই ; পত্নীগণ সকলি জননী ;
সমস্ত জগত তার প্রেমের নির্ঝর।
বৃষকেতু পাশে যবে বসে গলা ধরি,
গলা জড়াইয়া মম "তাত! তাত!" বলি
কহে যবে স্নেহকথা হাসি হাসি মুখ,
বাসি ভাল পুত্রাধিক। ইচ্ছা হয় মনে
চিরিয়া হৃদয় তারে রাখি সেই খানে,
সে নহে এ জগতের কর্কশ বন্ধুর।
ইচ্ছা হয় ত্যজি এই ছদ্ম অভিনয়,
ধনুর্ব্বাণ করে নাশি কৌরব পাণ্ডব,
ভারত সাম্রাজ্যে তারে করি অধিষ্ঠিত,
জুড়াক্ জগত, শান্তি লভুক মানব।
দেব পিতা, দেবী মাতা, দেবতা মাতুল ;
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্ম্মূল!
এ অধর্ম্মে নিপতিত করো না দাসেরে!
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায়!

ক্ষুদ্র জতুগৃহ যেন উঠিল জ্বলিয়া
অকস্মাৎ! উঠি বেগে ক্রোধান্ধ দুর্ব্বাসা
কহিলা কর্ণের শিরে করি পদাঘাত—
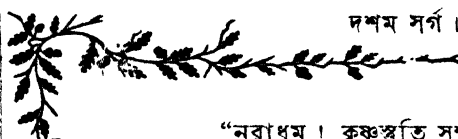
"নরাধম ! কৃষ্ণস্তুতি সম্মুখে আমার !
জমদগ্নি-সুত কাছে সূত্রধর-সুত
ক্ষত্রিয় বলিয়া যবে দিল পরিচয়,
সে ছলনা সমর্থন করিল দুর্ব্বাসা,
কোথা ছিল ধর্ম্ম তোর ওরে দুরাচার ?"

কর্ণ। গুরুদেব ! গুরুদেব ! নাহি জানি কেন
শিখিবারে যুদ্ধ বিদ্যা আছিল পিপাসা
আশৈশব ; কৃপা করি করিলে পূরণ !
কিশোর জীবনে সেই হইল সঞ্চার
ক্ষুদ্র পাপ ! সেই পাপে আনিয়াছে কোথা ?
তোমাদের আদেশে প্রভু ! ক্রীড়া রঙ্গভূমে
প্রবেশিনু কৌরবের বৈশ্বানররূপে,
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অন্তর নিগ্রহে।
সে অবধি হায় ! তব অঙ্গুলি নির্দ্দেশে,
তব করধৃত জড় পুত্তলিকা মত,
করি ছদ্ম অভিনয় কৌরব সভায়,
জ্বালাইনু প্রভু ! এই মহা দাবানল !
কোন পাপে আত্মা নাহি করিনু পাতিত !
নির্ব্বোধ অদূরদর্শী যেই দুর্য্যোধন
সূতপুত্রে দিল অঙ্গ-রাজ্য-সিংহাসন,
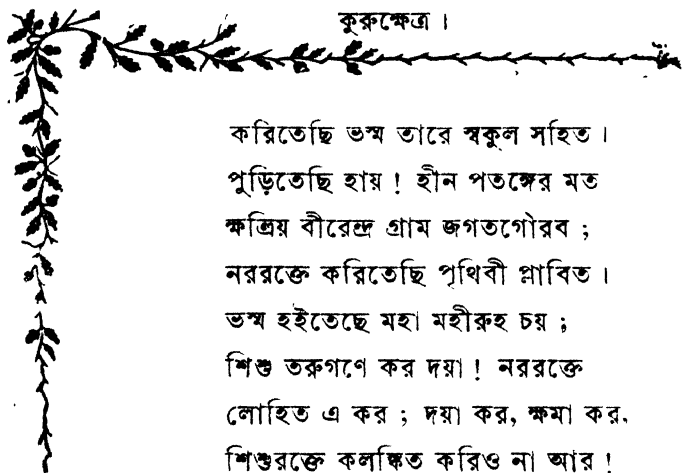
করিতেছি ভস্ম তারে স্বকুল সহিত।
পুড়িতেছি হায়! হীন পতঙ্গের মত
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র গ্রাম জগতগৌরব;
নররক্তে করিতেছি পৃথিবী প্লাবিত।
ভস্ম হইতেছে মহা মহীরুহ চয়;
শিশু তরুগণে কর দয়া! নররক্তে
লোহিত এ কর; দয়া কর, ক্ষমা কর,
শিশুরক্তে কলঙ্কিত করিও না আর!
দাতাকর্ণ নাম যার, বিশ্বাসঘাতক
নর-হন্তা আততায়ী সেই দুরাচার!
গুরুদেব! গুরুদেব! ক্ষমা কর এবে
ধরি তব পায়——

"পাপি! বিশ্বাসঘাতক!"—
গর্জ্জিয়া দুর্ব্বাসা পুনঃ করি পদাঘাত।
আসি এত দূর মূর্খ! এইরূপে তুই
দুর্ব্বাসার মনোরথ করিবি বিফল!
করিবি বিশ্বাস ভঙ্গ গুরু-জনকের!

কর্ণ। জনকের!

দুর্ব্বাসা। জনকের!

বিস্মৃত নয়নে
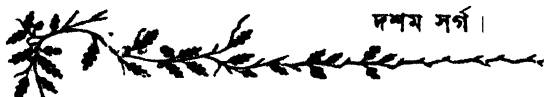
বিস্ময়ে চাহিলা কর্ণ ঋষিমুখ পানে
বিকৃত বিবর্ণ ক্রোধে। পড়িল ভাঙ্গিয়া
পর্ব্বতের চূড়া যেন মস্তকে নিমিষে।
নিমিষে হইল যেন ভীষণ নিনাদে
বিদারিত বিচূর্ণিত পৃথিবীমণ্ডল,
বীর বক্ষ দুরু দুরু উঠিল কাঁপিয়া।

দুর্ব্বাসা। শুন্ তবে কুলাঙ্গার! শিষ্য কুন্তিভোজ
করেছিল কন্যা কুন্তী আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সেবায়,—
পুত্রার্থী। একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজগৃহে; পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।
আকর্ষিল মন্ত্রবলে কুন্তী সবিতায়,
জনম হইল তোর। পাপীয়সী মাতা
নির্দ্দয়া সলিলে তোরে করিল নিক্ষেপ;
শিষ্যা রাধা সযতনে করিল পালন।
ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, সুশাণিত ক্ষত্রিয়কৃপাণ
দেখিলাম যোগবলে হবে প্রয়োজন।
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
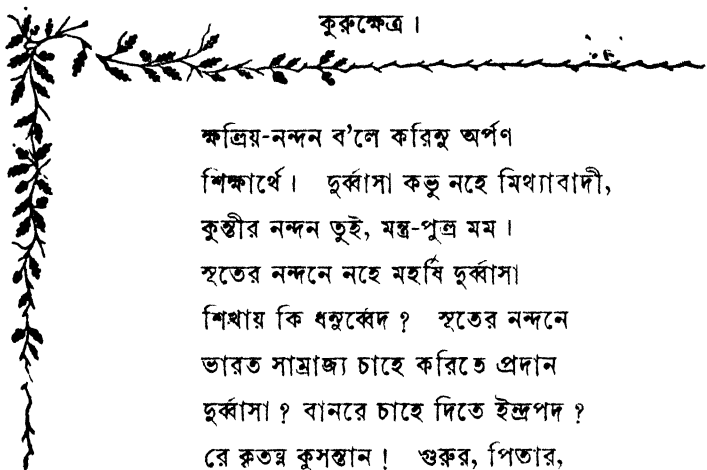
ক্ষত্রিয়-নন্দন ব'লে করিনু অর্পণ
শিক্ষার্থে। দুর্ব্বাসা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর নন্দন তুই, মন্ত্র-পুত্র মম।
সূতের নন্দনে নহে মহর্ষি দুর্ব্বাসা
শিখায় কি ধনুর্ব্বেদ ? সূতের নন্দনে
ভারত সাম্রাজ্য চাহে করিতে প্রদান
দুর্ব্বাসা ? বানরে চাহে দিতে ইন্দ্রপদ ?
রে কৃতঘ্ন কুসন্তান ! গুরুর, পিতার,
আজীবন ব্রত তুই করিবি বিফল ?
যে চাহে সাম্রাজ্য তোরে করিতে প্রদান,
তার প্রতি তোর এই তীব্র তিরস্কার ?
কি দারুণ কৃতঘ্নতা ! করে যেই কর
তোর মুখে দুরাচার ! আহার প্রদান,
দাহন করিবি তুই এই তীব্রানলে ?
যা রে চলি কুলাঙ্গার ! একটি অক্ষর
মম আদেশের যেন না হয় লঙ্ঘন।
স্তম্ভিত, বিস্মিত, ভীত কর্ণ রুদ্ধশ্বাসে
চলিলা মহর্ষি পদে করিয়া প্রণাম
চিন্তাকুল আত্ম-হারা। চলে না চরণ;
বসিলা কানন প্রান্তে অবসন্ন মনে।

দশম সর্গ
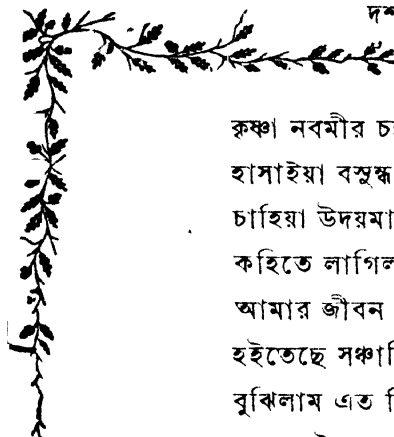
কৃষ্ণা নবমীর চন্দ্র উঠিতে লাগিল
হাসাইয়া বসুন্ধরা, ধীরে, ধীরে, ধীরে।
চাহিয়া উদয়মান সুধাকর পানে
কহিতে লাগিলা কর্ণ—"এইরূপে হায়!
আমার জীবন রাজ্যে ধীরে, ধীরে, ধীরে
হইতেছে সঞ্চারিত আলোক উজ্জ্বল।
বুঝিলাম এত দিনে সূত-নন্দনের
কেন এই ভুজে বল; কেন হৃদয়েতে
রাজ্য আশা; এ জিগীষা পিপাসা দারুণ;
এ দারুণ অভিমান; কোন আকর্ষণে
চলিয়াছে এত দিন যন্ত্রের মতন
দুর্ব্বাসার ক্রূর করে। হায়, আমি তবে
কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র দুর্ব্বাসার!
যার যন্ত্রণায় কুন্তী, কুন্তীপুত্রগণ,
ভুঞ্জিছে দুর্গতি এত, কুন্তীর তনয়
সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের!
ক্ষত্রিয় সে! অসম্ভব। না না এত নীচ
নহে রক্ত ক্ষত্রিয়ের! কুন্তী পুণ্যবতী;
তাঁর গর্ভে এ পাপীর জন্ম অসম্ভব।
সুরভির গর্ভে নাহি জনমে শার্দ্দূল

বিনাশিতে জননীকে সহ বৎসকুল ;
সিংহিনীর গর্ভে নাহি জনমে শৃগাল।
ক্ষত্রিয় যে বীর, ব্যাধ নহে কদাচন !
বীরত্ব—ক্রূরত্ব নহে,—ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
ক্ষত্রিয়ের শর ছোটে সরল রেখায়
দিবালোকে, অন্ধকারে ব্যাধ পাতে জাল।
সূতের নন্দন আমি, পিতা অধিরথ,
মাতা রাধা। না, দুর্ব্বাসা নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর তনয় আমি। কিন্তু যে জননী
নিক্ষেপিল জলে সদ্য-প্রসূত সন্তান,
মাতা নহে, রাক্ষসী সে। তার পুত্রগণ
পিতৃ-শত্রু, শত্রু মম, নহে সহোদর।
অবশ্য করিব রণ"

উঠিয়া সবেগে
আস্ফালিয়া দুই ভুজ কহিলা গর্জ্জিয়া—
"অবশ্য করিব রণ। আইস অর্জ্জুন !
আয় অভিমন্যু !—কিন্তু অস্ত্র পড়ে না যে মনে !
গ্রাসিছেন রথ-চক্র মাতা বসুন্ধরা
এ পাপীর। ধনঞ্জয় ! ছাড় তীক্ষ্ণশর
ক্ষিপ্র করে বজ্রনাদে ! নাহি জান তুমি
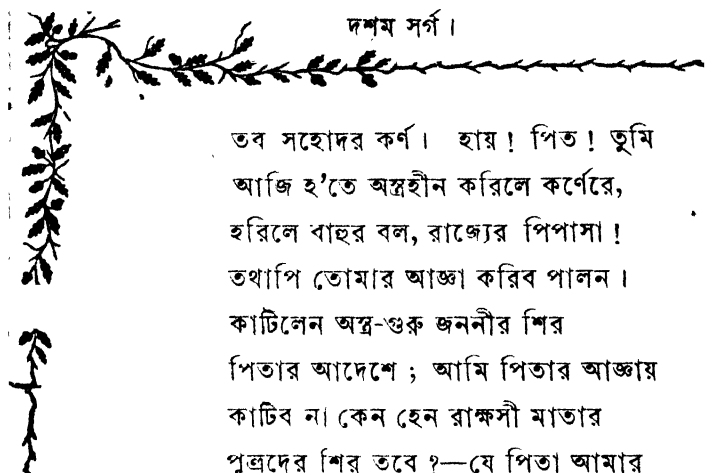
তব সহোদর কর্ণ। হায়! পিত! তুমি
আজি হ'তে অস্ত্রহীন করিলে কর্ণেরে,
হরিলে বাহুর বল, রাজ্যের পিপাসা!
তথাপি তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
কাটিলেন অস্ত্র-গুরু জননীর শির
পিতার আদেশে; আমি পিতার আজ্ঞায়
কাটিব না কেন হেন রাক্ষসী মাতার
পুত্রদের শির তবে?—যে পিতা আমার
পালিল বর্জ্জিত সদ্য-প্রসূত কুমার,
দিল জ্ঞান, অস্ত্র শিক্ষা, যাহার কৃপায়
কর্ণ আজি কর্ণ, কর্ণ অঙ্গ-অধিপতি?
এই চলিলাম মাত! নিক্ষেপিলে জলে
যেই পুত্রে, পুত্রহীন করিয়া তোমায়
ভাসাইবে অকূলে মা শোকের সাগরে।
মুদ আঁখি চন্দ্রদেব! তব বংশধর
চলিল নির্ম্মূল বংশ করিতে তোমার!"
ছুটিলেন বৈকর্ত্তন। হাসি উচ্চ হাসি,
বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
কহিতে লাগিল কারু—"সহোদর মম
সরল শিশুর মত, ক্লান্ত-পথশ্রমে

নিদ্রা যাইতেছে সুখে আপন কুটীরে।
কিন্তু আমি পোড়ামুখী শুনিনু যখন
হ'বে মন্ত্রণা গুপ্ত কর্ণের সহিত
মহর্ষির, পোড়া চক্ষে আসিল না ঘুম।
কিন্তু আমি জাগ্রত কি? জাগিয়া মানুষ
এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কি কখন?
আমি কে? কারু কি? ধর্ম্ম-পত্নী দুর্ব্বাসার?
না কি স্বপ্ন-রাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ?
এ হাত? কারুর বটে। কদম্ব দাড়িম্ব?
কারুর। এ ক্ষীণ কটি? তাহাও কারুর।
শ্রোণীভারে আর এই অলস গমন?
কারু সুন্দরীর তাও। সর্ব্বশেষ এই
মার্জ্জিত শাণিত বুদ্ধি? মনসা বিহনে,
দুর্ব্বাসার প্রাণেশ্বরী, সম্ভবে কাহার?
কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র, স্বপ্ন নহে তবে!
পুত্র নহে, মন্ত্র-পুত্র! ভোজ নৃপতির
নাহি ছিল মৃত্যু আর, কুমারী কন্যায়
করেছিল নিয়োজিত দুর্ব্বাসা-সেবায়।
সেবায় হইয়া তুষ্ট মহর্ষি গোপনে
দিলা মন্ত্র ব্যভিচার, না না, অভিচার।

কুমারী টানিল সূর্য্য, নামিল ভাস্কর
ছাড়ি আকাশের কায, জন্মিল কুমার!
গিলে কি হে আর্য্যজাতি এই ভস্ম ছাই
অকপটে? হরি! হরি! এ কি ব্যভিচার?
কি করিবে কৃপাপাত্রী কুন্তী অভাগিনী?
শিষ্য পিতা; দুর্ব্বাসাও ঋষি ধুরন্ধর,
অভিশাপে ভরা পেট, ক্রোধে গড় গড়।
পাইতাম আমি যদি মন্ত্র অভিচার,
না টানি পিতায়, অগ্নি-পিণ্ড ভয়ঙ্কর
হস্ত-পদ-হীন, টানি তনয়ে তাহার
চাপিতাম মহর্ষির মস্তক উপর।
তার পরে এত দূর নাহি গিয়া আর,
ওই কুরুক্ষেত্র হ'তে আনিতাম টানি
আমার হৃদয় চোরে, এই জ্যোৎস্নায়
হইত কি অভিসার—না না,—অভিচার!
কিবা ঘোর ষড়যন্ত্র! অসাধ্য ইহার
নাহি বুঝি কোন পাপ অবনীমণ্ডলে?
কিন্তু ব্যাধ পড়িয়াছে আপনার জালে।
ফুরাবে কর্ণের লীলা দুই দিনে আর?
নিদ্রা যাও নাগরাজ! সাম্রাজ্যে তোমার।
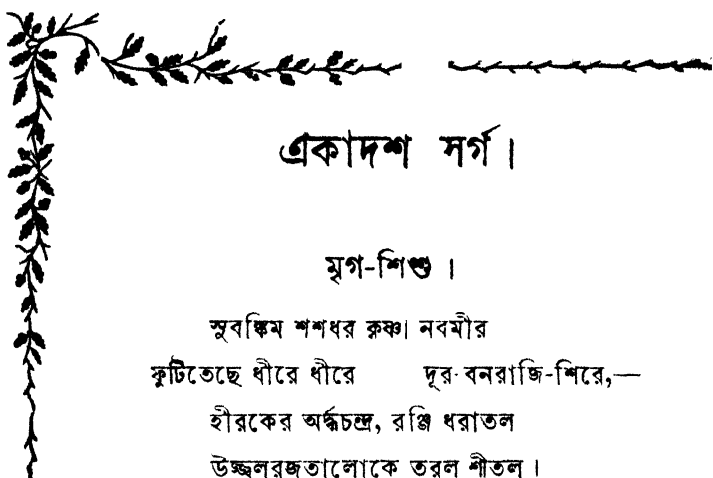
একাদশ সর্গ।

মৃগ-শিশু ।

সুবঙ্কিম শশধর কৃষ্ণা নবমীর
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে দূর-বনরাজি-শিরে,—
হীরকের অর্দ্ধচন্দ্র, রঞ্জি ধরাতল
উজ্জ্বলরজতালোকে তরল শীতল।
চাহি সে ফুটন্ত শশী, শিবির গবাক্ষে বসি
উত্তরা ও অভিমন্যু ; গাইছে উত্তরা.
বাজে কুমারের করে বীণা সপ্তস্বরা।
রহিয়া রহিয়া সুখে প্রেম-উচ্ছ্বসিত বুকে
গাইতেছে অভিমন্যু, সুধা বরষিয়া
জ্যোছনায় তিন বীণা উঠিছে ভাসিয়া।
সুস্বর-ত্রিবেণীধারা উদারা, মুদারা, তারা
খেলিয়া আকাশ-পথে উঠিছে কখন,
তারায় তারায় করি সুধা বিকীরণ।
কভু নামি ধরাতলে হিরণ্ময়ী নীলজলে
হিল্লোল কৌমুদী-মাখা করিছে চুম্বন,
কহি প্রকৃতির কাণে প্রীতির স্বপন।
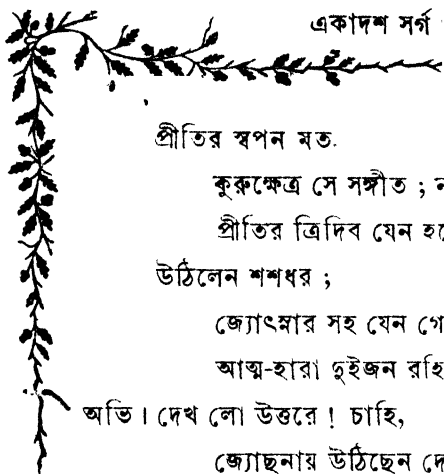
প্রীতির স্বপন মত শুনিতেছে নিদ্রাগত
কুরুক্ষেত্র সে সঙ্গীত ; নরকে হিংসার
প্রীতির ত্রিদিব যেন হতেছে সঞ্চার।
উঠিলেন শশধর ; ধীরে সঙ্গীতের স্বর
জ্যোৎস্নার সহ যেন গেল মিশাইয়া, —
আত্ম-হারা দুইজন রহিলা চাহিয়া।
অভি। দেখ লো উত্তরে ! চাহি, বসুন্ধরা অবগাহি
জ্যোছনায় উঠিছেন দেব শশধর,
পাপীর হৃদয়ে যেন পবিত্র ঈশ্বর !
এ সৌন্দর্য্য মনোহর, এ কবিত্ব মুগ্ধকর,
পারে লো বর্ণিতে বর্ণে কোন চিত্রকরে ?
পারে কোন কবি বল চিত্রিতে অক্ষরে ?
উত্তরা। পারে জানি একজন !
  "কে উত্তরে ?"—অন্যমন
জিজ্ঞাসিলা অভিমন্যু। অধরে তখন
আদরে বিরাট-বালা করিল চুম্বন।
"আমি !" যুবা কহে হাসি, "তবে যে রে অগ্নিরাশি
করিস্ ব্যবস্থা মম চিত্র, কবিতার ?"
উত্তরা। তারা কেন প্রতিযোগী হইবে আমার ?
নিয়ে চিত্র কবিতায় থাক সদা, উত্তরায়
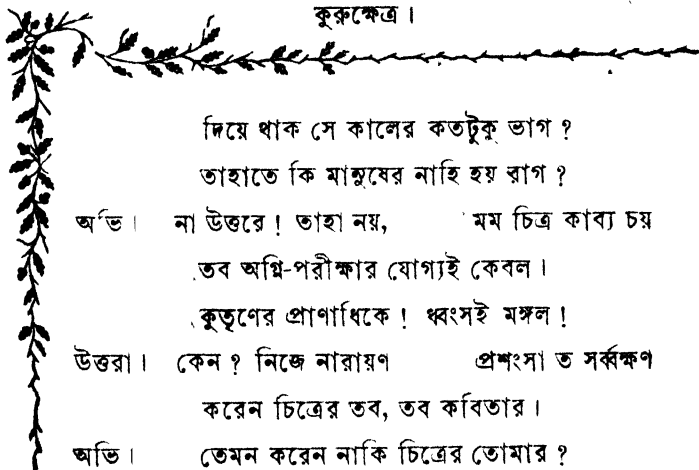
দিয়ে থাক সে কালের কতটুকু ভাগ ?
তাহাতে কি মানুষের নাহি হয় রাগ ?

অভি। না উত্তরে! তাহা নয়, মম চিত্র কাব্য চয়
তব অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্যই কেবল।
কুতৃণের প্রাণাধিকে! ধ্বংসই মঙ্গল!

উত্তরা। কেন ? নিজে নারায়ণ প্রশংসা ত সর্ব্বক্ষণ
করেন চিত্রের তব, তব কবিতার।

অভি। তেমন করেন নাকি চিত্রের তোমার ?

উত্তরা লুকাইয়া একখানি এঁকেছিনু ছবি আমি,
দাইমা পোড়ারমুখী দেখি অকস্মাৎ
লইয়া ছুটিল, আমি ছুটিনু পশ্চাৎ।
বলে—"ভদ্রা দেখ! দেখ! আনিয়াছি ছবি এক,
শাশুড়ীর চুরি বিদ্যা শিখিয়াছে বউ।
ওমা! এ ছুঁড়ীর পেটে এত বিদ্যা, হুঁ ?"
মা বাবা হাসিয়া কত প্রশংসা করিল শত ;—
মায়ের অঞ্চলে আমি লুকায়ে লজ্জায়।
কহিলেন মাতা যেন, গলিয়া মায়ায়,—
"কহিবি অভিরে, দিদি! আমার অঞ্চল-নিধি
রাখে যেন তারে পার্শ্বে আঁকি এই পটে!"
তখন সে পোড়ামুখী কহে হাসি,—"বটে ?
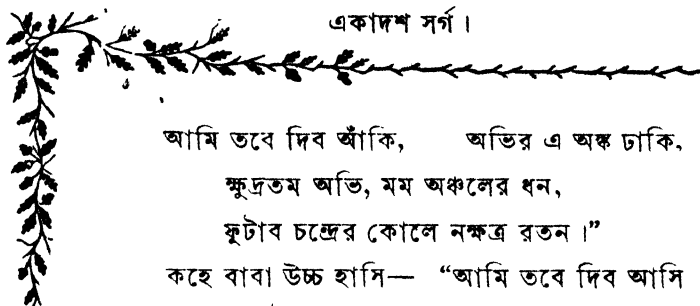
আমি তবে দিব আঁকি, অভির এ অঙ্ক ঢাকি,
ক্ষুদ্রতম অভি, মম অঞ্চলের ধন,
ফুটাব চন্দ্রের কোলে নক্ষত্র রতন।"
কহে বাবা উচ্চ হাসি— "আমি তবে দিব আসি
একটি উত্তরা ক্ষুদ্র আঁখি পাশে তার।"
সুলী কহে—"বরকন্যা তোমার আমার?"
মা কহিলা হাসি—"তবে দ্বিতীয় গোগৃহ হবে
যুঝিতে তোমার পুনঃ, মনের মতন
যোগাইতে পুতুলের বসন ভূষণ!"
সুলীমার মুখে ছাই, হাসি কহে—'তাই, তাই,
সুলোচনা হবে তবে সৈরিন্ধ্রী আবার
বিরাট,—কীচক, ভীম,—ঝণ্টিকা আমার।"
চাহি ফুল্ল চন্দ্র পানে নীরব উভয়।
হইতেছে চন্দ্রে যেন সেই অভিনয়।
সেই জ্যোৎস্নার উৎসে জনক জননী,
পিতা নীলপ্রভ, মাতা জ্যোৎস্না বরণী—
দেখিছেন ছবি বসি আনন্দে অধীর,
দাঁড়াইয়া সুলোচনা বদন গম্ভীর।
চাহি সেই দৃশ্য পানে আঁখি ছল ছল,
লজ্জায় কুঞ্চিত নেত্র, ভক্তিতে সজল।

অভি। ভাগ্যবান ভাগ্যবতী আমাদের মত
আছে কি জগতে আর ?
না জানি, উত্তরে! আহা ; জন্ম জন্মান্তর
করিয়াছি কত পুণ্য, অক্ষয় অতুল,
ভদ্রার্জ্জুন মাতা পিতা, গোবিন্দ মাতুল।

উত্তরা। এই পোড়া যুদ্ধ নাথ! কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার ?
ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি।
মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে।
নির্ম্মাইয়া তথা পুষ্প-কুটীর সুন্দর,
জনক জননী পদ সেবি নিরন্তর।
কানন কপোত, বন কপোতিনী মত,
মুখে মুখে, বুকে বুকে, থাকি অবিরত।

অভি। সুলীমা রবে না সঙ্গে ?

উত্তরা। নিব না তাহায়,
পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়।
না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া
না পায়ে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া।

মুহূর্ত্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,
বৎসহারা গাভী মত মরে গরজিয়া।
আমিও যে পারিব না, কি যে সর্ব্বনাশী,
এত দেয় গালি তবু কত ভালবাসি!
সুলীমাও যাবে সঙ্গে; তা হইলে আর,
রহিবে না কোনো দুঃখ তব উত্তরার।
কিন্তু——————

অভি। কিন্তু কি লো?

উত্তরা। কিন্তু, পুত্র ত আমার
হবে রাজা?
উচ্চ হাসি হাসিলা কুমার।

উত্তরা। পুতুল লইয়া খেলা করিতাম যবে
পিত্রালয়ে, প্রাণনাথ! নাহি বুঝি ভবে
এমন সুখের দিন!
সখীদের পুত্রগণ মন্ত্রী কর্ম্মচারী!
হইত আমার পুত্র রাজা ছত্রধারী!
সে উত্তর গোগৃহের ভূষণে নির্ম্মিত
পুত্র পুত্রবধূ মম আছে সুরক্ষিত।
বাবা মা বড়ই ভাল বাসেন দুটিরে;
হাসিয়া কহেন হরি—"নাতি নাতিনীরে

—কৌরবের ভূষণেতে নির্ম্মিত, ভূষিত,—
কৌরবের সিংহাসনে করিব স্থাপিত।"
অপূর্ব্ব পুতুল দুটি কুরু সিংহাসনে,
যার তার এই মহা কুরুক্ষেত্রে রণ!—
উচ্চ-হাসি অভিমন্যু হাসিলা আবার।
উত্তরাও উচ্চহাসি হাসিল এবার!

অভি। কি সুখের ছবি আহা! আঁকিলি, উত্তরে!

সেই বনবাসে।

যায় তিন বর্ষ প্রায় এক দিন মৃগয়ায়
গিয়াছি মলয়াচলে কৈশোর উল্লাসে।
উল্লাসে উন্মত্ত প্রাণ; কি বিদ্যুৎ খরশাণ
বহে মৃগয়ায় প্রিয়ে শিরায় শিরায়,
ছাড়াইয়া রক্ষিগণে, পশিনু নিবিড় বনে,
অনুসরি মহা ব্যাঘ্র ভীম চিত্রকায়।
করি ঘোর গরজন কাঁপাইয়া সর্ব্ব বন,
কানন-আতঙ্ক ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন;
দেখিনু মস্তকোপরি প্রচণ্ড তপন।
ক্লান্ত প্রাণ পিপাসায়, হারায়েছি পথ তায়,
দেখিনু তখন
কি অপূর্ব্ব পুণ্যাশ্রম! কিবা শান্তি-নিকেতন!
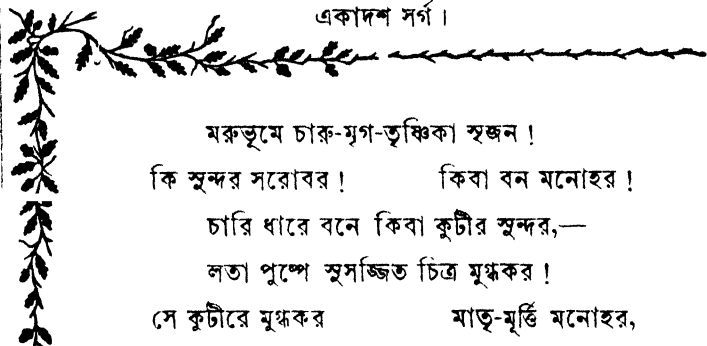
মরুভূমে চারু-মৃগ-তৃষ্ণিকা সৃজন!
কি সুন্দর সরোবর! কিবা বন মনোহর!
চারি ধারে বনে কিবা কুটীর সুন্দর,—
লতা পুষ্পে সুসজ্জিত চিত্র মুগ্ধকর!
সে কুটীরে মুগ্ধকর মাতৃ-মূর্ত্তি মনোহর,
জ্যোছনা-প্রদীপ্ত-নীল-আকাশ-নির্ম্মিত,
কিবা স্নেহ, কিবা শান্তি, কিবা সুধা মণ্ডিত!
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত, বেদি বক্ষে সুস্থাপিত
পিতার মৃণ্ময়-মূর্ত্তি, সুচারু-নির্ম্মাণ,
মনোহর মৃগয়ার বেশে শোভমান।
পুলকে ভরিল বুক,— গাইতেছে সারীশুক
জনকের দশ নাম বিহঙ্গ নিচয়
স্থানে স্থানে পিঞ্জরায়, বন বিহঙ্গেরা গায়
বৃক্ষে বৃক্ষে শুনি সেই নাম পুণ্যালয়;
নামের সঙ্গীতে বন প্রতিধ্বনিময়।
মুক্তকেশী উদাসিনী জননী বন-বাসিনী
সেই দশানন প্রিয়ে! গাইলে আদরে,
শশক, ময়ূর, মৃগ, কুক্কুট সুস্বরে
প্লাবিত করিয়া বন, কলকণ্ঠে হংসগণ,
আসি পালে পালে সেই বন মাতা পাশে,
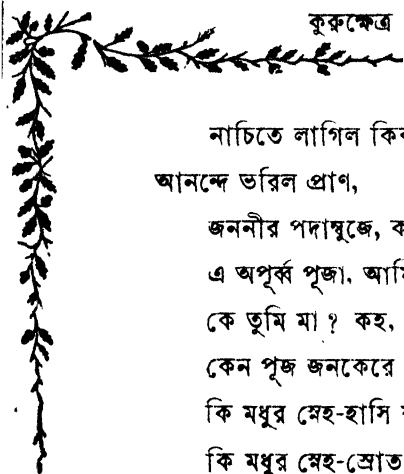
নাচিতে লাগিল কিবা কানন উল্লাসে !
আনন্দে ভরিল প্রাণ, ছুটিয়া করি প্রণাম
জননীর পদাম্বুজে, কহিনু—"যাহার
এ অপূর্ব্ব পূজা, আমি কুমার তাঁহার ।
কে তুমি মা ? কহ, বড় কুতূহল মনে,
কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে ?"
কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে !
কি মধুর স্নেহ-স্রোত উছলিল বুকে !
কি মধুর স্নেহ-স্বরে কহিলা—"বাছা রে !
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে ।
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব !
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর ?
ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর ?
পার্থ উপাসিকা আমি । কেন পূজি তারে ?—
কেন পূজে বৎস ! নর ওই সবিতারে ?
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য,—কে না পূজে বল ?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতলে ।
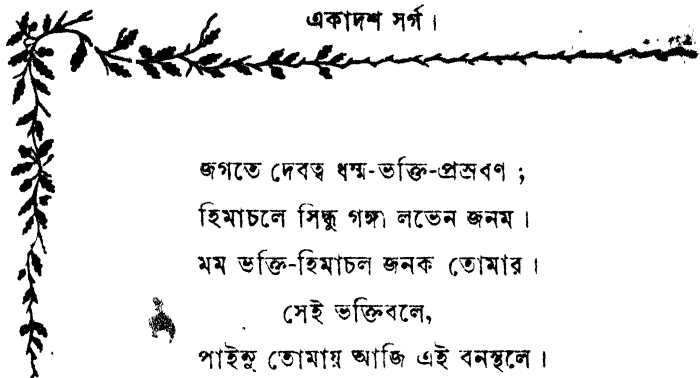
জগতে দেবত্ব ধর্ম্ম-ভক্তি-প্রস্রবণ ;
হিমাচলে সিন্ধু গঙ্গা লভেন জনম।
মম ভক্তি-হিমাচল জনক তোমার।
সেই ভক্তিবলে,
পাইনু তোমায় আজি এই বনস্থলে।
এস বৎস ! এস বুকে ! তপস্যা আমার
হইল সফল বুঝি" ;—
সরিল না আর
কথা জননীর মুখে, লইয়া আমায় বুকে,
চুম্বিলা মা কতই চুম্বন !
কতই আনন্দ-অশ্রু করিলা বর্ষণ !
কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ হ'য়ে অবারিত,
আমায় করিল যেন স্নেহেতে প্লাবিত।
কি সুখে কাটিল দিন, সন্ধ্যা আগমনে
কাকলি কল্লোল কিবা উঠিল কাননে।
সেই কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া
বনপুত্র পুত্রীগণ গাইয়া গাইয়া
আসিতে লাগিল ; বন হইল পূরিত
হাস্যরবে শঙ্খনিত, বাঁশীর সহিত।
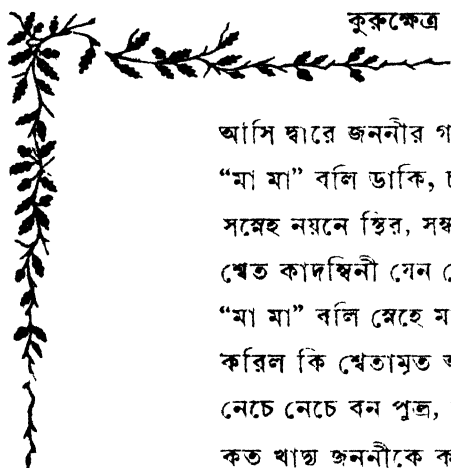
আসি দ্বারে জননীর গাভী 'পুণ্যবতী'
"মা মা" বলি ডাকি, চাহি জননীর প্রতি
সস্নেহ নয়নে স্থির, সন্ধ্যার আঁধারে
শ্বেত কাদম্বিনী যেন শোভিল দুয়ারে।
"মা মা" বলি স্নেহে মাতা করিলে দোহন
করিল কি শ্বেতামৃত অজস্র বর্ষণ !
নেচে নেচে বন পুত্র, বন বালাগণ,
কত খাদ্য জননীকে করিল অর্পণ।
তাহাদের "মা মা" কণ্ঠ, স্নেহ সম্ভাষণ ;
জননীর স্নেহভাষা, আদর, চুম্বন ;
কেহ করে, কেহ কক্ষে, কেহ বা অঞ্চলে
ধরিয়া মায়ের, কেহ জড়াইয়া গলে,
কেহ জড়াইয়া বাহু, কেহ জানু আর,
কহিতেছে গোচারণ কত সমাচার !
'বনপুষ্প সম বনপুত্র কন্যাগণ ;
পুষ্পিতা বল্লরী মাতৃ শোভা নিরুপম
জননীর ; সেই বন-স্নেহের কানন ;—
কি স্বর্গ খুলিল শিশু-হৃদয়ে প্রথম !
কহিলা জননী তবে—"দেখ বাছাগণ !
আসিয়াছে মম রাজ-পুত্র একজন।"

থামিল সে কোলাহল, বিস্ময়ে সকল
চাহিল আমার পানে নেত্র অচঞ্চল ।
চাহিয়া চাহিয়া মম বসন ভূষণ
কহিল সঙ্কোচে—"মা গো ! বনপুত্রসনে
খেলিবে কি রাজপুত্র, যাবে গোচারণে ?"
মাতা মাতুলের সেই শিক্ষা প্রীতিময়
তখন আমার মনে হইল উদয় ;
"সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী,
সকলের পুত্র কন্যা ভ্রাতা ও ভগিনী ।
দেখিব সকল জীব আপনার মত,
পরহিত প্রাণপণে সাধিব সতত ।"
"খেলিব, যাইব"—আমি কহিনু উল্লাসে ।
পূরিল প্রাঙ্গণ কিবা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে !
আকাশে উঠিল চন্দ্র, চারু জ্যোৎস্নায়
খেলিলাম কত খেলা আলোক ছায়ায় ।
খাইলাম কত কিছু মিলি সবে সুখে,
পড়িলাম ঘুমাইয়া জননীর বুকে !
প্রভাতে বালকগণ খুঁজিয়া কানন,
আনিল সঙ্গীর তত্ত্ব ! সজল নয়ন
বিদায় দিলেন মাতা । সজল নয়ন
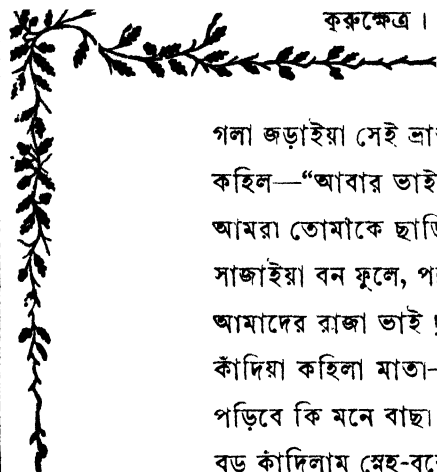
গলা জড়াইয়া সেই ভ্রাতা ভগ্নীগণ
কহিল—"আবার ভাই আসিবে কি বনে?
আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে?
সাজাইয়া বন ফুলে, পল্লব-মালায়,
আমাদের রাজা ভাই! করিব তোমায়।"
কাঁদিয়া কহিলা মাতা—"বন-জননীরে
পড়িবে কি মনে বাছা! আসিবি কি ফিরে?"
বড় কাঁদিলাম স্নেহ-বুকে জননীর;
কাঁদিলাম গলা ধরি ভাই ভগিনীর।
পথে পথে কত ফল, তুলি কত ফুল,
দিল তারা! সে যে স্নেহ জগতে অতুল।
জিজ্ঞাসে বিরাট-বালা সজলনয়না—
"বন-বাসিনীর সেই চারু-উপাসনা
জানেন কি পিতা মাতা?" সজল নয়নে
উত্তরিলা অভিমন্যু—"নাহি লয় মনে।
বিদায়ের কালে কোলে লইয়া আমারে
স্নেহ শোকোচ্ছ্বাসে মাতা কহিলা—'বাছা রে!
জনক জননী কাছে বন-বাসিনীর
কহিও না কোন কথা; এই তাপসীর
কহিলে তপস্যাব্রত হইবে বিফল।
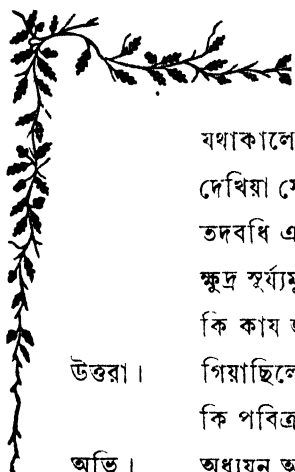
যথাকালে তাঁহাদের চরণ কমল
দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন,
তদবধি এ তপস্যা রহিবে গোপন।
ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে,
কি কায জানিয়া তাঁর, জানাইয়া তাঁরে।”

উত্তরা। গিয়াছিলে সেই বনে আর কি কখন?
কি পবিত্র, কি সুন্দর, স্থান সেই বন!

অভি। অধ্যয়ন অবসরে, অবসন্ন মন,
কতবার সেই বনে করেছি গমন।
সেই ক্ষুদ্র স্নেহ-স্বর্গে বনমাতাবুকে,
কাটায়েছি কত দিন, কত নিশি, সুখে।
সঙ্গী সঙ্গিনীর সঙ্গে কত দিবানিশি রঙ্গে
কাটায়েছি সেই বনে ক্রীড়া মৃগয়ায়!
কত গীত, কত নৃত্য, কানন ছায়ায়!
কভু বন-সরোবরে, নীল সুধাময়,
দিতাম সাঁতার; কত নীল কুবলয়,
—বন-বালকের বন-বালিকা বদন,—
ভাসিত সে নীল জলে, হংস হংসীগণ
সাঁতারিত, উচ্চ হাসি ছিন্ন গীত তানে
মিশাইয়া কলকণ্ঠ উল্লাসিত প্রাণে।

হংসিনীর মত ক্ষুদ্র তরণী সকল
সাজাইয়া পত্রে পুষ্পে, পতাকা উজ্জ্বল
উড়াইয়া, পত্রে পুষ্পে সাজিয়া আমরা,
করিতাম জলক্রীড়া । তরী মনোহরা
সঙ্গীতের তালে তালে নাচিত হিল্লোলে,
নাচিত মরালগণ গাইয়া কল্লোলে ।
সাজাইত পত্রে পুষ্পে আমাকে কখন
বনরাজা ; চারু বনমালা এক জন
সাজাইত বনরাণী ; পারিষদ চয়
সাজি সবে করাইত রাজ্য অভিনয় ।
পুষ্প বেদিকায়, কিবা পুষ্পিতা শাখায়,
সিংহাসনে দেখি রাজারাণী পুষ্পকায়,
কত হাসিতেন মাতা, চুম্বিতেন কত !
কহিতেন—"বউ ত হয়েছে মনোমত ?"
সত্য, ভাবিতাম আমি সে আমার রাণী ;
সত্য সে ভাবিত মনে আমি তার স্বামী ।
লইয়া দুটিকে মাতা কতই কৌতুক
করিতেন, হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ ।
"সতিনী ! সতিনী !"—বলি উঠিল হাসিয়া
উত্তরা—"আমার সেই পুতুলের বিয়া !
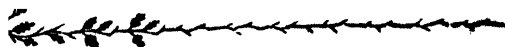
থাক এই পোড়া যুদ্ধ, রাজ্যের পিপাসা!
প্রাণনাথ! উত্তরার পূরাও এ আশা,—
চল সেই বনে নাথ! চল একবার
সেইমত বনরাণী সাজিব তোমার!
বসি সে মায়ের কোলে আনন্দে বিহ্বল,
সেই সতিনীর সঙ্গে করিব কোন্দল।"

অভি। আমারো এ সাধ প্রিয়ে! লইয়া তোমায়
রণান্তে যাইব সেই বনে দুজনায়।
কি আনন্দ-অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ!
কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন!
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! রণান্তে সে বনে
সুন্দর আশ্রম এক সৃজিব দুজনে।
দেখিয়াছি সিন্ধুতীরে শৈল মনোহর;
নির্ম্মাইব সেই শৈলে আবাস সুন্দর।
অর্দ্ধচন্দ্র, অষ্ট কোণ, চতুষ্কোণ আর,
শোভিবে অলিন্দ চারু চারি ধারে তার!
শোভিবে অলিন্দে পুষ্প গুল্ম থরে থর,
চারুপত্র গুল্ম সহ মিশিয়া সুন্দর!
সুরঞ্জিত স্তম্ভ সারি বেষ্টি সুবিমল
শোভিবে পুষ্পিতা চারু লতিকা সকল।
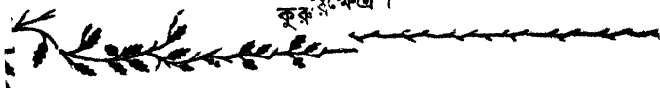
বিচিত্র বিহঙ্গগণ স্বস্থ অবসরে
নাচিবে গাইবে সুখে সুচিত্র পিঞ্জরে।
কুটীরের চারি দিকে চারি পুষ্পোদ্যান
চারি ভিন্ন অবয়বে হবে শোভমান।
শোভিবে উদ্যান-বক্ষ শ্যামল প্রাঙ্গণ
কারুকার্য্য-অলঙ্কৃত গালিচা যেমন।
প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে চম্পক, বকুল,
সুবাসিত পুষ্প বৃক্ষ শোভিবে অতুল।
শোভিবে পর্ব্বত পার্শ্বে, মূলে, মনোহর
ফলিত, পুষ্পিত, ক্ষুদ্র কানন সুন্দর।
বনে নির্ঝরিণী এক গাবে অবিরত
নিরজনে, অন্তঃপুরে উত্তরার মত।
বেষ্টি গিরিমূল এক তড়াগে নির্ম্মল
ঢালিবেক নির্ঝরিণী সুধা সুশীতল,
অভিমন্যু-হৃদয়েতে ঢালে যেই মত
উত্তরা শীতল প্রেম-অমৃত সতত।
নীলামৃতে ঢল ঢল সেই সরোবরে
সুবর্ণ রজত মীন সুখে রবিকরে
খেলিবেক শত শত ; ভাসিবে সতত
মরালে মরাল-বধূ উত্তরার মত
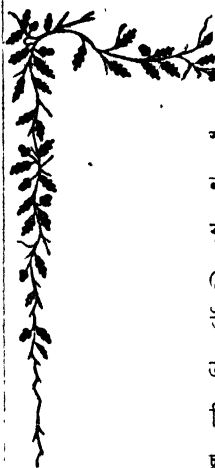
স্বনাথ মরাল সহ। নানা জলচর
নানা বর্ণ জলক্রীড়া করিবে সুন্দর।
কুরঙ্গ শশক শিখী প্রসারি পেখম
বেড়াবে প্রাঙ্গণে, বনে ; কুক্কুট কূজন
উঠিবে পঞ্চমে কিবা রহিয়া রহিয়া!
ক্রীড়াশীলা কুরঙ্গিণী যাইবে ছুটিয়া,
বিলোল কটাক্ষময়ী, বিদ্যুৎ আকার,
ছুটে যথা ক্রীড়াশীলা উত্তরা আমার।
বনে রাখালের বাঁশী, কণ্ঠ সুপঞ্চম,
করিবে সে নিরজনে কি সুধা বর্ষণ!
ডাকিবেক গাভীগণ রহিয়া রহিয়া,
গম্ভীর সে কম্বুকণ্ঠে কানন ভরিয়া!
কুটীরের কক্ষচয় রবে সুসজ্জিত,
মনোহর নানা উপকরণে খচিত।
শোভিবে শয়ন-কক্ষে গোলাপী প্রাচীরে
উত্তরার নানা চিত্র। কোথা মানিনীরে
সাধিতেছে অভিমন্যু ; কোথায় ছুটিয়া
যাইতেছে ক্রীড়াশীলা ঝলকে হাসিয়া,—
উড়িতেছে মুক্ত কেশ তরঙ্গ খেলিয়া ;
কোথায় বিখ্যাত সেই পুতুলের বিয়া।

কোথা বীণা করে বসি যেন বীণাপাণি,
কোথায় আমার বুকে রাখিয়া মু'খানি,—
চন্দ্রের হৃদয়ে সুধা,—চাহি পরস্পরে
অনিমেষ অবিশ্রান্ত অতৃপ্ত অন্তরে।

বসিবার কক্ষে নীলআকাশপ্রতিম
প্রাচীরে শোভিবে চিত্র,—ভারত প্রাচীন
ইতিহাস অঙ্কে অঙ্কে রহিবে চিত্রিত,
আর্য্যদের শৌর্য্যবীর্য্য মহিমামণ্ডিত।
কোথায় সরল সেই আর্য্য পিতৃগণ
রক্ষিছেন মেষপাল; করিছেন রণ
অনার্য্যের সহ; কোথা বসি নদীতীরে
গাইছেন সামগান প্রভাতে গম্ভীরে।
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে রহিবে অঙ্কিত,
ধনুর্ভঙ্গ, বনযাত্রা করুণার গীত।
বনবাস—পতি পত্নী প্রেম মনোহর;
সে জীবন্ত ভ্রাতৃভক্তি, চিত্তদ্রবকর;
সীতার হরণ; সেই করুণ রোদন
শ্রীরামের, চাপি বক্ষে সীতার ভূষণ;
অশোক-কানন; শক্তিশেল শোককর;
রথে রাম সীতা, নিম্নে ফেনিল সাগর;

একাদশ সর্গ
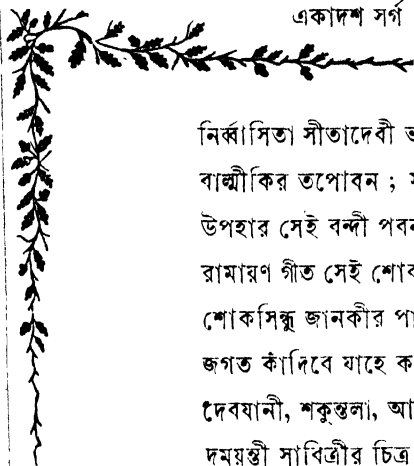
নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী ভাগীরথী-তীরে ;
বাল্মীকির তপোবন ; সীতা জননীর
উপহার সেই বন্দী পবনকুমার ;
রামায়ণ গীত সেই শোক অযোধ্যার ;
শোকসিন্ধু জানকীর পাতালপ্রবেশ,
জগত কাঁদিবে যাহে কাল নির্ব্বিশেষ।
দেবযানী, শকুন্তলা, আখ্যান সুন্দর ;
দময়ন্তী সাবিত্রীর চিত্র মনোহর।

অধ্যয়ন কক্ষে গ্রন্থ রবে চারি ধার,
ভারতের ত্রিকালের জ্ঞানের ভাণ্ডার।
হরিদ্রাভ প্রাচীরেতে রহিবে চিত্রিত,
আর্য্য ঋষিগণ ব্যাস বাল্মীকি সহিত।
অঙ্কে অঙ্কে কবিতার জন্ম উপখ্যান
রহিবে অঙ্কিত ; কোথা ব্যাধের সন্তান
সুপবিত্র রাম নামে হতেছে দীক্ষিত ;
কোথায় লভিছে বীণা অমৃত পূরিত ;
কোথা করি বিদ্ধ-ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন,
গাইতেছে "মা নিষাদ" কবিতা প্রথম ;—
করিছে অপ্সরাগণ পুষ্প বরিষণ,
হাসিতেছে বসুন্ধরা, সার্থক জীবন।

রবে উপাসনা কক্ষে মর্ম্মরে স্থাপিত
মাতা পিতা মাতুলের মূর্ত্তি অতুলিত।
নরদেব পিতা মম, মামা নারায়ণ,
প্রেমস্বরূপিণী মাতা পবিত্র বন্ধন
উভয়ের ;—প্রেমে নর পায় নারায়ণ,
নারায়ণ নর-দেহ করেন ধারণ।
বেদিমূলে এক পার্শ্বে মাতা সুলোচনা ;
অন্য পার্শ্বে বনমাতা গৈরিক-বসনা।
অমল মার্জ্জিত শ্বেত প্রাচীরে চিত্রিত
রবে কৃষ্ণার্জ্জুন লীলা, -নরের অতীত ;
সেই পুণ্য জন্মাষ্টমী ; শিশু জ্যোতির্ম্ময় ;
প্রহরী নিদ্রিত, দ্বার-মুক্ত কারালয় ;
যমুনা লঙ্ঘন সেই নিশীথ সময়ে ;
গোকুলে নন্দের গৃহে শিশু বিনিময় ;
বৃন্দাবনে গোচারণে ; বীরত্ব অদ্ভুত ;
রাস দোল গোপবালা সহ গোপসুত ;
সভামধ্যে দুরাচার কংসের নিধন ;
উগ্রসেনে মথুরার রাজত্বে বরণ ;
সিন্ধুতীরে দ্বারাবতী ; মাতা সত্যভামা ;
মাতা রুক্মিণীর সেই কৃষ্ণ আরাধনা ;
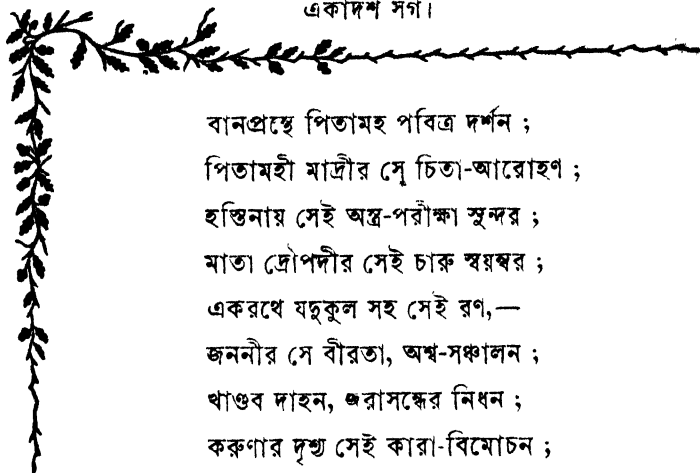
বানপ্রস্থে পিতামহ পবিত্র দর্শন ;
পিতামহী মাদ্রীর সে চিতা-আরোহণ ;
হস্তিনায় সেই অস্ত্র-পরীক্ষা সুন্দর ;
মাতা দ্রৌপদীর সেই চারু স্বয়ম্বর ;
একরথে যদুকুল সহ সেই রণ,—
জননীর সে বীরতা, অশ্ব-সঞ্চালন ;
খাণ্ডব দাহন, জরাসন্ধের নিধন ;
করুণার দৃশ্য সেই কারা-বিমোচন ;
রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের দলন ;
দ্যূতে পাণ্ডবের ধর্ম্ম-পরীক্ষা ভীষণ ;
সেই বনযাত্রা ; শিক্ষাগৃহ উত্তরার ;
উত্তর গোগৃহে রণ, সেই উপহার ;
সর্ব্বশেষ এই মহাকুরুক্ষেত্ররণ,—
কিবা শোভা এক রথে নর নারায়ণ !
চাহি অন্তরের পানে মহিমা মণ্ডিত,
দাঁড়াইয়া দুই বাহু করি প্রসারিত,
জগতের মহাধর্ম্ম-গীতার প্রচার।
সেই বিশ্বরূপ—মহাকাল অবতার !
পবিত্র ত্রিমূর্ত্তি,—মাতা, পিতা, নারায়ণ,—
পূজিব, করিব পদে আত্ম-সমর্পণ।

তাঁহাদের পদমূলে, ভক্তি-পূর্ণ মন,
করিব দুজনে নিত্য গীতা অধ্যয়ন।
তাঁহাদের সুপবিত্র নাম সুধাময়
গাইবেক অবিরাম বিহঙ্গ নিচয়
কুটীর করিয়া পূর্ণ; নর-লীলা গীত
গাইব আমরা ভক্তিকণ্ঠে পুলকিত।
সেই নাম-মন্ত্রে বন করিব দীক্ষিত,
গাবে বনবাসী, বনপশু সুললিত
শুনিবে সে নাম, তীর্থ হইবে কানন,
নর জন্ম, পশু জন্ম হইবে মোচন।
কখন সাজিয়া যোগী, সাজিয়া যোগিনী,
বেড়াইব দেশে দেশে করি নাম ধ্বনি,
গাইয়া সে লীলা গীত; করিয়া প্রচার
দ্বাপরের ধর্ম্ম,—গীতা, কৃষ্ণ,—অবতার।
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন
সাধিব, করিব ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্থাপন।
করিব ভূতল স্বর্গ, নর দেবোপম,—
নারায়ণ! এই স্বপ্ন কি হইবে পূরণ?

উত্তরা। আর সেই যোগী পিতা, যোগিনী মাতার
নিকটে আসিবে পুত্র নৃপতি ধরার,

চতুরঙ্গ দলে বলে, বউটা লইয়া,
হবে অভিনীত বনে পুতুলের বিয়া!

জড়ায়ে পতির গলা হাসে উচ্চ হাসি
বিরাট-নন্দিনী; চুম্বি সেই হাসি রাশি
অভিমন্যু উচ্চহাসি উঠিল হাসিয়া;
জ্যোৎস্নায় দুই হাসি গেল মিশাইয়া।

অভি। রবিকরে, জ্যোৎস্নায়, চাহি সিন্ধু শোভা,
চাহি বন-প্রকৃতির শোভা মনলোভা,
গাঁথিব কবিতা-হার; গাঁথিবে উত্তরা
কাছে বসি ফুলমালা; বীনা সপ্তস্বরা
বাজাইবে, বীণা কণ্ঠে গাইবে কখন
পূরিয়া সুধায় সেই নির্জ্জন কানন।
সঙ্গীত তরঙ্গে মুগ্ধ কল্পনা আমার
স্বর্গে, মর্ত্তে; অঙ্কে অঙ্কে করিবে বিহার।
বাসন্ত, শারদ, ফুল্ল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত
নীল বন-সরোবরে, তরী মনোহরা
ভাসাইয়া, নিরখিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত
নীলাকাশ গাব আমি, গাইবে উত্তরা।
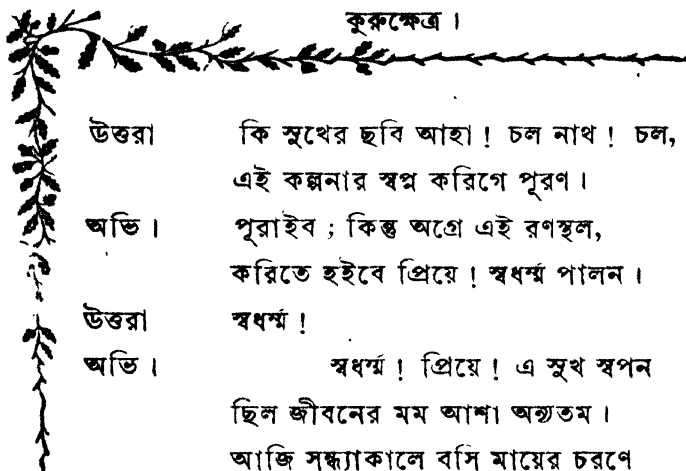
উত্তরা কি সুখের ছবি আহা! চল নাথ! চল,
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ।
অভি। পূরাইব; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল,
করিতে হইবে প্রিয়ে! স্বধর্ম্ম পালন।
উত্তরা স্বধর্ম্ম!
অভি। স্বধর্ম্ম! প্রিয়ে! এ সুখ স্বপন
ছিল জীবনের মম আশা অন্যতম।
আজি সন্ধ্যাকালে বসি মায়ের চরণে
বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি জ্ঞানের নয়নে,
অসার স্বপন নহে মানব জীবন।
মানব-জীবন কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন।
ধর্ম্ম-যুদ্ধ প্রিয়তমে! স্বধর্ম্ম আমার।
এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার।
কুরুক্ষেত্রে করি অগ্রে স্বধর্ম্ম পালন,
করি ধর্ম্মরাজ্য এই জগতে স্থাপন,
তবে পূরাইব শান্তি-স্বপ্ন আপনার,
নহে অগ্রে, পরে শান্তি যুদ্ধ ঝটিকার।
কালি হতে ঘোরতর করিব সংগ্রাম.
অর্পি ধর্ম্ম-রাজ্য ব্রতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ।
উত্তরা। না, না. নাথ! উত্তরার থাকিতে জীবন,

দিবে না তোমায় যুদ্ধে করিতে গমন।
যতক্ষণ থাক যুদ্ধে, প্রাণেশ আমার!
জান না কি করে প্রাণ তব উত্তরার।
স্বয়ং শ্বশুর যুদ্ধ করিছেন যবে,
কি কায তোমার বল গিয়া সে আহবে?
বালক বালিকা নাথ! আমরা দুজন,
করিব তাঁদের সেবা,—স্বধর্ম্ম পালন।

অভি। উত্তরে! উত্তরে! ওই জনক আমার
করিছেন কি ভীষণ যুদ্ধ অনিবার!
কত অস্ত্রাঘাত, ভীম বজ্রাঘাত কত,
সহিছেন অবিচল হিমাদ্রির মত।
তাঁহার তনয় আমি রমণী-অঞ্চল
ধরিয়া রহিব এইরূপে অবিচল?
না, না, প্রিয়ে! কালি আমি প্রবেশিব রণ,
দেখাইব অভিমন্যু অর্জ্জুননন্দন।
বাঁচি যদি ধর্ম্ম-রাজ্য করিয়া স্থাপন,
সেই কল্পনার স্বর্গে কাটিব জীবন
মরি যদি, মহাযুদ্ধে ত্যজিয়া জীবন
ওই চন্দ্রালোকে প্রিয়ে! করিব গমন।
স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি; গ্রহ তারাগণ

মনে হয় মানবের ভবিষ্য আশ্রম।
পুণ্য অনুসারে ওই গ্রহ তারাগণ
জন্ম জন্মান্তরে নর করে বিচরণ।
পুণ্যময় চন্দ্রলোকে যাইব আমরা,—
পিতা, মাতা, পুত্র, পুণ্য-জ্যোৎস্না উত্তরা।
নারায়ণ পদতলে বসিয়া সকলে,
লভিব অনন্ত-শান্তি অমর মণ্ডলে।
   বালিকার ক্ষুদ্র মুখ হইল গম্ভীর,
পড়িল মেঘের ছায়া যেন জ্যোৎস্নায়।
চাহি চন্দ্র পানে, রাখি পতি-বুকে শির,
রহিল নীরবে, নেত্র মুদিল নিদ্রায়।
চাহি চন্দ্রপানে অভিমন্যু কতক্ষণ
রহিলা নীরবে বসি; কতই ভাবনা
হইল উদয় মনে, জাগিল তখন
প্রতিভা সিন্ধুর বক্ষে কতই কল্পনা।
নিদ্রিতা বালিকা স্বপ্নে করিয়া চীৎকার
কহিল,—"না প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি, ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!"
কুমারের দুই চক্ষু হইল সজল।
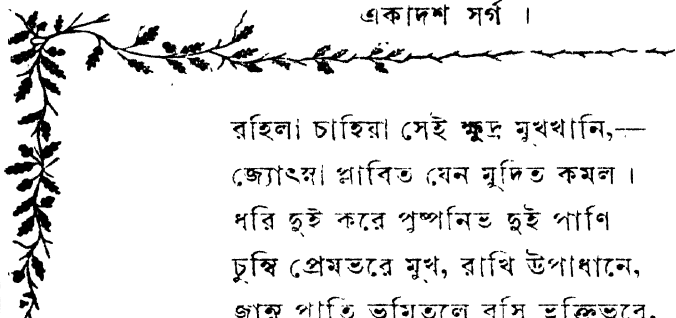
রহিলা চাহিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—
জ্যোৎস্না প্লাবিত যেন মুদিত কমল।
ধরি দুই করে পুষ্পনিভ দুই পাণি
চুম্বি প্রেমভরে মুখ, রাখি উপাধানে,
জানু পাতি ভূমিতলে বসি ভক্তিভরে,
চন্দ্রিকাপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে
চাহিয়া, কহিলা কর-যোড়ে সকাতরে—
"নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি তব মনস্কাম?"
দিও বালিকায় শান্তি, পদাম্বুজে স্থান।
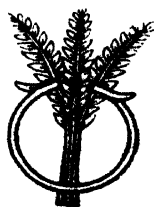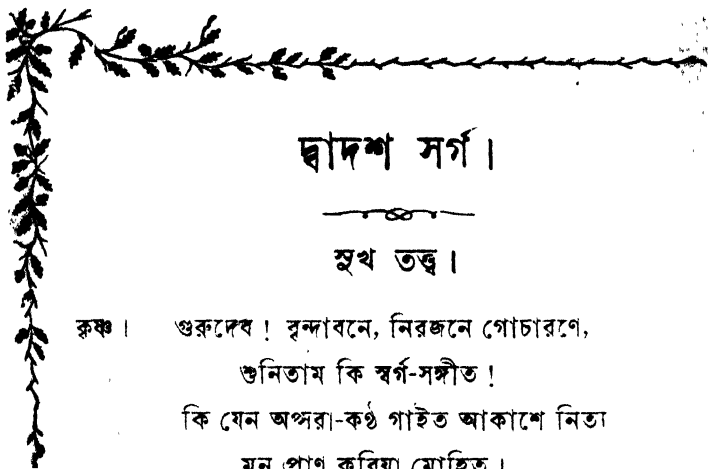
দ্বাদশ সর্গ।

সুখ তত্ত্ব।

কৃষ্ণ। গুরুদেব ! বৃন্দাবনে, নিরজনে গোচারণে,
শুনিতাম কি স্বর্গ-সঙ্গীত !
কি যেন অপ্সরা-কণ্ঠ গাইত আকাশে নিত্য
মন প্রাণ করিয়া মোহিত।
গাইত—"অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার,
পশে না কি শ্রবণে তোমার ?
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, কোথাও না পাই শান্তি
জগতে করিছে হাহাকার !
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে রাজ্যে রাজ্যে,—
কিবা ঘাত, কিবা প্রতিঘাত !
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে সমাজেতে,—
কি স্বার্থের ভীষণ সংঘাত !
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, দুই বিদ্যুতাগ্নি পূর্ণ মেঘ
ছুটেছে কি বেগে খরতর ..
আঘাতিতে পরস্পরে, মত্ত আধিপত্য তরে,—
নিবারিতে বাড়া'বে না কর ?
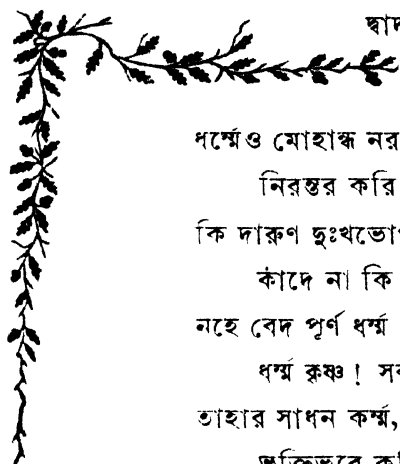
ধর্ম্মেও মোহান্ধ নর কামনার মরীচিকা
নিরন্তর করি অনুসার,
কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরন্তর,—
কাঁদে না কি হৃদয় তোমার ?
নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম ; যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম্ম ;
ধর্ম্ম কৃষ্ণ ! সর্ব্বভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম্ম, নারায়ণে কর্ম্ম-ফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।
উত্তীর্ণ কিশোর তব, হও কর্ম্মে অগ্রসর,
জগত করিছে আবাহন
কাতর করুণ কণ্ঠে ; হও অগ্রসর, কর
জগতের দুঃখ বিমোচন !”
নীরবিলা বাসুদেব ! নীরব শিবির।
নীরবে মহর্ষি ব্যাস বসি অধোমুখে
চিন্তামগ্ন, চিত্রবৎ। নীরব নিশীথ।
নীরবে জ্বলিছে ধীরে সুবাস প্রদীপ।
নীরবে কেশব ধীরে আনত বদনে
ভ্রমিছেন। শোভিতেছে পবিত্র গৈরিক
পরিধানে, অংসোপরে উত্তরীয় মত।
নাহি অস্ত্র-চিহ্নমাত্র কৃষ্ণের শিবিরে।
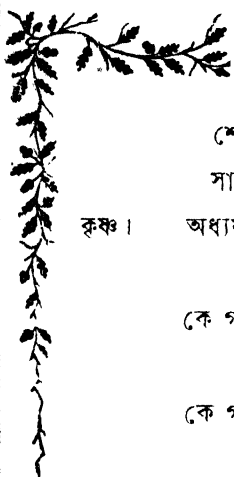
শোভিতেছে এক দিকে বসন ভূষণ
সারথির, অন্য দিকে গ্রন্থ অগণন।

কৃষ্ণ। অধ্যয়ন অস্ত্রশিক্ষা অবসরে এইরূপে
শুনিতাম করুণ সঙ্গীত।
কে গায়, কোথায় গায়, এইরূপে কিশোরের
ক্ষুদ্রপ্রাণ করি আকুলিত?
কে গায়? কেমনে হায়! করিবে রাখালশিশু
জগতের দুঃখ বিমোচন?
কেমনে পতঙ্গ ক্ষুদ্র বেদরূপী হিমাচল
করিবেক করে উত্তোলন?
বেদভারে প্রপীড়িত, যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন,
উষ্ণজীব-শোণিতে প্লাবিত,
প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিবে হায়!
এই মহাধর্ম্ম প্রচারিত!
যে দিন মহর্ষি গর্গ সেই নিয়তির রেখা
আঁকিলেন অদৃষ্ট গগনে,
সে দিন হইতে নিত্য এই নিয়তির গীত
শুনিতাম, ভাবিতাম মনে।

রৈবতকের সপ্তম সর্গ—১৯০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ সর্গ।
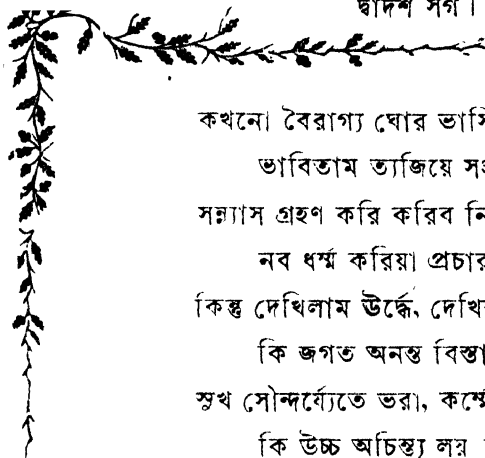
কখনো বৈরাগ্য ঘোর ভাসিয়া উঠিত প্রাণে ;
ভাবিতাম ত্যজিয়ে সংসার
সন্ন্যাস গ্রহণ করি করিব নির্ব্বাণ দুঃখ,
নব ধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
কিন্তু দেখিলাম উর্দ্ধে, দেখিলাম চারি দিকে,
কি জগত অনন্ত বিস্তার !
সুখ সৌন্দর্য্যেতে ভরা, কর্ম্মের সঙ্গীতে পূর্ণ,
কি উচ্চ অচিন্ত্য লয় তার !
গগনেতে গ্রহ তারা, ধরাতলে গিরি, গুল্ম,
তরু তৃণ, নদী, পারাবার,
যেখানে যাহার সৃষ্টি, সেইখানে কর্ম্ম তার,
সেই কর্ম্ম নিয়তি তাহার।
কেবল মানব সৃষ্টি ভ্রম কি হে বিধাতার ?
জন্মক্ষেত্রে নাহি কর্ম্ম তার ?
এ সংসার, এই গৃহ, পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র,
সকলি কি ভ্রম বিধাতার ?
হৃদয়ের উচ্চতম পবিত্র প্রবৃত্তিচয় ,
দৃঢ় করে করিয়া ছেদন,
জন্মভূমি জন্মগৃহ ত্যজিয়া যাইব বনে,
এই তব ইচ্ছা, নারায়ণ ?
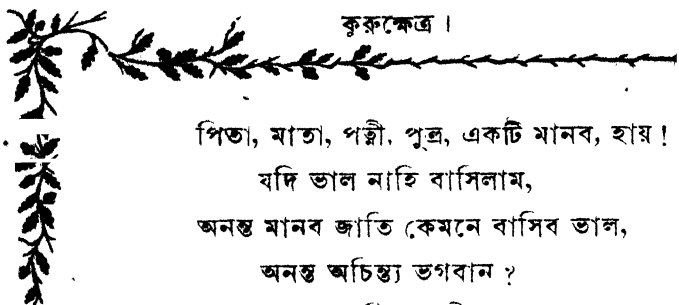
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, একটি মানব, হায়!
যদি ভাল নাহি বাসিলাম,
অনন্ত মানব জাতি কেমনে বাসিব ভাল,
অনন্ত অচিন্ত্য ভগবান?
আপনার জন্মভূমি, জননীর স্নেহ ক্রোড়,
রঙ্গভূমি কৈশোর ক্রীড়ার,
নাহি ভাল বাসি; বিশ্ব কেমনে বাসিব ভাল,
অচিন্ত্য অতীত কল্পনার?
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গর্ভে জনমিয়া ভাগীরথী
পায় তবে সাগর সঙ্গম।
অঙ্কুর হইতে ক্ষুদ্র জনমিয়া মহীরুহ
করে তবে আচ্ছন্ন কানন।
গৃহ ছাড়ি গেলে বনে, মনের কামনা শত
অনায়াসে হয় কি বিলীন?
বিশাল কণ্টক তরু করিলে কি স্থানান্তর
হয় তাহা কণ্টকবিহীন?
সংস্কারের প্রলোভন কামনা করে সৃজন,
করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত।
প্রবেশি নির্জ্জন বনে ইন্দ্রিয় করিলে ধ্বংস,
কামাগ্নি কি হবে নির্ব্বাপিত?

দ্বাদশ সর্গ।
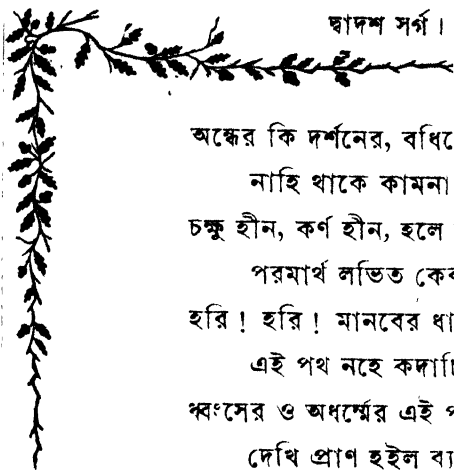
অন্ধের কি দর্শনের, বধিরের শ্রবণের
নাহি থাকে কামনা প্রবল ?
চক্ষু হীন, কর্ণ হীন, হলে কি মানবজাতি
পরমার্থ লভিত কেবল ?
হরি ! হরি ! মানবের ধারণের,—ধরমের,—
এই পথ নহে কদাচিত।
ধ্বংসের ও অধর্ম্মের এই পথ ঘোরতর,—
দেখি প্রাণ হইল ব্যথিত।
ইন্দ্রিয়, কামনা, ধ্বংস করি যদি, মানবের
মানবত্ব কিসে থাকে আর ?
পাদপের পাদপত্ব থাকে কিসে, ফল পুষ্প,
শাখা, পত্র, করিলে সংহার ?
শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয়
সুখের ও শিক্ষার সোপান।
কামনা ইন্দ্রিয় জাত মানবের সুখ পথে
অদ্বিতীয় কর্ম্মের নিদান।
স্রষ্টা কি কামনা-হীন ? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি !
বিশ্ব-সুখ কামনা তাঁহার
ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব, অনন্ত প্লাবিয়া কণ্ঠে,—
এ কামনা অশ্রান্ত অপার !

এ কামনা-সিন্ধু গর্ভে, কামনা-জাহ্নবী নর
শত মুখে করিয়া বিলীন,
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্ম-সুখ
জগতের সুখের অধীন,
উন্মেষিয়া আত্ম-শক্তি, জগতের সুখ পথে
যত নর হবে অগ্রসর,
আপন সুখের তার সিন্ধুমুখী নদ মত
ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—
এক মাত্র ধর্ম্ম সনাতন
মানবের গৃহে, বনে ; ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—
বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ, এই ধর্ম্ম-পথে
কিবা অবলম্বন সুন্দর !
তাহে ভর করি উঠি দেখে সুখ-স্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।
চলিলাম গৃহে, প্রভু ! মানবের ধর্ম্ম-ক্ষেত্র
করি গৃহ অভ্যন্তরে বাস,
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,
বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস।

দ্বাদশ সর্গ
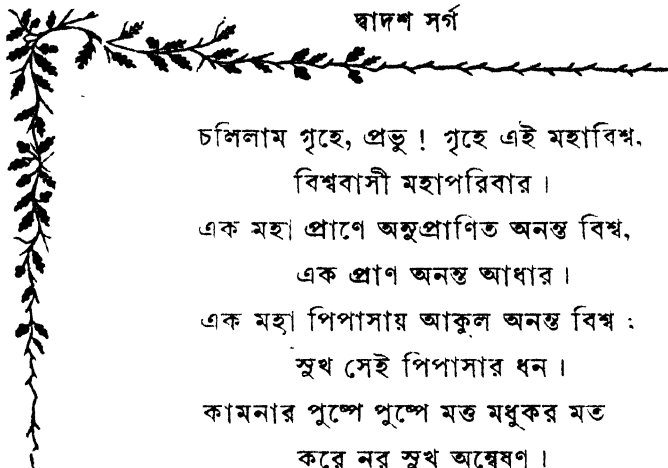
চলিলাম গৃহে, প্রভু! গৃহে এই মহাবিশ্ব,
বিশ্ববাসী মহাপরিবার।
এক মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত অনন্ত বিশ্ব,
এক প্রাণ অনন্ত আধার।
এক মহা পিপাসায় আকুল অনন্ত বিশ্ব :
সুখ সেই পিপাসার ধন।
কামনার পুষ্পে পুষ্পে মত্ত মধুকর মত
করে নর সুখ অন্বেষণ।
জল-সিন্ধু সুখ যাহা, জল-বিন্দু সুখ তাহা,
নাহি সুখ দ্বিতীয় তাহার,—
এই মহা সুখ-তত্ত্ব না জানিয়া, দুঃখপূর্ণ
জগত করিছে হাহাকার।
যে অনন্ত নীতিচক্র মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ, বর্দ্ধন,
তাহাই মানবধর্ম্ম ; তাহার শিক্ষক—শাস্ত্র,
কর্ম্ম ধর্ম্ম-শিক্ষা ও পালন।
এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিন্ধু-মুখে!
সিন্ধু,—চিদানন্দ নারায়ণ।
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানব সুখ,
মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম।

চলিলাম গৃহে প্রভু ! এই মহা সুখ-তত্ত্ব,—
নব ধর্ম্ম,—করিয়া প্রচার,
দেখাইয়া ক্ষুদ্রাদর্শ, ঘোর দুখার্ণব হ'তে
এ জগত করিতে উদ্ধার ।
কিন্তু কি দুরূহ ব্রত ! জানি নাহি কুরুক্ষেত্র
কর্ম্মক্ষেত্র হইবে আমার ।
মানবের মুক্তি পথে এই দাবানল ঘোর !—
নারায়ণ কি লীলা তোমার !

ব্যাস । বাসুদেব ! বজ্রাঘাত, ঝটিকা ভীষণ,
মহাসংহারক মূর্ত্তি ঘোর দাবানল,
প্লাবন ভীষণ, নিত্য করি দরশন
জগতের সাধিছে কি অচিন্ত্য মঙ্গল ।
এই মহা বজ্রাঘাত, ঝটিকা তুমুল,
করিবে ভারাতাকাশ পবিত্র নির্ম্মল ।
কু-বৃক্ষ কণ্টক বন দহিয়া আমূল,
উর্ব্বর সুবৃক্ষ-ক্ষেত্র করিবে অনল ।
এ প্লাবনে প্রসারিয়া পবিত্র পলল,
সঞ্চারিবে নব শক্তি, নব ধর্ম্ম বল ।

কৃষ্ণ । "মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত"—
মহর্ষির মহাবাক্য অব্যর্থ, অমর ।
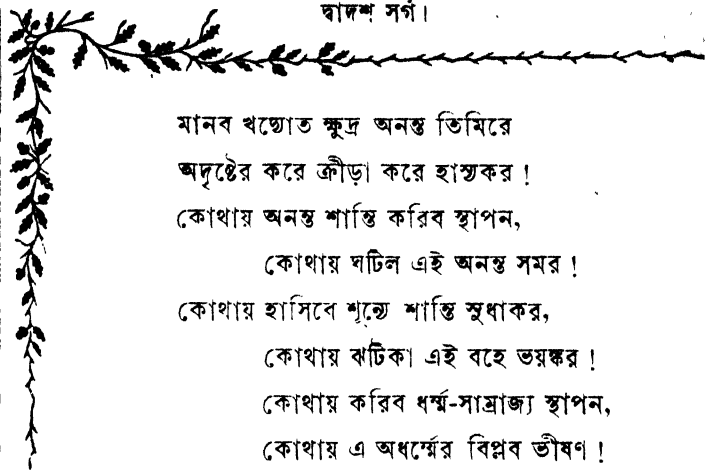
মানব খদ্যোত ক্ষুদ্র অনন্ত তিমিরে
অদৃষ্টের করে ক্রীড়া করে হাস্যকর!
কোথায় অনন্ত শান্তি করিব স্থাপন,
কোথায় ঘটিল এই অনন্ত সমর!
কোথায় হাসিবে শূন্যে শান্তি সুধাকর,
কোথায় ঝটিকা এই বহে ভয়ঙ্কর!
কোথায় করিব ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
কোথায় এ অধর্ম্মের বিপ্লব ভীষণ!
দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার,
কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে!
একাদশ দিন এই হত্যা, হাহাকার,
সহিতেছি হায়! আমি অম্লান বদনে।
আমি যেন অবিদীর্ণ আগ্নেয় ভূধর,—
সৌম্য মূর্ত্তি, বহি হৃদে কি গৈরিক ঝড়!

ব্যাস। অনন্ত মঙ্গলময়, অনন্ত করুণালয়,
অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,
বৎস! যেই নারায়ণ, তাঁহার সৃষ্টিতে নিত্য
কত হত্যা, কত হাহাকার!
তথাপি তাঁহার মুখ, কি প্রসন্ন প্রীতিময়,
কি অনন্ত প্রেমের দর্পণ।

আপনি দেখিছ তুমি ; কে দেখিতে পায় আর
　　এ জগতে তোমার মতন ?
ভবিষ্যৎ কণ্ঠ, প্লাবি বর্ত্তমান হাহাকার,
　　করিতেছ আপনি শ্রবণ ;
দেখিতেছ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পৃষ্ঠদেশে
　　কত অক্ষৌহিণী অগণন।
গলদশ্রু দুনয়ন কহিলেন নারায়ণ—
　　"দেখিতেছি সেই মুখ কৃপায় তোমার।
বসি অর্জ্জুনের রথে কুরুক্ষেত্রে, গুরুদেব !
　　সেই মুখ বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কিছু নাহি শুনি আর বিনা ভবিষ্যত-কণ্ঠ ;
　　অনন্ত নরের সেই গীত করুণার
কহিতেছে—'দয়াময় ! দেখ দুখময় ধরা,
　　ধরার এ দুঃখ-ভার করিয়া মোচন,
　　কর কৃষ্ণ ! আমাদের উদ্ধার সাধন।'
কি করুণ হাহাকার !"—কাঁদিয়া কহিল হরি,
　　কাঁদিলেন নিজে দ্বৈপায়ন,—
"জগতের এই দুঃখ !—বিদরে হৃদয়, নাথ !
　　হইল না, হবে না মোচন।"

ব্যাস। হতেছে,, হইবে; কৃষ্ণ আবির্ভূত; দ্বাপর হতেছে শেষ;
নব অবতার, নব যুগ ধর্ম্ম, করিতেছে পরবেশ!
সাধুদের ত্রাণ, দুষ্কৃত দমন, অধর্ম্ম হতেছে ক্ষয়,
এই কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মের সাম্রাজ্য, হইতেছে সমুদয়।
এই নরমেধ করি সমাপন, সাম্রাজ্য করি স্থাপন,
অর্জ্জুন-সারথ্য ত্যজিয়া জগত সারথ্য কর গ্রহণ।

কৃষ্ণ। হরি! হরি! কে জানিত ভীষ্ম দ্রোণ হায়!
হয়ে ঘোর অধর্ম্মের সারথি এমন,
এইরূপ নরমেধ করি সংঘটন,
মানব-শোণিত-স্রোত ভাসাবে ধরায়!
ভীষ্মের ভীষণ দশ দিবসের রণ,—
মৃত্যুর ভীষণ ক্রীড়া,—করিলে স্মরণ,
হৃদয় বিদরে শোকে; আবার এখন
করিছেন দ্রোণাচার্য্য কি রণ ভীষণ!
রথী ধনঞ্জয়, আমি সারথি তাহার,—
ভেবেছিনু দুই দিনে এই বজ্রানল
নিবিবে, ভস্মিয়া মহা মহীরুহচয়
বিপক্ষের, রক্ষা পাবে তৃণ গুল্মদল।
কিন্তু জানি নাহি হায়! অর্জ্জুন-হৃদয়ে
কি করুণা পারাবার! বাড়বাগ্নি মত
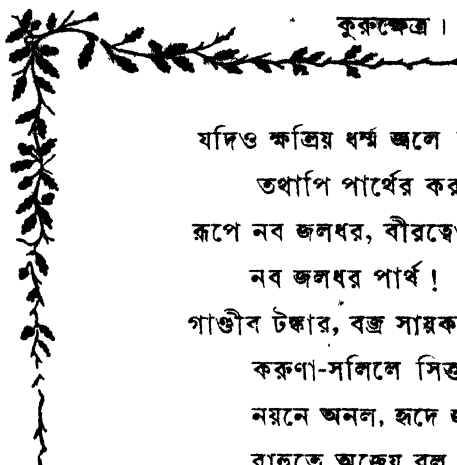
যদিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জ্বলে নিরন্তর,
তথাপি পার্থের কর করুণায় শ্লথ।
রূপে নব জলধর, বীরত্বেও হায়!
নব জলধর পার্থ! জীমূত-গর্জ্জন
গাণ্ডীব টঙ্কার, বজ্র সায়ক নিচয়;
করুণা-সলিলে সিক্ত শর, শরাসন।
নয়নে অনল, হৃদে জল সুশীতল,
বাহুতে অজেয় বল, হৃদয় দুর্ব্বল।
যদি কোনো ঘটনার ভীষণ আঘাত
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ কঠিন,
এইরূপে দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু অভিনয়
বিভীষণ, করিবেক আরো কত দিন!
গুরুভক্ত ধনঞ্জয় করুণ-হৃদয়,
করে গুরুসহ মাত্র রণ-অভিনয়।

ব্যাস। প্রচণ্ড ঝটিকা, কৃষ্ণ! প্রচণ্ড অনল,
হয় আশু নির্ব্বাপিত,—নীতি নিয়ন্তার।
এই মহা যুদ্ধানল,
ভস্মিয়া অধর্ম্ম বল,
নিবিবে অচিরে; নব ধর্ম্ম-সুধাকর
উদিবে শীতল, শান্তি পাবে চরাচর

দ্বাদশ সর্গ।
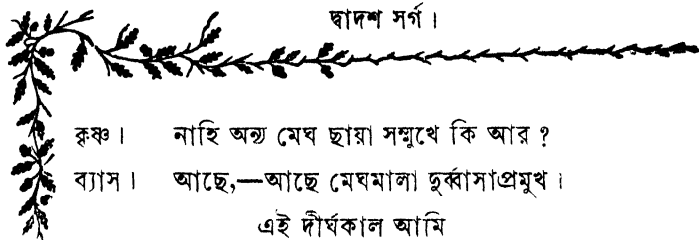
কৃষ্ণ। নাহি অন্য মেঘ ছায়া সম্মুখে কি আর ?

ব্যাস। আছে,—আছে মেঘমালা দুর্ব্বাসাপ্রমুখ।

এই দীর্ঘকাল আমি
বেড়াইয়া স্থানে স্থানে
দেখিয়াছি এই মেঘ হতেছে সঞ্চার
ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে লভিছে বিস্তার।
উড়াইয়া তৃণচয়,
বায়ু কোন দিকে বয়,
চেয়েছি বুঝিতে, আমি বুঝেছি নিশ্চয়
এই শরতের মেঘ রহিবার নয়।
জগতের শীর্ষস্থল
ব্যাপী যেই হিমাচল—
অনন্ত গগনস্পর্শী—উঠিছে ভাসিয়া,
যে পুণ্য উত্তরানিল উঠিছে জাগিয়া,
পবিত্র নিশ্বাসে তার
সুশীতল পুণ্যাসার
তাপিত মানব প্রাণে করি বরিষণ,
ল'বে উড়াইয়া মেঘ, রবে কতক্ষণ ?
নারায়ণ !
অর্জ্জুন তোমার চক্র, শঙ্খ দ্বৈপায়ন।
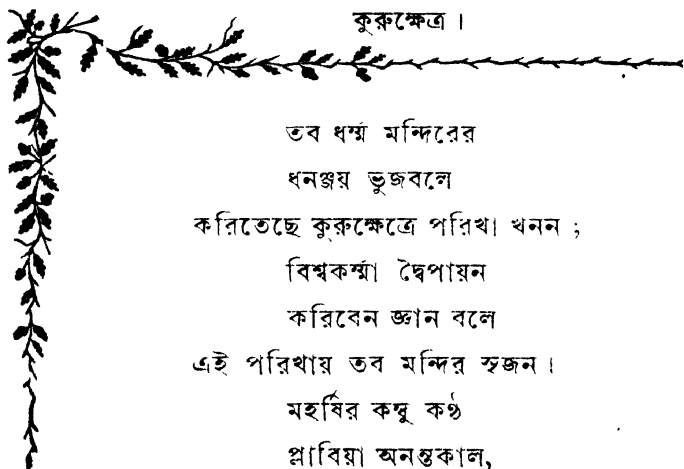
তব ধর্ম্ম মন্দিরের
ধনঞ্জয় ভুজবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন ;
বিশ্বকর্ম্মা দ্বৈপায়ন
করিবেন জ্ঞান বলে
এই পরিখায় তব মন্দির সৃজন।
মহর্ষির কম্বু কণ্ঠ
প্লাবিয়া অনন্তকাল,
অনন্ত মানব যাত্রী করি আবাহন
ত্রিপথে, দেখাবে এই শান্তি নিকেতন।
অর্জ্জুনের কুরুক্ষেত্র
হইতেছে অন্তর্হিত ;
মহর্ষির কর্ম্মক্ষেত্র, অনন্ত বিস্তার,
হইতেছে প্রসারিত ;
দুষ্কৃত দমন ব্রত
অর্জ্জুনের, মহর্ষির সুকৃত উদ্ধার।
তাঁহার গাণ্ডীব,—জ্ঞান ; অস্ত্র,—তত্ত্বরাশি ;
অক্ষয় কবচ,—গীতা, নিত্য অবিনাশী।
সসৈন্যে মহর্ষি এবে
হউন রণে অগ্রসর ;
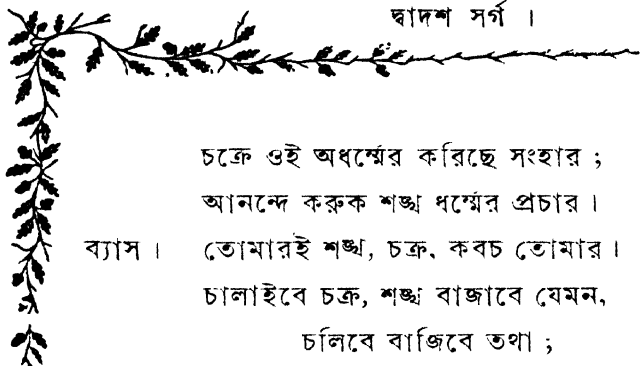
চক্রে ওই অধর্ম্মের করিছে সংহার ;
আনন্দে করুক শঙ্খ ধর্ম্মের প্রচার ।

ব্যাস । তোমারই শঙ্খ, চক্র, কবচ তোমার ।
চালাইবে চক্র, শঙ্খ বাজাবে যেমন,
চলিবে বাজিবে তথা ;
পার্থ, দ্বৈপায়ন,
তব করধৃত অস্ত্র, যুগল ভূষণ ।
শুনিলাম যেই দিন
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছে বারণ,
ভক্তিতে বিহ্বল গোপ গোপাঙ্গনাগণ ;
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণ মন,
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান,
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণ ।
বুঝিলাম সেই দিন
দ্বাপর হতেছে শেষ,
জগতের নবযুগ হতেছে সঞ্চার,
আবির্ভূত বৃন্দাবনে যুগ অবতার ।

সেই দিন হ'তে ব্যাস
তোমার মহিমাধ্যান
করিতেছে নিরন্তর, আত্ম-সমর্পণ
করিয়াছে তব পদে, নর-নারায়ণ !
কেবল তোমার লীলা
করিবারে দরশন,
করেছে প্রভাস-তীরে দ্বিতীয় আশ্রম ।
অদূরে কুটীর ক্ষুদ্র
করিয়াছে নিরমাণ
কুরুক্ষেত্রে তব লীলা করিতে দর্শন ।
একমাত্র কর্ম্ম তার,
না জানে দ্বিতীয় আর,
গাইবে ভকতি ভরে তব ভাগবত ;
গাইবে মহিমাপূর্ণ এ মহাভারত ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সম্মিলন।
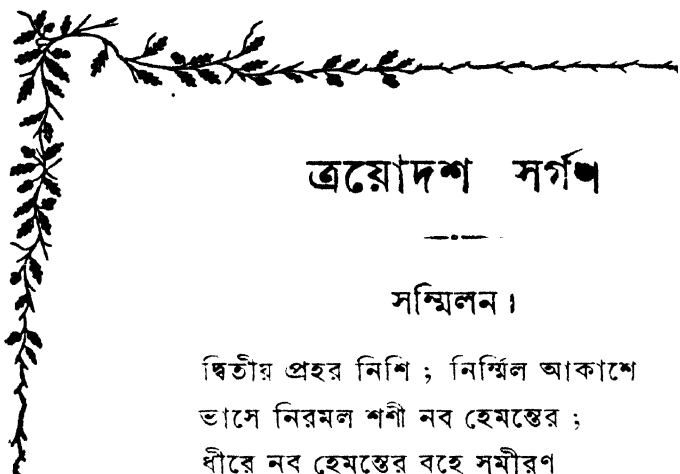
দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নির্ম্মিল আকাশে
ভাসে নিরমল শশী নব হেমন্তের;
ধীরে নব হেমন্তের বহে সমীরণ
সুশীতল; কুরুক্ষেত্র নীরব নিদ্রিত।
"কি শান্তির মহামূর্ত্তি"—চাহি চন্দ্র পানে
কহে দ্বৈপায়ন-শিষ্য ভ্রমি ধীরে ধীরে—
"কি শান্তির মহামূর্ত্তি অনন্ত আকাশ,—
নীরব, নিদ্রিত! নীচে নীরব, নিদ্রিত
কুরুক্ষেত্র কি বিরাট মূর্ত্তি অশান্তির!
বিরাট রাক্ষস-মূর্ত্তি বীরত্ব ভীষণ
ভারতের, দিবসেতে জীমূত নির্ঘোষে
গরজি, অসংখ্য কণ্ঠে, সংখ্যাতীত ভুজে
প্রহারি অসংখ্য বজ্র, অসংখ্য চরণে
বীর দর্পে বসুন্ধরা করিয়া কম্পিত,
যোজন যোজনান্তর বিরাট শরীরে

ব্যাপী আত্মঘাতী এবে নীরব নিদ্রিত,-
ঝটিকান্তে সুপ্ত মহা পারাবার মত!
হায় মা! হায় মা! শিবে! শান্তিস্বরূপিণি!
দিবসে তুমি মা গৌরী, মা গো রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্লভাগে শুভ্রা
জ্যোৎস্না-বরণী মা গো তুমি সরস্বতী—
সর্ব্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর!
তবে কেন তব এই জগতে, জননি!
এতই অশান্তি আহা! এত বজ্র, ঝড়?
সর্ব্বাণি! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
জানি তুমি নিত্যা, আর অনিত্য জগত।
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া? শান্তিতে জন্মিয়া,
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া।
আপনি করুণাময়ী, সহ মা কেমনে
জগতের এত দুঃখ? প্রচণ্ড অনলে
পুড়িছ কেমনে হায়! পতঙ্গের মত
বিপুল ক্ষত্রিয় কুল? পুড়িছ বাসুকি,
অভাগিনী জরৎকারু? পুড়িছ দুর্ব্বাসা?

ঋষিকুলে ধূমকেতু, জ্বলন্ত বিদ্বেষ,
মহাক্রোধ মূর্ত্তিমন্ত, সৃজিলে কেমনে ?
ভীষ্মের শিবির দ্বারে দিলেন বিদায়
মহর্ষি, যাইতেছিনু আশ্রমে অদূরে,
দেখিনু যোগিনী এক কৌরব শিবিরে
যাইতেছে, অলক্ষিতে চলিনু পশ্চাতে,—
কি যে অমঙ্গল ছায়া পড়িল হৃদয়ে !
এ কি দেখিলাম হায় ! এ কি শুনিলাম !
কি স্বর্গ ছায়ায় কিবা নরক ভীষণ !
সুভদ্রার সেই দয়া, ধৈর্য্য গোবিন্দের,
কারুর নিরাশা মরু, ষড়যন্ত্র ঘোর
নিশীথে নিবিড় বনে কর্ণ দুর্ব্বাসার ;—
আকাশ পড়িল ভাঙ্গি মস্তকে আমার।
বাছা ! তুই বারি বিন্দু ত্রিদিব প্রসূত
পড়েছিলি আমি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে !
আমার হৃদয়-মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
ল'তেছে কাড়িয়া হায় ! নির্দ্দয় তস্কর,—
সহিব কেমনে আমি ? হায় ! বাছা মোর !"—
কাঁদিতে লাগিল শোকে উন্মত্ত হৃদয়ে
নীরব, নিদ্রিত, চন্দ্র-প্রদীপ্ত-প্রান্তরে !

"যাব নারায়ণ কাছে।—হায় হিমাদ্রির
পদমূলে পিপীলিকা, সিন্ধু পদতলে
বালুকা, দুঃখের কথা কহিবে কেমনে?
যিনি অন্তর্য্যামী, যাঁর জ্ঞানের নয়নে
জগতে তত্ত্বরাশি মুক্ত, অবারিত,
এই ষড়যন্ত্র হায়! লুকাব কেমনে
তাঁর কাছে দুর্ব্বাসার? হইলে প্রকাশ
নাগরাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাসুকির
ডুবিবে অতল জলে সহ বাসুকির,—
থাকিবে না অনার্য্যের একটি আশ্রয়।
যাইব পার্থের কাছে। যাইব কেমনে?
তাঁর অনুতাপানল উঠিবে জ্বলিয়া
দেখিলে আমারে, করুণ হৃদয়ে
পাইবেন নাথ কিবা ব্যথা নিদারুণ!
যাব কুমারের কাছে।—পারিব কি হায়!
নিবারিতে তারে আমি? তরুণ ভাস্কর
উঠিছে ক্ষত্রিয়াকাশে আলোক পূরিয়া
দশ দিশ, নিবারিতে পারিব কি আমি?
দেখেছি নক্ষত্র মত, মত্ত মৃগয়ায়
ঘোর বিপদের মুখে যাইতে ছুটিয়া

হাসি উচ্চ বাল-হাসি। করিলে বারণ
গলা জড়াইয়া ধরি কহিত হাসিয়া—
'তুই মম বনমাতা ; কি ভয় আমার ?
মৃগয়া আমার ক্রীড়া। দেখ্ দাঁড়াইয়া
এখনি কেমন খেলা আসিব খেলিয়া।
হাস্ মা ! হাস্ মা ! তোর হাসি আদরের
কি সুন্দর ! কাঁদিবি ত দিব গালে চড়।"
স্মৃতিতে ভিজিল চক্ষু। চিন্তি কিছুক্ষণ—
"নিবারিতে নাহি পারি,—আশঙ্কা অজ্ঞাত
ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাহুর ;
করিবেক সিংহ-শিশু বিষাক্ত দুর্ব্বল।
না, না, যাব দয়াময়ী সুভদ্রার কাছে।
মায়ের করুণ প্রাণ হইবে কাতর,
করিবে বারণ, আশা হইবে সফল।
গুরুদেব ! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
পাঠাইলে অপরাহ্লে ভদ্রার শিবিরে ?
আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিনু পালন।
ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কঠিন
লইব ; হৃদয় ! চল যাইব যথায়
নিদ্রিতা পার্থের বক্ষে, ত্রিদিবে আমার,

প্রেমময়ী ভদ্রা দেবী, নিদ্রিতা এখন
স্থিরা হিরণ্বতী বক্ষে জ্যোৎস্না যেমন।
দেখিব একটি শিরা কাঁপে কি তোমার,
পড়ে কি না অণুমাত্র ছায়া কামনার
তোমার তরল বক্ষে। রমণী হৃদয়
তরল সলিল মত ; সলিলের মত
দেখিব হয় কি তাহা নির্ম্মল, নিশ্চল।"
পার্থের শিবির পানে ছুটিল সবেগে
দ্বৈপায়ন শিষ্য!—দ্বার ছাড়িল প্রহরী
সসম্ভ্রমে ; প্রবেশিয়া শিবিরে তখন
অপূর্ব্ব যোগিনী বেশ করিল গ্রহণ।
জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ সুবর্ণ আধারে।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক অঙ্কে সুবর্ণ প্রতিমা
সুষুপ্তা সুভদ্রা দেবী, নীলমণি ময়
বীর-মূর্ত্তি নিরুপম সুপ্ত ধনঞ্জয়।
শোভিতেছে সুভদ্রার অতুল বদন
পতি বক্ষে, নীলাকাশে পূর্ণ শশধর,—
মানস-সরসে যেন একটি কমল।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, মেঘ জ্যোৎস্নায়,
উভয়ে উভয় মুখ চাহিয়া চাহিয়া
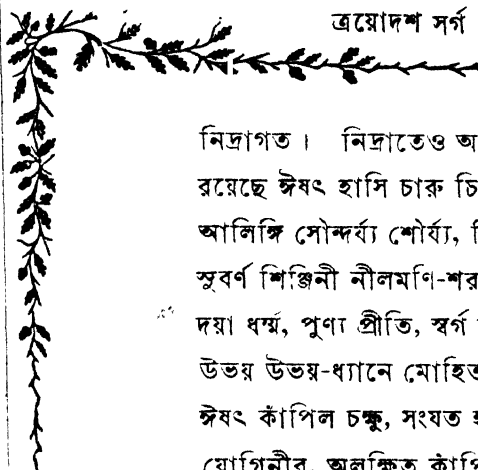
নিদ্রাগত। নিদ্রাতেও অধরে অধরে
রয়েছে ঈষৎ হাসি চারু চিত্রাঙ্কিত।
আলিঙ্গি সৌন্দর্য্য শৌর্য্য, হিমাদ্রি জাহ্নবী,
সুবর্ণ শিঞ্জিনী নীলমণি-শরাসন,
দয়া ধর্ম্ম, পুণ্য প্রীতি, স্বর্গ মন্দাকিনী,
উভয় উভয়-ধ্যানে মোহিত যেমন।
ঈষৎ কাঁপিল চক্ষু, সংযত হৃদয়
যোগিনীর, অলক্ষিত কাঁপিল ভূতল
অনন্ত ভূধর ভারে স্থির অবিচল।
দুই হাতে চাপি বক্ষ, জানু পাতি ভূমে
চাহি ঊর্দ্ধ পানে কহে—"হা হত হৃদয়!
এ কি কম্প কামনার? না, না, প্রাণনাথ!
করিয়াছি চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার
আরাধনা; দেও শান্তি, শান্তি পূর্ণ বুকে
নিরখিব দেবমূর্ত্তি মম তপস্যার।"
উঠিল; মুহূর্ত্ত বামা নয়ন ভরিয়া
দেখিল যুগল রূপ। হৃদয় এখন
ভক্তি ভরে অবিচল; নীলাব্জ বদন
শান্ত, স্থির; আনন্দাশ্রু পূর্ণ দুনয়ন।
মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত পরে কর-নীলোৎপল

অর্পিলেক রক্তোৎপল ভদ্রার চরণে ।
চমকি বসিলা ভদ্রা, রহিলা চাহিয়া
উভয় উভয় পানে। উভয় মোহিতা
উভয়ের দরশনে, চাহি পরস্পরে,—
জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না-মাখা সরসী নীলিমা,
জ্যোৎস্না প্রদীপ্তা স্থিরা জাহ্নবী যমুনা ;
যোগিনী ও যোগারাধ্যা, শান্তি তপস্যায়,
বনদেবী গৃহলক্ষ্মী ; দয়া দরিদ্রতা ।
চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা কল্পনা ।
অধরে যোগিনী করি অঙ্গুলি নিবেশ
করিলে সঙ্কেত,—ভদ্রা দেখিলা সে মুখ
পুণ্যের পবিত্রাকাশ,—জড়াইয়া তারে
আদরে লইয়া বক্ষে চলিলা বাহিরে,
অদূরে জ্যোৎস্নাময়ী হিরণ্বতী তীরে ।
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ভদ্রার হৃদয়
করুণার সিন্ধু ; দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে
লইয়া তাহারে ভদ্রা কাঁদিল নীরবে ।
কাঁদিল নীরবে সেই স্বর্গে তপস্বিনী
লুকাইয়া মুখ । অশ্রু কত রূপান্তর !—
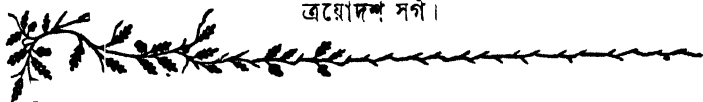
শোকাশ্রু ভদ্রার, সুখ-অশ্রু যোগিনীর।
ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখখানি
রাখে বুকে চিরদিন। চাহে তপস্বিনী
চিরি বুক সেই বুকে, স্নেহের ত্রিদিবে,
পড়ে ঘুমাইয়া সুখে চিরদিন তরে।
স্নেহ-তরলিত কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে
কহিলা উচ্ছ্বাসে ভদ্রা—"শৈলজে! ভগিনি!
চির অভাগিনি!"—কথা সরিল না আর।
কিছুক্ষণ পরে শৈল করিল উত্তর,
বক্ষে লুকাইয়া মুখ,—"সে কি কথা দেবি!
ভদ্রার ভগিনী, স্নেহভাগিনী পার্থের
অভাগিনী যদি, তবে সুভাগিনী আর
কে আছে জগতে, দিদি! শৈলজা তোমার
বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধ অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

অপরাজিতার সেই ক্ষুদ্র মুখ খানি
তুলিলেন ভদ্রা স্নেহে; চন্দ্র করতলে
দেখিলেন আনন্দাশ্রু যুগল নয়নে,
ঈষৎ আনন্দ হাসি ভাসিছে অধরে।
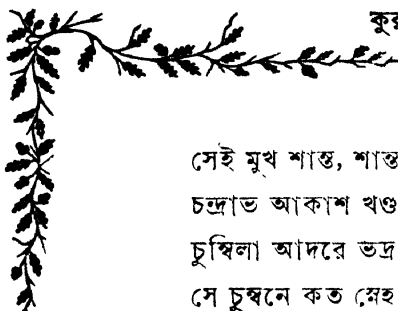
সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
চন্দ্রাভ আকাশ খণ্ড হৃদয়ে তাঁহার।
চুম্বিলা আদরে ভদ্রা সেই মুখখানি!
সে চুম্বনে কত স্নেহ! কি সুধা শীতল
বহিল দুইটী প্রাণে! সুতৃপ্ত নয়নে
উভয় উভয় পানে রহিলা চাহিয়া।
"শৈল! শৈল!"—বলি ভদ্রা স্মৃতির উচ্ছ্বাসে
আত্ম-হারা চুম্বিলেন আবার আবার
সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—শৈলের কি স্বর্গ!
কহিলেন—"বল্ দিদি! থাকিবি এরূপে,—
থাকিবি আমার বুকে;—ছাড়ি আমাদেরে
আর যাইবি না;—আমি দিব না যাইতে।"
চন্দ্রকর আস্তরণ বকুল তলায়
প্রসারিত, দুই জন বসিয়া তথায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে। বাম অংসোপরে
সুভদ্রার অধোমুখ আছে শৈলজার।
চাহি শূন্য পানে ভদ্রা কহিতে লাগিলা—
"চতুর্দ্দশ বর্ষ আজি, প্রতিমা রে তোর
পূজিয়াছি নিরন্তর হৃদয়ে দুজনে।
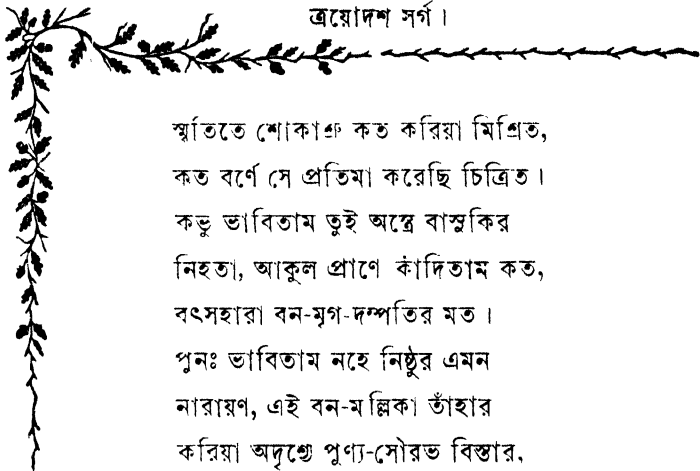
স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত,
কত বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত।
কভু ভাবিতাম তুই অস্ত্রে বাসুকির
নিহতা, আকুল প্রাণে কাঁদিতাম কত,
বৎসহারা বন-মৃগ-দম্পতির মত।
পুনঃ ভাবিতাম নহে নিষ্ঠুর এমন
নারায়ণ, এই বন-মল্লিকা তাঁহার
করিয়া অদৃশ্যে পুণ্য-সৌরভ বিস্তার,
তাপিত মানব প্রাণ করিছে শীতল ;—
এ জীবনে এক দিন পাব দরশন।
স্মৃতির আলেখ্য শৈল ধরিয়া নয়নে,
আঁকি দুই জনে তব চারু চিত্রপট,
রাখিয়াছি শয্যাগৃহে। আঁকিতে সে ছবি
কত অশ্রু দুই জন করেছি বর্ষণ।
সেই চিত্রে, এই চিত্রে কতই অন্তর !
সে নীলাব্জ কলি আজি ফুটন্ত নলিনী ;
সে পঞ্চমী আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী !
এই পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, সরলতা,
কে পারে চিত্রিতে,—এই প্রাণ-কোমলতা ?
এ কোমল প্রাণে, এই কোমল শরীরে,
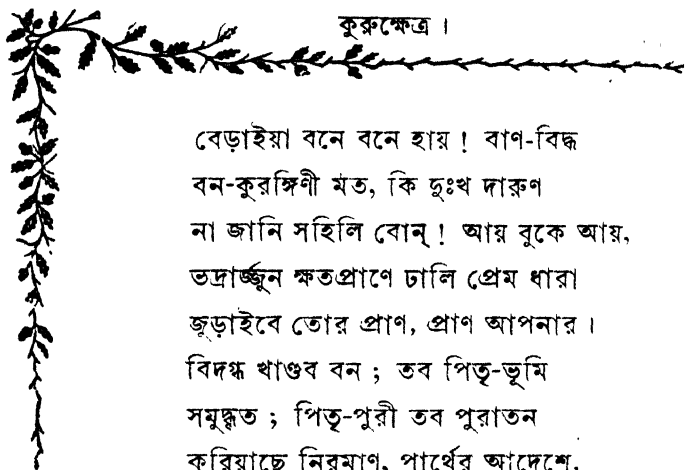
বেড়াইয়া বনে বনে হায়! বাণ-বিদ্ধ
বন-কুরঙ্গিণী মত, কি দুঃখ দারুণ
না জানি সহিলি বোন্! আয় বুকে আয়,
ভদ্রার্জ্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেম ধারা
জুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন; তব পিতৃ-ভূমি
সমুদ্ধৃত; পিতৃ-পুরী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমাণ, পার্থের আদেশে,
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পি-চূড়ামণি।
তব মরকত মূর্ত্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পুরীতে; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ তুষানল কর নির্ব্বাপিত
অর্জ্জুনের সুভদ্রার। এই যুদ্ধ শেষে
কিম্বা চল চল ইন্দ্রপ্রস্থে, প্রেমময়
অর্জ্জুনের বুকে, এই বুকে সুভদ্রার।"
আবার আঁটিয়া ভদ্রা লইলেন দৃঢ়
বুকে নাগ-নন্দিনীরে; কাঁদিলা আবার
দুই জন;—ভদ্রা শোকে, সুখে নাগবালা।
কিছুক্ষণ সেই স্বর্গে রহিয়া নীরব
উত্তরিল শৈল ধীরে—"দিদি! তোমাদের
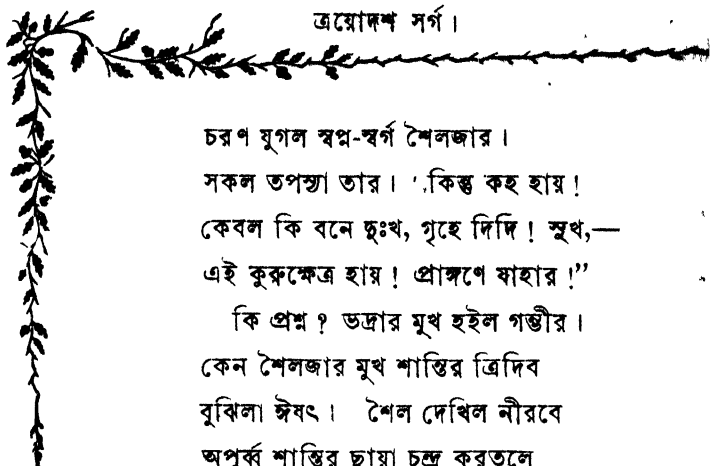
চরণ যুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার।
সকল তপস্যা তার।' কিন্তু কহ হায়!
কেবল কি বনে দুঃখ, গৃহে দিদি! সুখ,—
এই কুরুক্ষেত্রে হায়! প্রাঙ্গণে যাহার!"
কি প্রশ্ন? ভদ্রার মুখ হইল গম্ভীর।
কেন শৈলজার মুখ শান্তির ত্রিদিব
বুঝিলা ঈষৎ। শৈল দেখিল নীরবে
অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া চন্দ্র করতলে
ছাইল ভদ্রার মুখ। বিস্তৃত নয়ন
অলৌকিক প্রতিভায় হইল উজ্জ্বল,
ভাসিল জ্যোৎস্না যেন নীল সরোবরে।

ভদ্রা। শৈলজে! সুখের তরে আকুল জগত।
সুখ-অন্বেষণ,—স্থিতি, গতি, জগতের।
এ জগত সুখময়, নিত্য-সুখময়
নিজ বিধাতার মত। অজস্র ধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিকায়,
গরজে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষে বরিষায়,
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরু দলে,
ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে।

সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্ব্বময়।
কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
করিতেছে হাহাকার! মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে; বুঝে নাই হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়।

শৈ। বল দেবি! কিসে তবে সুখ মানুষের?

সু। জগত অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
এক তানে,—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে, সুখ পুষ্পত্বে পুষ্পের;
মনুষ্যত্বে তবে বোন! সুখ মানুষের।

শৈ। কারে বল মনুষ্যত্ব?

সু। চরিতার্থতায়
বিহঙ্গ-বৃত্তির বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের।
মানুষ কি নিয়া বল মানুষ, ভগিনি?—
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব! যেই নীতি চয়
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,
—মানবের মানবত্ব,—করিছে ধারণ,
তাহাই মানবধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,
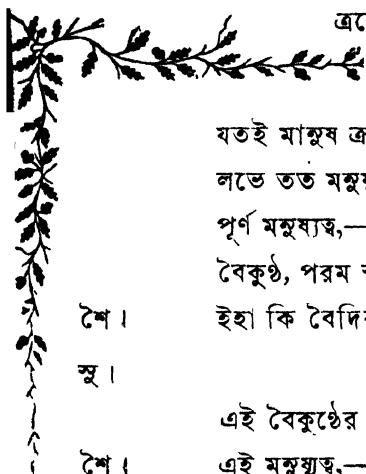
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল।
পূর্ণ মনুষ্যত্ব,—দুঃখ-মুক্তি, নিরবাণ,
বৈকুণ্ঠ, পরম সুখ, স্বর্গ, ভগবান!

শৈ। ইহা কি বৈদিক ধর্ম্ম?

সু। বেদ-ধর্ম্ম, শৈল!
এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান।

শৈ। এই মনুষ্যত্ব,—এই স্বধর্ম্ম,—সাধন
হয় না কি বনে দেবি!

সু। ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর
এ ধর্ম্মের গৃহ, দিদি! এ মহা ধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত।

শৈ। চল তবে বনে দিদি! হায়! ধরাতলে
এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর
সাধিবারে লোকহিত! এ ভারত ভূমি
যাহাদের পিতৃ-ভূমি, সে অনার্য্য জাতি
আজি কোথা, দেখ আহা! কি দশা তাদের!
রাজ্যহীন, গৃহহীন, আহার-বিহীন,
আজি তারা বনে, আজি পশু নির্ব্বিশেষ।

সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, সুখে আজি আর্য্যগণ
দেবোপম, হায়! দেবি! আছে তাহাদের
কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
সাধিতে অজস্র হিত; আছে তাহাদের
পার্থ ভুজাশ্রয়, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়,
সুখদাতা পরিত্রাতা নর-নারায়ণ।
হইয়াছে সূর্য্যোদয় আবির্ভাবে তাঁর
আর্য্যের অদৃষ্টাকাশে, পূর্ব্বাহ্ন প্রভায়
সমুজ্জ্বল আর্য্যভূমি; অমাবস্যা ঘোর
অনার্য্যের হায়! দিদি! রবে কি এমন?
পতিতপাবন হরি,—এ পতিত জাতি
পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার?
কি কাতর কণ্ঠ! কিবা কাতরতা মুখে!
বহিছে কি কাতরতা যুগল ধারায়
দুনয়নে! তুলি মুখ, জিজ্ঞাসিল শৈল—
"পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার?'
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভদ্রা রহিল চাহিয়া
সে কাতর মুখ পানে। কি যেন কি মেঘ
নয়ন হইতে গেল নিমিষে সরিয়া,
নিমিষে কি যেন স্বর্গ খুলিল নয়নে।
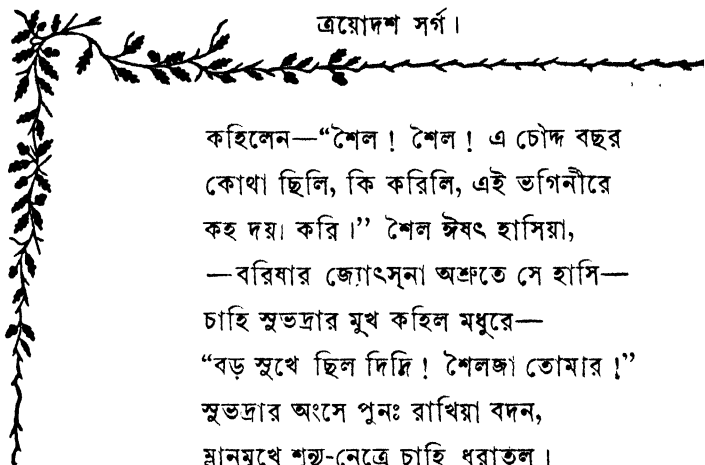
কহিলেন—"শৈল! শৈল! এ চৌদ্দ বছর
কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীরে
কহ দয়া করি।" শৈল ঈষৎ হাসিয়া,
—বরিষার জ্যোৎস্না অশ্রুতে সে হাসি—
চাহি সুভদ্রার মুখ কহিল মধুরে—
"বড় সুখে ছিল দিদি! শৈলজা তোমার!"
সুভদ্রার অংসে পুনঃ রাখিয়া বদন,
ম্লানমুখে শূন্য-নেত্রে চাহি ধরাতল।

শৈ। শুনিয়াছ কি নরক লইয়া হৃদয়ে
এসেছিল রৈবতকে! কি স্বর্গ লইয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে হইনু বিদায়!
পশিনু নিবিড় বনে, ছায়ার মতন
চলিলাম; কোন্ পথে, যেতেছি কোথায়,
কেন যাই,—নাহি জানি। উপরে আকাশ
শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময়; মরুময়
নিম্নে ধরাতল; হুহু রবে সমীরণ
যাইছে বহিয়া। এই মহা মরুভূমে
একাকিনী অনাথিনী চলিয়াছি আমি,—
আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারি দিকে,
হুহু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।

ক্লান্ত অবসন্ন বুকে পড়িয়া ভূতলে
পড়িনু বিস্মৃতি অঙ্কে,—নিদ্রা কি মূর্চ্ছায়
নাহি জানি। ক্রমে ক্রমে উঠিল ভাসিয়া
জগত আনন্দময়, শ্যাম শোভাময়।

ফুটিল কুসুম, ছুটিল সৌরভ,
গাইল বিহঙ্গ সুখে,
মৃদুল কিরণে হাসিল ভাস্কর,
কি হাসি মানব মুখে।

দেখিলাম পার্থ বসিয়া শিয়রে
রাখি অঙ্কে মুখ মম;
পিতৃ-স্নেহ পূর্ণ কি দুটী নয়ন—
পবিত্রতা প্রস্রবণ!

কহিছেন—"তোর পিতার শ্মশানে,
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
দুহিতার মত পালিবরে তোরে,
জানেন অন্তরযামী।

অন্তর অন্তরে সৃজিয়া প্রতিমা,
পুষেছি তোরে সদায়
দুহিতার মত,— এই মহা পাপ
কেমনে করিব হায়!
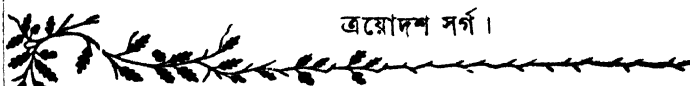
দেখ পিতৃ-প্রেম অনন্ত বিস্তার
কি পবিত্র সুশীতল,
পতি-প্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত,—
পূরিত কামনানল !"
ঈর্ষার নরক নিবিল, হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল।
মেলিনু নয়ন,—বেলা অবসান,
শান্তি পূর্ণ ধরাতল !
মস্তক উপরে আনন্দ কাকলি
গাহিছে বিহঙ্গগণ ;
বসি চারি দিকে, কুরঙ্গ শশক
চাহিয়া সস্নেহ মন।
আশৈশব আমি ছায়ার মতন
ভ্রমিয়াছি বনে বনে।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী, শশক শশকী
ভগ্নী যেন ভাবে মনে।
কুরঙ্গশাবক যাইছে ছুটিয়া
ঘ্রাণিয়া মুখ কখন,
খেলিতেছে সুখে, নাচিতেছে শিখী
আনন্দে ধরি পেখম !

সেই বন-শান্তি, সেই বন-স্নেহ,
স্বপ্ন-স্মৃতি স্নেহময়ী,
কি নব জীবন পাইলাম, যেন
আমি সেই শৈল নই।

বসিয়া আকাশ চাহি ভাবিতে লাগিনু,
কি করিব, কোথা যাব ? শৈশবে জনক
কহিতেন মার কাছে—"ধর্ম্মে প্রিয়ে ! সুখ ;
ইন্দ্রিয় সংযম, সেই ধর্ম্মের সোপান।
নাহি চাহি রাজ্যধন। শৈলজা আমার
হইবে ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যের, বিলাইয়া হরিনাম-সুধা
বাঁচাবে অনার্য্য জাতি। ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোন মতে অনার্য্য উদ্ধার।"
কি করিব ? কোথা যাব ?—পাইনু উত্তর।
আকাশে কর্ত্তব্য-রেখা দেখিনু অঙ্কিত।
জনক জননী মূর্ত্তি দেখিলাম আর
বিরাজিত সন্ধ্যাকাশে। অনাথিনী আমি,—
আশৈশব নিরজন বড় প্রিয় মম ;
বড় প্রিয় বনভূমি। বসি নিরজনে
দেখিতাম ঊর্দ্ধে নীল মণিময় পটে
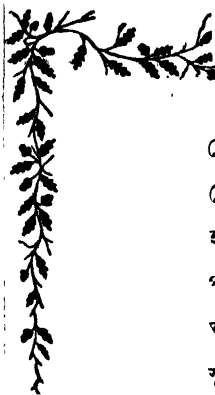
স্নেহময়ী মা আমার, পিতা স্নেহময়—
স্নেহের ত্রিদিবে, স্নেহ-দেবতা যুগল।
হায়! রৈবতকে দেবি! আসিনু যে দিন
পাপব্রতে, পুণ্য ছবি দেখি নাই আর।
আজি প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া আবার
সুপ্রসন্ন, কি আনন্দে ভরিল হৃদয়!
যুগল শীতল ধারা বহিল নয়নে।
বুঝিলাম দেব দেবী প্রীত মম ব্রতে।
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, ডাকি ভক্তিভরে,
কহিলাম—"দেব! দেবি! দিয়া পদাশ্রয়
কন্যার কঠিন ব্রত করিও পূরণ।"
কোথা ছিনু? বিন্ধ্যাচলে। কি করিনু দেবি?
পার্থের প্রতিমা সৃজি, এ চৌদ্দ বছর
পূজিয়াছি ভক্তিভরে; এ চৌদ্দ বছর
শৈল ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী, পার্থ প্রভাকর।
এ চৌদ্দ বছর ক্রমে পূজিতে পূজিতে,
সেই পতিভাব দেবি! হইল বিলীন
কি অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে,
সিন্ধুমুখী গঙ্গামত! এই চরাচর
হইল অর্জ্জুনময়, হইনু তন্ময়।
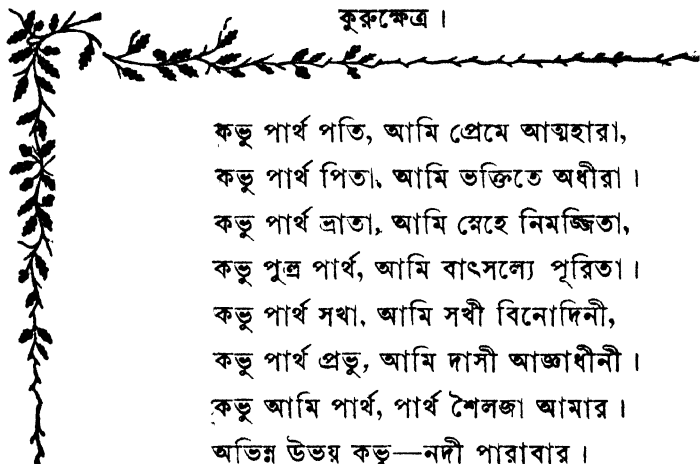
কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধীনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার।
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।

সু। কি সুন্দর উপাসনা! কি প্রেম গভীর!
উপাসক, উপাসিত, কি ধন্য উভয়!
এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান।
এই প্রেমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান।
আসক্তির করালতা; ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে, সেই উপাস্য আমার।

শৈ। নহে বহু দিন গত, দিদি, এক দিন
আসিলেন দ্বৈপায়ন দাসীর কুটীরে,—
বন অন্তরালে যেন দেব অংশুমালী।
ফলিল তপস্যা মম। অন্তর্য্যামী প্রভু
চিনিলেন এ দাসীরে, কহিলেন—"শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থ-পূজা, পূজ তুমি এবে
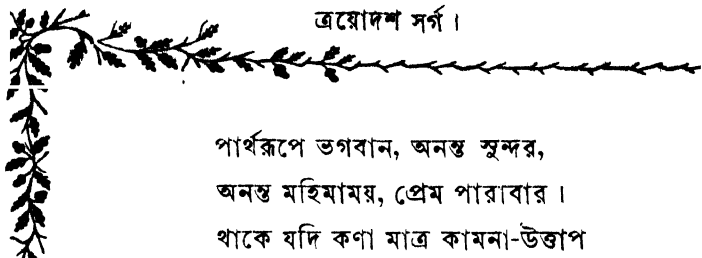
পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার।
থাকে যদি কণা মাত্র কামনা-উত্তাপ
হৃদয়ে নিবিবে ; শান্তি পাইবে পরম।"
কহিলাম,—"চিন্তাতীত সেই ভগবান,
বুঝিবে, পূজিবে, এই অবলা কেমনে
জ্ঞানহীনা ?"
"বুঝ, পূজ, ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ, যুগ-অবতার।
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়,
এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয়।
কিন্তু বৎসে! তব এই যোগিনীর বেশ,
একি রৈবতকের সে ভৃত্য বেশ তব ?"
"না, না, প্রভু!—কহিলাম পড়িয়া চরণে—
"এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর।
অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞান সিন্ধু তব,
পাইবে না অনার্য্য কি বিন্দুমাত্র তার ?
নারায়ণ! এই নব জলধর-ধারা
পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল ?
পাইবে না মরুভূমি ? দেহ এ দাসীরে
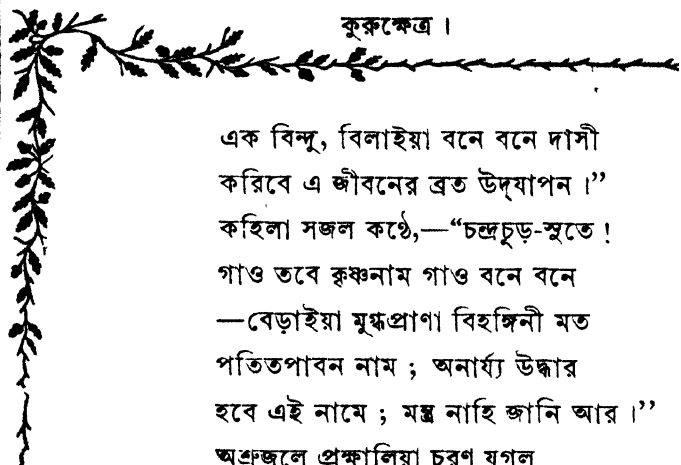
এক বিন্দু, বিলাইয়া বনে বনে দাসী
করিবে এ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন।”
কহিলা সজল কণ্ঠে,—“চন্দ্রচূড়-সুতে!
গাও তবে কৃষ্ণনাম গাও বনে বনে
—বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত
পতিতপাবন নাম; অনার্য্য উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।”
অশ্রুজলে প্রক্ষালিয়া চরণ যুগল
কহিলাম,—“কর মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যায়;
পদ কল্পতরুমূলে বন লতিকায়
দেও স্থান; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।”
বহিল কি আনন্দাশ্রু মন্দাকিনীধারা
প্রভুর নয়নে—দুই চক্ষু জগতের!
আদরে লইয়া বক্ষে চুম্বিয়া ললাট
কহিলেন,—“মা আমার! নিরুপমা এই
জ্বলন্ত পাবক শিখা পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।”
“অর্জ্জুনের ভৃত্য”—আমি কহিনু সলাজে—
“হবে তব শিষ্য-পুত্র, সেবক তোমার।”
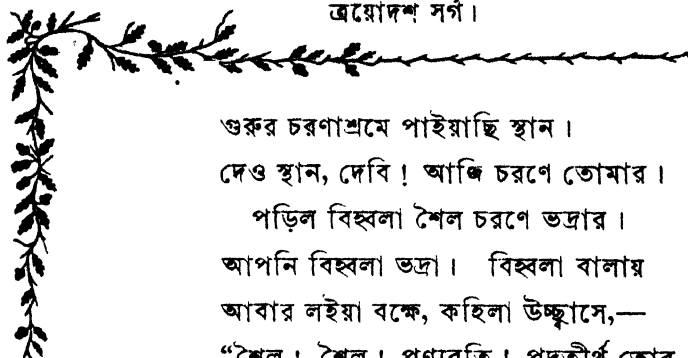
গুরুর চরণাশ্রমে পাইয়াছি স্থান।
দেও স্থান, দেবি! আজি চরণে তোমার।
পড়িল বিহ্বলা শৈল চরণে ভদ্রার।
আপনি বিহ্বলা ভদ্রা। বিহ্বলা বালায়
আবার লইয়া বক্ষে, কহিলা উচ্ছ্বাসে,—
"শৈল! শৈল! পুণ্যবতি! পদতীর্থ তোর
সুভদ্রার যোগ্য স্থান। ধন্য নারায়ণ!
দুর্জ্ঞেয় তোমার লীলা, কি বুঝিবে নর!
গৃহমুখী পতি-প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা
রুদ্ধ করি এইরূপে পিতৃ-স্নেহ শৈলে,
বহাইলে বনভূমি করিতে উদ্ধার
এই মতে, এই পথে! আয় দিদি! আয়!
দুইজনে গৃহে বনে গাব কৃষ্ণনাম।
এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য্য আর্য্য। গাইবে জগত
কৃষ্ণনাম; কৃষ্ণ প্রেমে ভাসিবে ধরণী।
কুরুক্ষেত্র ঐরাবত ভাসাইয়া বেগে
ছুটিতেছে প্রেম গঙ্গা পতিতপাবনী,
আর্য্যভূমি, বনভূমি, করিতে উদ্ধার।"
সুভদ্রার বক্ষে শৈল রাখিয়া মস্তক—
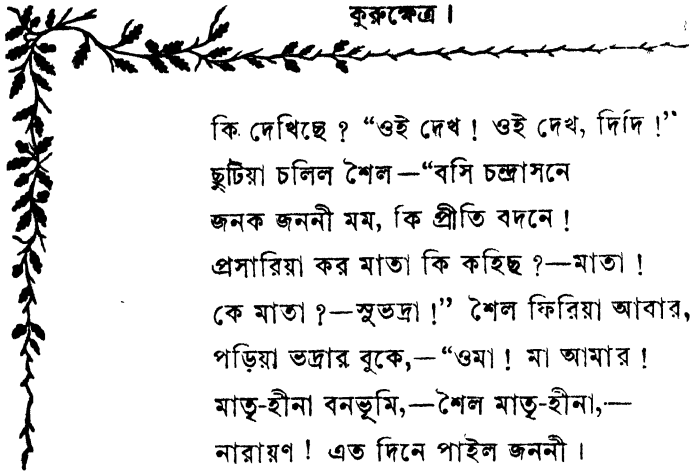
কি দেখিছে ? "ওই দেখ ! ওই দেখ, দিদি !"
ছুটিয়া চলিল শৈল—"বসি চন্দ্রাসনে
জনক জননী মম, কি প্রীতি বদনে !
প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ ?—মাতা !
কে মাতা ?—সুভদ্রা !" শৈল ফিরিয়া আবার,
পড়িয়া ভদ্রার বুকে,—"ওমা ! মা আমার !
মাতৃ-হীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃ-হীনা,—
নারায়ণ ! এত দিনে পাইল জননী।
পতিতপাবনী মাত ! পতিতা কন্যায়
রাখিস্ চরণে তোর !" হইল মূর্চ্ছিতা।
নীরব রজনী। চন্দ্র হাসিছে আকাশে
নীরবে, নিরখি কিবা স্বর্গ ধরাতলে !
মূর্চ্ছিতা শৈলের মুখ অঙ্কে সুভদ্রার,
চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল সিক্ত নিলাম্বুজ,
সস্মিত, সুস্নিগ্ধ, শান্ত ; চাহি চন্দ্রপানে
আত্মহারা ভদ্রা দেবী। কিবা দরশন
চন্দ্রে চন্দ্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে কিবা সম্ভাষণ
প্রীতিময়, ভাবময় ! বহিছে কপোলে
যুগল আনন্দ ধারা দর দর দর,—
কি পবিত্রা ধারা ! কিবা পুণ্য নিরঝর !

ত্রয়োদশ সর্গ।

তৃতীয় প্রহর নিশি, নব হেমন্তের
সুশীতল সমীরণ বহিতেছে ধীরে।
ভাঙ্গিল শৈলের মূর্চ্ছা। বসিয়া রমণী
ভদ্রার উরসে মুখ রাখিয়া আবার
কহিল,—"রজনী, দেবি! অবসান প্রায়।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মতন
ভাসিতেছে সুখতারা অনন্ত আকাশে,—
মানবেরো দুঃখ নিশি হতেছে প্রভাত।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাম্বুজে,—কর এ প্রতিজ্ঞা
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে;
রাখিবে বাঁধিয়া, মত্ত করি-সুত মত,
সুদৃঢ় স্বর্গীয় মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে।"

সু। কেন, শৈল?

শৈ। শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের, এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জ্জয় গাণ্ডীব বল।

সু। অন্ধের সন্তান
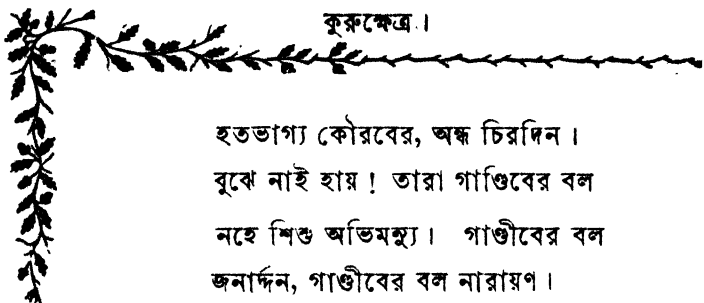
হতভাগ্য কৌরবের, অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাই হায়! তারা গাণ্ডিবের বল
নহে শিশু অভিমন্যু। গাণ্ডীবের বল
জনার্দ্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন,
জান শৈল। ধর্ম্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈ। ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,—
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

সু। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কেশরী-শিশুর।
ষোড়শ বর্ষীয় সেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি! ষোড়শ বর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী। ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্ব্বাণ অঙ্গের ভূষণ।
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ!
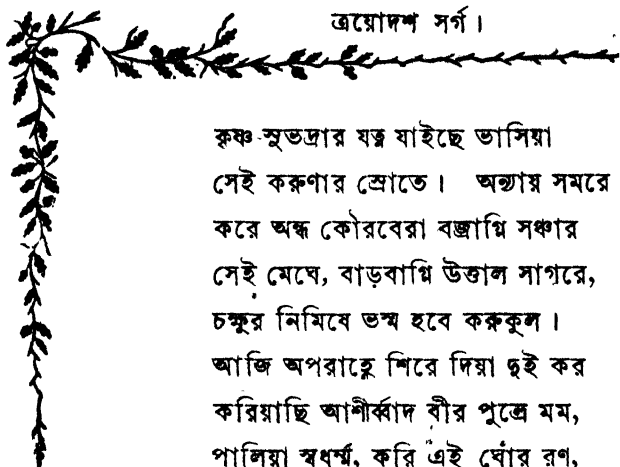
কৃষ্ণ-সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে
করে অন্ধ কৌরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে,
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হবে কুরুকুল।
আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই কর
করিয়াছি আশীর্ব্বাদ বীর পুত্রে মম,
পালিয়া স্বধর্ম্ম, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম্ম রাজ্য করিতে স্থাপন।
"নর-হরি! নারায়ণ! বিপদভঞ্জন!
রক্ষিও বাছায় তবে!"—সরিল না আর
রুদ্ধ কণ্ঠ শৈলজার,—"বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বন-মাতার তাহার,
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ; হইবে উদয়
অরুণ উষার সহ আশ্রমে আমার,—
আঁধার হৃদয়ে মম। অনাথিনী-নাথ!
এই চির অনাথিনী চাহে নাহি আর,
—চাহিবে না,—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটা বাসনা কর পূরণ তাহার!"
নীরবিল শৈল। অশ্রু বহিল নীরবে
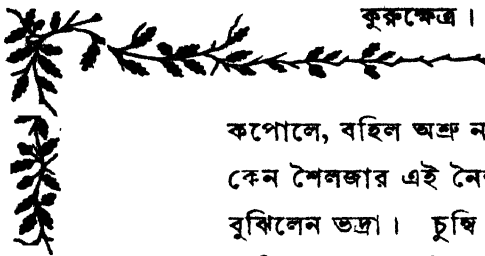
কপোলে, বহিল অশ্রু নয়নে ভদ্রার ।
কেন শৈলজার এই নৈশ অভিযান
বুঝিলেন ভদ্রা । চুম্বি বদন তাহার
কহিলেন,—"অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
বরষিতে স্নেহ সুধা, জনম কি তোর
অভাগিনি ! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বুকে !"

শৈ । একটী হিল্লোলে আমি আকুল যাহার,
বহিছে সে স্নেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার
শান্তিময়ী, সুধাময়ী ! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন ! বুঝিলাম, হায়,
এত দিনে কি কঠিন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ।
বুঝিলাম এত দিনে লক্ষ্মী অনার্য্যের
কেন আর্য্য-পদানতা । বুঝিলাম আর,
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার ।

সু । বড়ই কঠিন ধর্ম্ম, শৈল ! ক্ষত্রিয়ের ।
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নয় ।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশ্বেশ্বর ।
সেই বসুন্ধরা আজি কি পাপ আধার !
মানব সমাজ আজি দুঃখ পারাবার ।
দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,—
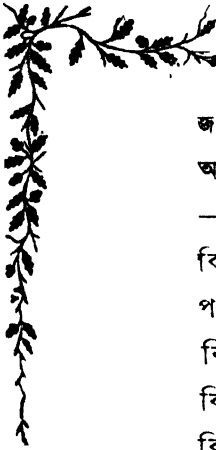
জগত আনন্দ রাজ্য, সুখ প্রস্রবণ ।
অনন্ত চাহিয়া দেখ গ্রহ উপগ্রহ
—অসংখ্য, বিরাট মূর্ত্তি !—ভ্রমে অহরহ
কি ভীষণ বেগে,—গতি নর-চিন্তাতীত !—
পরস্পরে পরস্পর করি আকর্ষিত
কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে,
কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে !
কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস !
কি সুখ সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ !
কেবল মানব পথ-ভ্রষ্ট নিয়তির ।
তাই মানবের হায় ! এ দুঃখ গভীর !
মানবের সুখ পথে অধর্ম্মে সৃজন
করিয়াছে মহাবন, করিতে দাহন
সে খাণ্ডব, জ্বলিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ,—
শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ !
সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক,
করি ধরাতলে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন ;—
তবে শৈল ভাগ্যবতী ! পুণ্যবতী আর
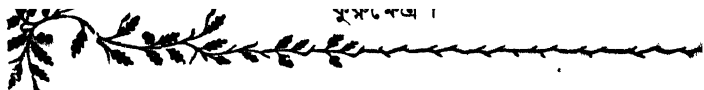
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার ?
বহিছে যুগল ধারা জগত-মাতার
যুগল কপোলে মাতৃ-প্রেম-বিগলিত
সন্তাপ-হারিণী। শৈল কহিল উচ্ছ্বাসে,—
"পিতৃগণ ! দেবগণ ! কে আছ কোথায়,
দেখ পুণ্যবতীর এ আত্ম-বিসর্জ্জন
মানব উদ্ধার ব্রতে ! এ পুণ্যে মাতার,
করিয়া শৈলের স্নেহে, কবচ নির্ম্মাণ
সমরে করিও রক্ষা বাছায় আমার !"
নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া
কিছুক্ষণ দুইজন, চাহিল বিদায়
নমিয়া চরণে শৈল। দাঁড়াইয়া ভদ্রা
সস্নেহে ধরিয়া কর কহিলেন ধীরে—
"থাক্ মুহূর্ত্তেক শৈল ! মধ্যম পাণ্ডবে
ডেকে আনি, ডেকে আনি নর-নারায়ণে,—
আমার তোমার দেব, উপাস্য যুগল !
পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
দুই জনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়
করিতে তুলনা তার.। ভগিনীর তোর
রক্ষা কর্ অনুরোধ, এক দিন তার

থাক্ বুকে, লয়ে বুকে অভি উত্তরায়,—
কাটাবে একটী দিন স্বর্গে সুভদ্রায়।"
"না দিদি"—কহিল শৈল রাখিয়া মস্তক
সেই প্রেম-পূর্ণ বুকে,—"হয় নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা, সিদ্ধি তপস্যার,
কৃষ্ণার্জ্জুন পদ-তীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ। হৃদয়-সংযম
প্রলোভনে,—সেই অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ,—
যে পারে, সে দেবী; দেবী সুভদ্রা সে জন।
শৈলের হৃদয়ে দিদি! নাহি সেই বল।
নাহি শক্তি পতঙ্গিনী দেখিবে নয়নে
কৃষ্ণপদ প্রভাকর, চিন্তায় যাহার
আলোক সাগরে ডুবে পতঙ্গের মত
তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র। পারিবে যে দিন
নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
দেখিতে পার্থের মুখ; করিতে দর্শন
নারায়ণ পদাম্বুজ শান্তি নিকেতন;
পারিব যে দিন মিলি ভগিনী দুজনে,
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
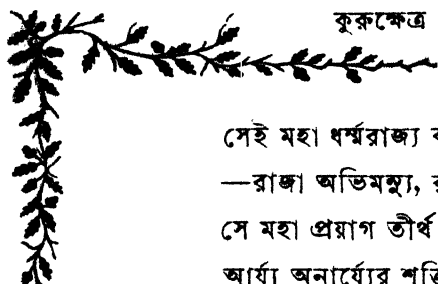
সেই মহা ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপিত
—রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার,—
সে মহা প্রয়াগ তীর্থ দেখিব যে দিন,—
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি, সুভদ্রা শৈলজা,
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগলা ;
সে দিন আসিবে শৈল চরণে তোমার।
যত দিন এই স্বপ্ন ফলিবে না,—দেবি !
কহ এই স্বপ্ন হায় ! ফলিবে কি কভু ?—
তত দিন যেই উর্দ্ধ ধর্ম্ম রমণীর
শিখিলাম, সেই ধর্ম্ম করিব সাধন ;
তত দিন—
গৃহ ক্ষেত্র সুভদ্রার, শৈলজার বন।"
এখনো চাহিয়া
আকাশের পানে শৈল হইল নীরব ;
সুভদ্রার বুকে মুখ, ধরিয়া গলায়।
সুভদ্রা চাহিয়া স্থিরা আকাশের পানে,
চন্দ্রদীপ্ত অশ্রু-সিক্ত কপোল কমলে
বহিছে সে প্রেমধারা ; সিত চন্দ্রালোকে
হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
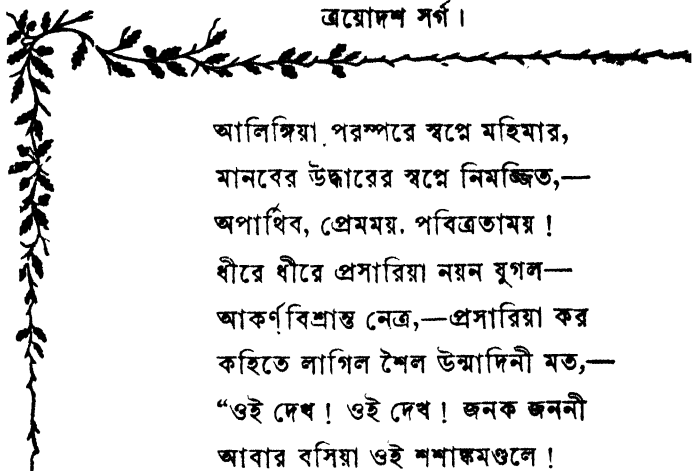
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে স্বপ্নে মহিমার,
মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত,—
অপার্থিব, প্রেমময়, পবিত্রতাময়!
ধীরে ধীরে প্রসারিয়া নয়ন যুগল—
আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র,—প্রসারিয়া কর
কহিতে লাগিল শৈল উন্মাদিনী মত,—
"ওই দেখ! ওই দেখ! জনক জননী
আবার বসিয়া ওই শশাঙ্কমণ্ডলে!
কি হাসি বদনে, আহা! কি প্রেম নয়নে!
সফল হইবে স্বপ্ন? একি দেখি পুনঃ
হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর
কি মূর্ত্তি ভাসিল ওই,—সুভদ্রা অর্জ্জুন!
পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার।
পিত! পিত! মুছে ফেল শোক হৃদয়ের।
এই দেখ শৈল আজি দুহিতা তোমার।
সফল তপস্যা; দেখ হৃদয় তাহার
পিতৃপ্রেমে অবিচল, স্থির, অকম্পিত।
মা আমার! মা আমার! প্রেম মুখ তোর
কি সুন্দর, কি ত্রিদিব! কি দেখি আবার!—
এক অঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
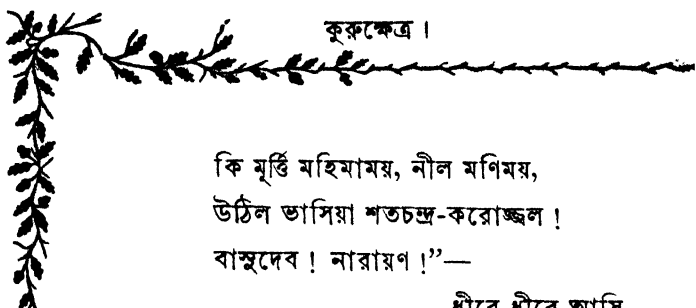
কি মূর্ত্তি মহিমাময়, নীল মণিময়,
উঠিল ভাসিয়া শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল !
বাসুদেব ! নারায়ণ !”—

ধীরে ধীরে আসি

দাঁড়াইলা আগে কৃষ্ণ ! হইল পতিতা
শৈলজা সুভদ্রা পদে, উভয় মূর্চ্ছিতা।
চাহি আকাশের পানে, মহিমা মণ্ডিত
দাঁড়াইয়া নারায়ণ, আপনি মূর্চ্ছিত।

* * * *

দাঁড়াইয়া থাক নাথ !

নিরখি নয়ন ভরি।

আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মি !

থাক মা চরণে পড়ি।

অনার্য্য-আর্য্য শক্তির

এইরূপ সংঘর্ষণ—

ভারত-নিয়তি যদি,

তব ইচ্ছা নারায়ণ !

এইরূপে পদতলে

হ'য়ে শেষে সম্মিলিত
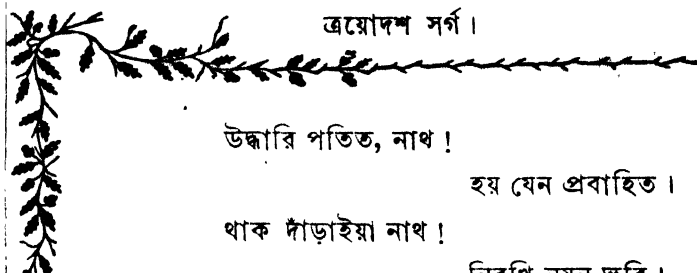
উদ্ধারি পতিত, নাথ !
হয় যেন প্রবাহিত।
থাক দাঁড়াইয়া নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মি !
থাক মা চরণে পড়ি।
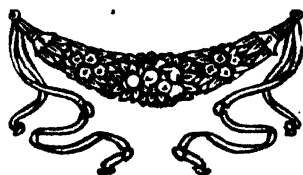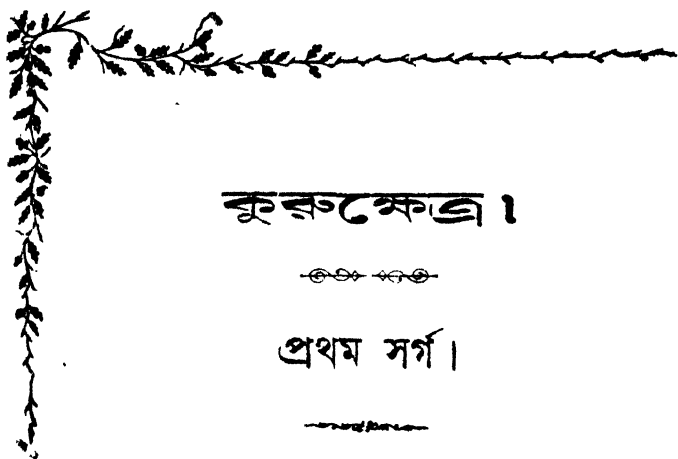
কুরুক্ষেত্র।

প্রথম সর্গ।

ধর্ম্মক্ষেত্র।
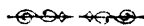
"নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্ম্মল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে ঊর্দ্ধে তরঙ্গিত,—
নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্বচরাচরে।
দুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত বেলা যেন রণ-পয়োধির!"—
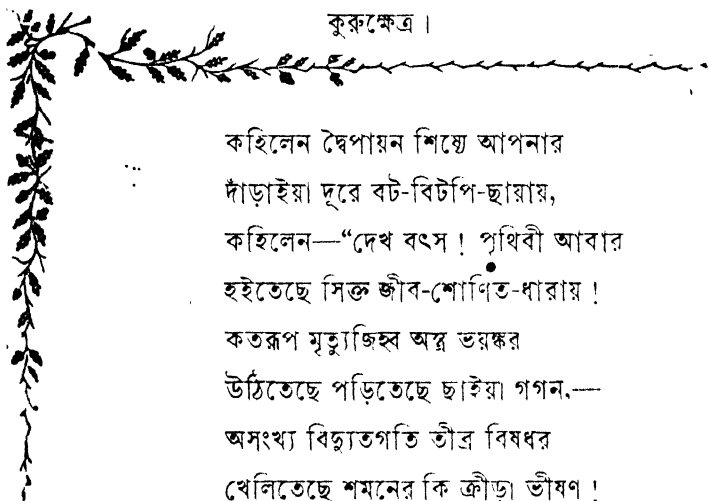
কহিলেন দ্বৈপায়ন শিষ্যে আপনার
দাঁড়াইয়া দূরে বট-বিটপি-ছায়ায়,
কহিলেন—"দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিত-ধারায়!
কতরূপ মৃত্যুজিহ্ব অস্ত্র ভয়ঙ্কর
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন,—
অসংখ্য বিদ্যুতগতি তীব্র বিষধর
খেলিতেছে শমনের কি ক্রীড়া ভীষণ!
অস্ত্রের নিস্বন ঊর্দ্ধে, ঘাত প্রতিঘাত,
কালানল উদ্গীরণ; নিম্নে হাহাকার
মিশি সিংহনাদ সহ, অশনি সম্পাত
কোদণ্ড টঙ্কার ঘোর, শ্রবণে আমার
লাগিতেছে যেন দূর সমুদ্র হুঙ্কার
বাতক্ষুব্ধ, সহ ঘন অশনিঝঙ্কার।"
কহিল বিনীত শিষ্য ভয়ে ব্যাকুলিত—
"কি ভীষণ দৃশ্য, প্রাণ কাঁপে থরথর!
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!
বীরেরা মানব নহে, শমনকিঙ্কর!
এই পাপ দৃশ্য প্রভু! দেখিলেও হায়!
হয় চিত্ত কলুষিত। নিষ্ঠুর মানব
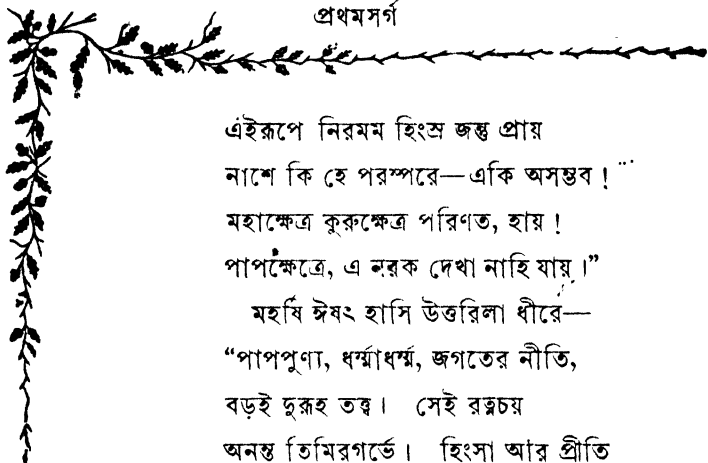
এইরূপে নিরমম হিংস্র জন্তু প্রায়
নাশে কি হে পরস্পরে—একি অসম্ভব !
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত, হায় !
পাপক্ষেত্রে, এ নরক দেখা নাহি যায়।"
মহর্ষি ঈষৎ হাসি উত্তরিলা ধীরে—
"পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জগতের নীতি,
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। সেই রত্নচয়
অনন্ত তিমিরগর্ভে। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।
নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর হৃদয়,
দয়ার সাগর তিনি, পুণ্য-পারাবার।
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
সাধিছেন স্থির চিত্তে ক্ষত্রিয় বিনাশ,
নাশিছেন প্রিয়জন দেখ কত মতে,
হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, সেইখানে জয়,—
সতী গান্ধারীর কথা সত্য নিঃসংশয়।"
বিস্ময়ে কহিল শিষ্য,—"হায় ! যদি প্রভু !
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আর ?
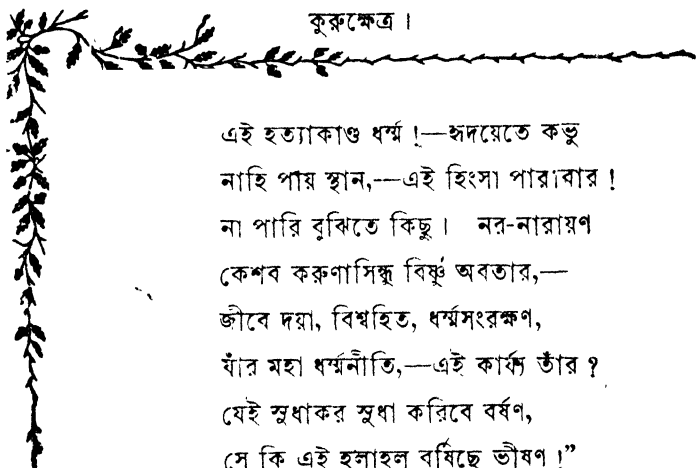
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম !—হৃদয়েতে কভু
নাহি পায় স্থান,—এই হিংসা পারাবার !
না পারি বুঝিতে কিছু। নর-নারায়ণ
কেশব করুণাসিন্ধু বিষ্ণু অবতার,—
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্ম্মসংরক্ষণ,
যাঁর মহা ধর্ম্মনীতি,—এই কার্য্য তাঁর ?
যেই সুধাকর সুধা করিবে বর্ষণ,
সে কি এই হলাহল বর্ষিছে ভীষণ !"

ব্যাস। সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
জড়ে ও অজড়ে বৎস ! সর্ব্বত্র সমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখ চক্রের মতন
ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম ;
ধ্বংস বিনা সৃষ্টিস্থিতি, বৎস ! অসম্ভব।
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ,
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব ;—
না পারিবে স্থিতি লাভ করিতে কখন।
রুদ্ধ কর মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্দ্ধিত
জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত।

শিষ্য। মানিলাম ধ্বংসনীতি। সৃজন পালন
যাঁর মায়া, মানিলাম ধ্বংসও তাঁহার।

না পারি একটি বালি করিতে সৃজন,
আমার তাহাতে কিবা আছে অধিকার ?
আমি, কে ?

ব্যাস তাহার অস্ত্র। সৃষ্টিস্থিতিলয়
যেই নীতিচক্রে নিত্য হতেছে সাধিত,
তুমি পরমাণু তার ; সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্ম্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত ;—
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। এই নীতিবলে
শার্দ্দূল নাশিয়া, বৎস! ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
পড়িছে শার্দ্দূলাধিক কালের কবলে ;
নাশিছে এ বৃক্ষ দেখ তৃণ ছায়াগত।
আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
জীবদের হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার।
এই নীতি অনুসরি যদি নিয়োজিত
কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার ?
পোড়ায় অনল যদি, ডুবায় সলিল,
বল কি তাদের পাপ হয় একতিল ?

শিষ্য। নিগূঢ় সংসার তত্ত্ব। হায়! ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে তাহা, কে বুঝাবে তারে ?

ব্যাস। মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
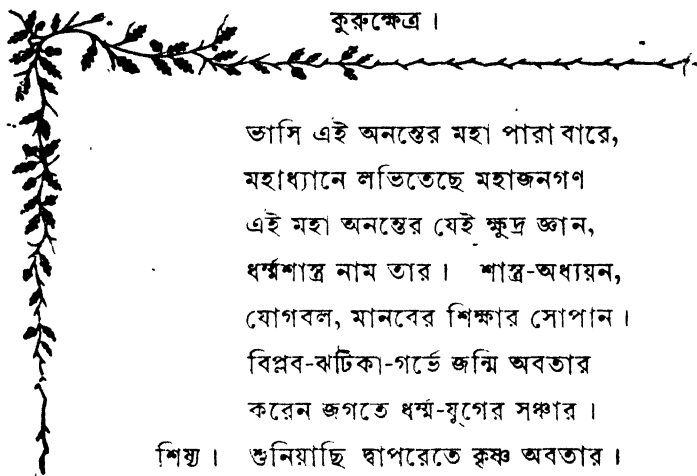
ভাসি এই অনন্তের মহা পারাবারে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ধর্ম্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
যোগবল, মানবের শিক্ষার সোপান।
বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।

শিষ্য। শুনিয়াছি দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার।
এই ধ্বংস-যজ্ঞ প্রভু! ধর্ম্মশিক্ষা তাঁর?
জীবে দয়া,—জীবহিংসা? সর্ব্বজীবহিত,—
সর্ব্বজীবের বিনাশ? এই মহারণ,—
কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র? প্রভু! উৎপাটিত
করিলে কি, এই তরু হবে সংরক্ষিত?

ব্যাস। এই ধ্বংস-যজ্ঞ, ধর্ম্ম। কর দরশন
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ-হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার

ভারতে মহাভারত,—কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ব্ব জীবনলীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ব্বাসন
নিবারিতে রক্তস্রোত সমুদ্রের পার।
সেই জরাসন্ধ-বধ, অদ্ভুত কৌশল,—
কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ-নিবারণ!
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনা যুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপন!
সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র নিষ্কাম,
সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্ম আদর্শ মহান্।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির; ধর্ম্মরাজ্য তাঁর
জান যে অধর্ম্মে তাহা হ'য়ে অপহৃত!
জান সভা মধ্যে সেই ঘোর অত্যাচার
সতী দ্রৌপদীর প্রতি, নরক-অতীত!
বাল-নির্যাতন; জতুগৃহের দাহন;
ত্রয়োদশ বৎসরের ঘোর বনবাস;
সন্ধি তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি নির্যাতন
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করি হইলা নিরাশ।
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—
শুনিয়াছ লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
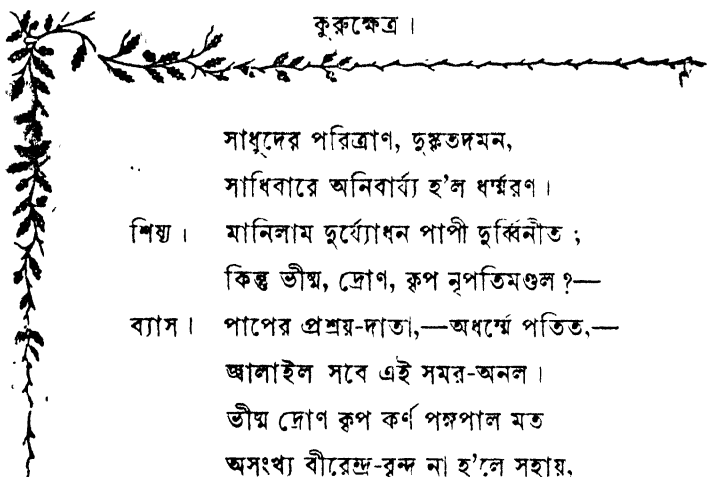
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদমন,
সাধিবারে অনিবার্য্য হ'ল ধর্ম্মরণ।

শিষ্য। মানিলাম দুর্য্যোধন পাপী দুর্ব্বিনীত ;
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতিমণ্ডল ?—

ব্যাস। পাপের প্রশ্রয়-দাতা,—অধর্ম্মে পতিত,—
জ্বালাইল সবে এই সমর-অনল।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পঙ্গপাল মত
অসংখ্য বীরেন্দ্র-বৃন্দ না হ'লে সহায়,
হইত কি দুর্য্যোধন এই পাপে রত ?
নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি, হায় ?
কি অধর্ম্ম অভ্যুত্থান ক্ষত্রিয়-জগতে
ঘটিয়াছে, বৎস ! এই ভীষণ সমর
না হইতে নির্ব্বাপিত, হায় ! কত মতে
দেখিবে তাহার আরো চিত্র ভয়ঙ্কর।
অধর্ম্ম-অনলে, বৎস ! পঙ্গপাল মত
হইবে ক্ষত্রিয়জাতি ভস্মে পরিণত।

শিষ্য। কিন্তু পাণ্ডবের পক্ষ বীরেন্দ্রমণ্ডল
মরিতেছে কোন্ পাপে ?

ব্যাস। মৃত্যু অনিবার।

* দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন

ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম,—ত্রিদিব তাহার
বীরব্রতে ধর্ম্মরণে জীবন-অর্পণ।
মানবসমাজ-রক্ষা হয় নিরন্তর
এইরূপে; জান বৎস! নির্লিপ্ত ঈশ্বর।

শিষ্য। ঘোরতর কর্ম্মলিপ্ত অবতার তাঁর
দেখিতেছি ভগবন্! বুঝিব কেমনে
ঈশ্বর নির্লিপ্ত তবে?

ব্যাস। কি ভ্রান্তি তোমার!
কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান্ কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।
জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার,
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম্ম-মূলে; কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার; নির্লিপ্ত সে জন।
নিষ্কাম বা নির্লিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
মহিমা-মণ্ডিত ওই সম্মুখে তোমার,—
কৃষ্ণের জীবনচিত্র পবিত্র নির্ম্মল!
আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার?
নারায়ণ, নারায়ণী সেনা আপনার,
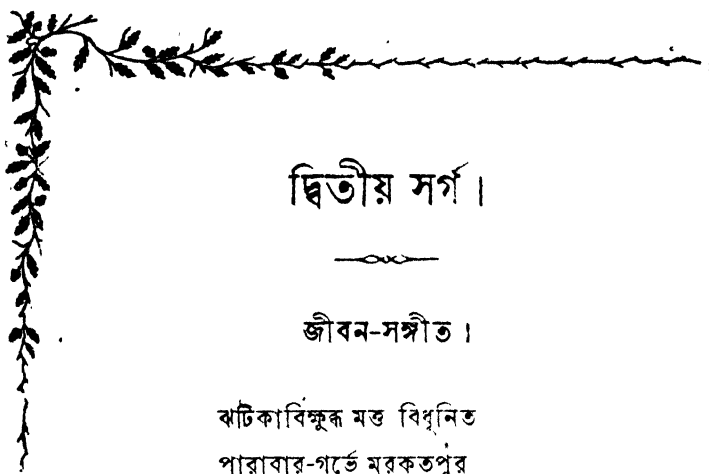
দেখ প্রতিকূল পক্ষে! সমগ্র ক্ষত্রিয়
সমবেত যেই ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র কীট ছার
যশোলোভে মত্ত যথা,—বীর অদ্বিতীয়
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি!
সারথির ব্রতে ব্রতী! শৃগালের ব্রতে
ব্রতী সিংহ; খদ্যোৎব্রতে ব্রতী দিনমণি!
জগত তাঁহার রথ; অনন্ত তাঁহার
কুরুক্ষেত্র; শক্তি অস্ত্র; অনন্ত সমর,—
সৃজন পালন লয়; অনন্তে সাঁতার
দিতেছে সে মহারথ কল্প কল্পান্তর!
কাতর অর্জ্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
যেই ধর্ম্ম-গীতামৃত করাইয়া পান
করিলা স্বধর্ম্মে রত, যোগধ্যান ধরি
করিয়াছি সঙ্কলন,—পরিতৃপ্ত প্রাণ!—
সেই গীতা উত্তরীয়-অঞ্চলে তোমার।
যাও, বৎস! পুণ্যতোয়া হিরণ্বতী-তীরে
এখনি সায়ংসন্ধ্যা করি সমাপন
যাব আমি। গিয়া তুমি পাণ্ডব-শিবিরে
সুভদ্রার করে গ্রন্থ কর সমর্পণ,
মম আশীর্ব্বাদ সহ। শান্তনুতনয়
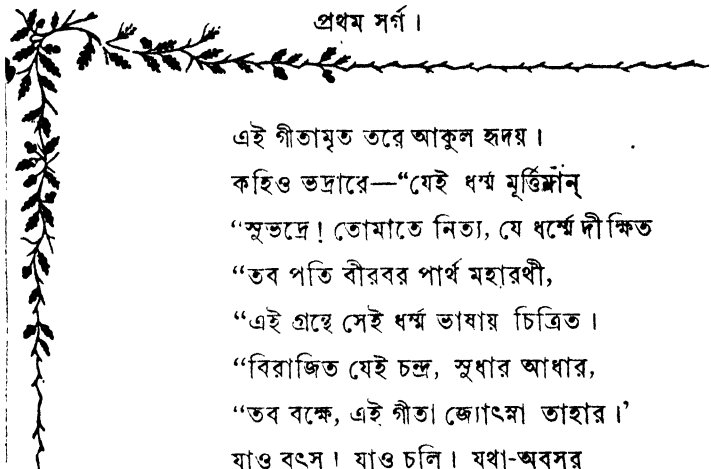
এই গীতামৃত তরে আকুল হৃদয়।
কহিও ভদ্রারে—"যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
"সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
"তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
"এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
"বিরাজিত যেই চন্দ্র, সুধার আধার,
"তব বক্ষে, এই গীতা জ্যোৎস্না তাহার।'
যাও বৎস! যাও চলি। যথা-অবসর
করিব যতেক শিষ্যে এ অমৃত দান।
মিলিয়াছে মোক্ষসুধা, যুগ যুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান।
মানবের কর্ম্মাকাশে ধর্ম্ম-ধ্রুবতারা
জানিলাম এত দিনে হ'ল সমুদিত;
অনন্ত কালের তরে অন্ধ দিক্‌হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত।
গীতার এ রঙ্গভূমি. মহাতীর্থ মত,
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে হবে পরিণত

দ্বিতীয় সর্গ।

জীবন-সঙ্গীত।

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মত্ত বিধূনিত
পারাবার-গর্ভে মরকতপুর
শোভে বরুণের, শান্তির আধার,—
বরুণ বারুণী কি চিত্র মধুর!
রণ-ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
কুরুক্ষেত্র গর্ভে শোভার আধার
শোভিছে শিবির—শান্তির ত্রিদিব
প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।
প্রীতির স্বপন প্রতিমা যুগল,
সুখশান্তি হাসি জ্যোৎস্না মুখে।
প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
সুখশান্তি ভরা জ্যোৎস্না বুকে।
ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া

দ্বিতীয় সর্গ।
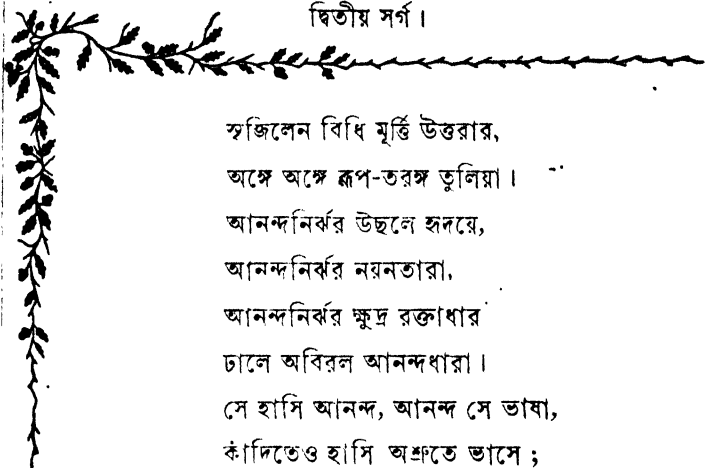
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া।
আনন্দনির্ঝর উছলে হৃদয়ে,
আনন্দনির্ঝর নয়নতারা,
আনন্দনির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধার
ঢালে অবিরল আনন্দধারা।
সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে;
অভিমানভরে থাকে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চহাসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরীঝঙ্কার।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চভাষা—
কিশোরীর? না না, স্বর্গীয় বীণার।
হাসিতে, ভাষিতে, কিবা মূর্চ্ছনায়
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল;
চঞ্চলার মত যাইতে ছুটিয়া,
না ছোঁয় ধরণী চরণ চঞ্চল!
এই হাসিরাশি-কুসুমকাননে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ!

কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী।"
কৈশোর কহে—"না, কিশোরী এখন।"
বসি অভিমন্যু বিচিত্র আসনে
সুবর্ণে নির্ম্মিত, রতনে খচিত,
আঁকিছেন চিত্র ;—বীর অবয়ব
সুবর্ণে নির্ম্মিত, রতনে ভূষিত।
আকর্ণ বিশ্রান্ত যুগল নয়ন,
আকর্ণ নিবিড় যুগল ভুরু ;
বিশাল ললাট, বিশাল উরস্,
ক্ষীণ কটি, কিবা বিশাল উরু !
গবাক্ষের তলে হিরণ্বতীজলে,
জ্বলে ধক্ ধক্ পশ্চিমরবি ;
গবাক্ষ সম্মুখে প্রশস্ত ললাটে
জ্বলে ধক্ ধক্ প্রতিভাছবি !
এই বীরত্বের মহারঙ্গভূমে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ !
কহিছে কৈশোর—"এখনো কিশোর।"
"মিথ্যা কথা"—গর্ব্বে কহিছে যৌবন।
চিত্রিছেন অভিমন্যু একমনে
"ভীষ্ম-শর-শয্যা" আনত মুখে ;

আসি চুপে চুপে আসনপশ্চাতে
কহিলা বিরাট-বালা কৌতুকে,—
"কিহে বীরবর! আজি যে সকালে
রণ-ক্ষেত্র হ'তে দিলে পিট্‌টান?
জীব-হত্যা-রঙ্গে হ'ল কি অপ্রীতি?
কত শত আজি দিলে বলিদান?"

আঁকিতে আঁকিতে কহে অভিমন্যু
"যথার্থ উত্তরে! দিয়েছি পিট্‌টান।
যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসিটুকু, কার মুখখান।"

"দেখি দেখি"—কহি সুকোমলা
আদরে উত্তরা তুলিলা মুখ।
হাসি অভিমন্যু কহিলা আদরে—
"এই মুখ বটে, এ হাসি টুক!"

অধরে অধর হইল মিলিত;
অধরে অধর রহিল গাঁথা।
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল,—
নিমীলিত চারি নয়ন পাতা।

উত্তরা। নরহত্যা করি মিটেনি কি সাধ?
নারী-হত্যা কেন এরূপে আবার?

অভি। মুহূর্তে মুহূর্তে করে নর-হত্যা
যে জন, এ কথা সাজে কি তার ?
তবে নর হত্যা মানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম-অনন্তস্বপনে
ওই বুকে মরি, জাগি না আর।

উত্তরা। থাক্ মেনে থাক্, তব ভালবাসা!
সে ছাই বীরত্বে কাটি সারাদিন
ফিরিলে শিবিরে, চিত্রে নিমগণ ;
নহে কবিতায় থাক উদাসীন।
গাইয়ে বাজিয়ে কাটাইব দিন
ভাবি মনে মনে, তাও সাধ্য কার ?
ওই দেখ ওই শিবিরকোণায়
আদরের যন্ত্র সব স্তূপাকার।
বাঁধিতেছি বীণা, কর্ণে এক কর,
অন্য কর তারে,—ছাড়িল হুঙ্কার
সেই পোড়া অস্ত্র—কি নাম তাহার ?
চমকিল কর, ছিঁড়ে গেল তার!
আর সাজ করি বাজাতেছি যদি,
সেই হুম্‌হাম—কি নাম তাহার ?
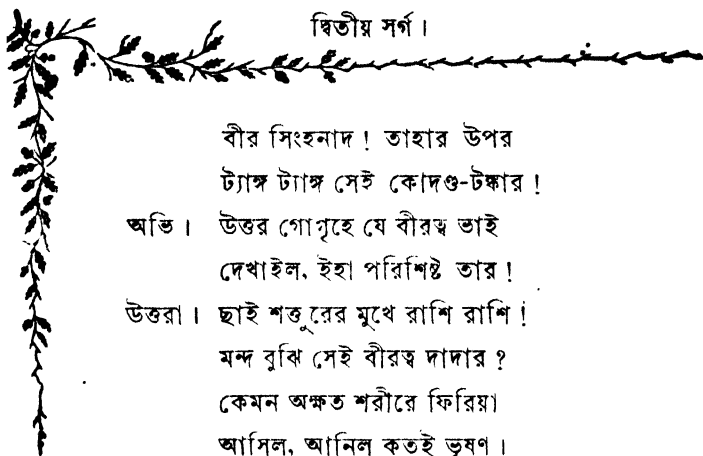
বীর সিংহনাদ! তাহার উপর
ট্যাঙ্গ ট্যাঙ্গ সেই কোদণ্ড-টঙ্কার!

অভি। উত্তর গোগৃহে যে বীরত্ব ভাই
দেখাইল, ইহা পরিশিষ্ট তার!

উত্তরা। ছাই শত্তুরের মুখে রাশি রাশি!
মন্দ বুঝি সেই বীরত্ব দাদার?
কেমন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া
আসিল, আনিল কতই ভূষণ।
কতই পুতুল করিনু নির্ম্মাণ
সে বীর-বসনে মনের মতন।
কেহ না মরিল, কেহ না কাঁদিল,
পতিহীনা নাহি হ'ল কারো দারা,
কারো শিশু নাহি হ'ল পিতৃহীন,
না হইল কোন মাতা পুত্রহারা!

"অদ্ভুত বীরত্ব!"—পিতার বীরত্বে
পুত্রের হৃদয় উঠিল ভরি;—
কহি অভিমন্যু, রহিলা নীরব,
চিত্রবৎ শূন্য দরশন করি।
চুপে চুপে চুপে তুলিটি লইয়া
চুপে চুপে গেল উত্তরা সরিয়া।
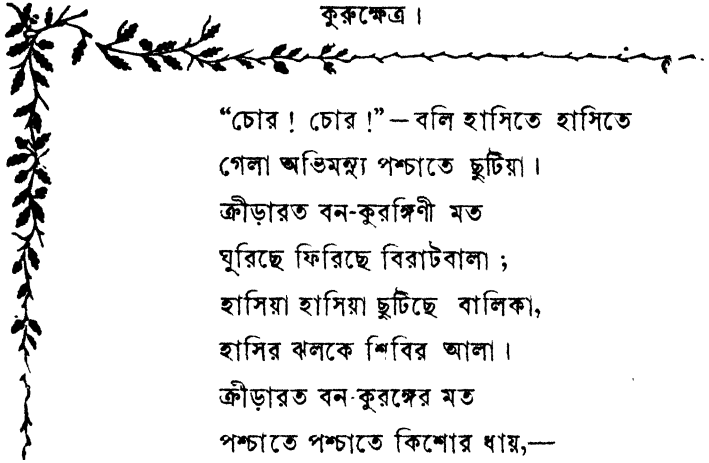
"চোর! চোর!"—বলি হাসিতে হাসিতে
গেলা অভিমন্যু পশ্চাতে ছুটিয়া।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গিণী মত
ঘুরিছে ফিরিছে বিরাটবালা;
হাসিয়া হাসিয়া ছুটিছে বালিকা,
হাসির ঝলকে শিবির আলা।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গের মত
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—
মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,
দুইটি বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়!

এবার যুবক ধরিল সাপটি,
"হি-হি" উচ্চ হাসি হাসিছে বালা;—
কর হ'তে তুলি লইল কাড়িয়া
চাপিয়া হৃদয়ে কুসুমমালা।
চুম্বিলা সে হাসি আবার আবার,
হাসিতে সুন্দর মিশিল হাসি।
নিপীড়িত যুগ্ম কুসুম-স্তবক
ঢালিল হৃদয়ে অমৃতরাশি!
যুবকের বাম প্রকোষ্ঠে বামার
শোভিছে বদন মুক্তকেশাবৃত,
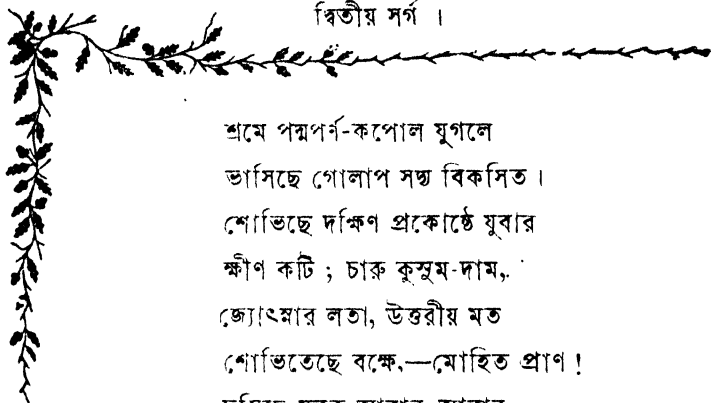
শ্রমে পদ্মপর্ণ-কপোল যুগলে
ভাসিছে গোলাপ সদ্য বিকসিত ।
শোভিছে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যুবার
ক্ষীণ কটি ; চারু কুসুম-দাম,
জ্যোৎস্নার লতা, উত্তরীয় মত
শোভিতেছে বক্ষে,—মোহিত প্রাণ !
চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা ।
আবার আবার হাসির তরঙ্গ,
কি ভাষা হাসির ! মরি কি কথা ।

সাঙ্গ হ'ল রণ ; আবার আসনে
বসিল যুবক আঁকিতে ছবি ।
কহিল—"পাগলি ! দেখ লো চাহিয়া
জগতে অতুল বীরত্বরবি !
দেখ ভীষ্মদেব প্রসন্ন বদনে
শুইয়া কেমন শরের শয্যায় !
বীরের পিপাসা নিবারিতে বীর
সৃজেছেন উৎস কি সুন্দর হায় !
বামপার্শ্ববিদ্ধ-শায়কে শায়িত ;
ঘন অস্ত্রাঘাতে উরস-অম্বর

আচ্ছন্ন কিংশুকে বীরত্ব-আধার ;—
নাহি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি আঁচড়।
বিস্মিত পাণ্ডব, বিস্মিত কৌরব,
বিস্মিত ধরার বীরেন্দ্রমণ্ডল,
দাঁড়ায়ে নীরবে শ্লথধনু করে
দেখিছে এ দৃশ্য আঁখি ছল্ ছল্।
ধান্যক্ষেত্রে ছিন্ন তৃণরাশি মত
চারি দিকে অস্ত্র পড়ি স্তরে স্তরে ;
চারি দিকে হত চতুরঙ্গদল,
দ্বীপ-মালা যেন শোণিত-সাগরে।"

মুহূর্ত্ত বালিকা দেখিল সে চিত্র
দক্ষ তুলিকার উচ্ছ্বাসে চিত্রিত।
চাহিয়া চাহিয়া অধর টিপিয়া
উত্তরিল, চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত,—
"কি নিষ্ঠুর দৃশ্য! দেখা নাহি যায়
বীরত্বের হায়! এই পরিণাম!
শুইত যে নিত্য কুসুম-শয্যায়,
অসংখ্য শরাগ্রে আজি সে শয়ান!
হরি! হরি! হরি! মানুষে মানুষ
কেমনে এমন করে প্রহার?

হায়! সকলের একই পরাণ,
প্রাণে প্রাণ-ব্যথা বুঝে না আর?”
আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া
কহে অভিমন্যু গম্ভীর মুখে—
“বড়ই কঠোর বীরধর্ম্ম এই!
কি পাষাণ চাপা বীরের বুকে!—
সত্য লো উত্তরে! ভাবি যবে মনে,
ইচ্ছা নাহি হয় ধরিতে শর;
করি রণ যেন কলের পুতুল,
শিবিরে ফিরিয়া আসি সত্বর।
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর,
দেখি সব ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
নাহি দেখি কেহ অস্ত্রযোগ্য মম,
কাঁদে প্রাণ দেখি ক্ষুদ্র সৈন্য হত।
বজ্র অস্ত্র যার, হয় কি, উত্তরে!
পিপীলিকা-বধে প্রবৃত্তি তার?
উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল-পয়োধি
ডুবাতে কি চাহে পতঙ্গ ছার?
হায়! বিধাতার সুখের সাংসার,
সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার হৃদয়ভরা।

হায় ! কেন নর হিংসি পরস্পরে
এমন নরক করে এ ধরা !
কি যে বীরধর্ম্ম নাহি বুঝি, প্রিয়ে !
নরনারায়ণ জনক মাতুল
যেই পথগামী, ধর্ম্মপথ তাহা
এই বালকের পবিত্র, অতুল !
বীরধর্ম্ম পুণ্য নিয়তি আমার ।
মাগ প্রিয়তমে ! এ বর কেবল,—
হেন শরশয্যা লভি রণক্ষেত্রে
কৃষ্ণার্জ্জুন-মুখ করি সমুজ্জ্বল ।"
"ওই ছাই কথা শুনিব না আমি"—
কহি সব তুলি ফেলিল ছুড়িয়া ।
কুড়াইতে গেলে বিরক্তে যুবক,
ছবিটি লইয়া ছুটিল হাসিয়া ।
"এখনি উননে করি সমর্পণ
এ সাধের ছবি করিব ছাই ।
ফেলিয়া সেই ছাই হিরণ্বতীজলে,
দিব করতালি তাই, তাই, তাই ।"—
কুসুমকোমল কক্ষ-গালিচায়
কুসুমিত লতা ঢলিয়া পড়ি,

কাম-স্বপ্ন-শয্যা পুষ্পিত উরসে
হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি।
আপাদচুম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরি সুতনু সুবর্ণলতা,
আবরি গালিচা,—শোভিছে সুতন্বী
কানন-আঁধারে জ্যোৎস্না যথা।
মুগ্ধপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া,
ঈষদ্ ঈষদ্ করে পরশন
সুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুন্দর,
পার্শ্ব ব্রীড়ালয় মার্জ্জিত কাঞ্চন।
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বালা,
লহরে লহরে ছুটিছে হাসি,
বিকাশিছে মরি উন্মেষ যৌবন
লহরে লহরে কি রূপরাশি!
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে
চিত্র হ'তে চিত্র পড়িল সরিয়া;
এক চিত্র করে, অন্য চিত্র বক্ষে,
হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া।
প্রাণেশের করে ক্ষীণ কটি খানি,
যেন ফুলধনু ভুলিয়া পড়ি!

আলু থালু কেশে, আরক্ত বদনে,
আয়ত নয়নে, কি ক্রীড়া মরি !
অশ্রান্ত হাসিয়া আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি,—
খেলে দুই পদ্ম কি লীলা করিয়া !
কি লীলা করিয়া দোলে কর্ণদুল !
কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয় !
দোলে মুক্তাহার কি লীলা করিয়া !
শিঞ্জিনী-শিঞ্জন কিবা লীলাময় !
আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার ;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুমবর্ষণ কিবা অনিবার !
বসিলা যুবক আঁকিতে সে ছবি ;
কক্ষতলে বালা বসিল মানে,
বারিভরা-মেঘ বিস্তৃত নয়ন,
ছল ছল চাহি গালিচাপানে।
কহে অভিমন্যু—"দেখ এসে দেখ,
কেমন সুন্দর ফলেছে রঙ্ ।"
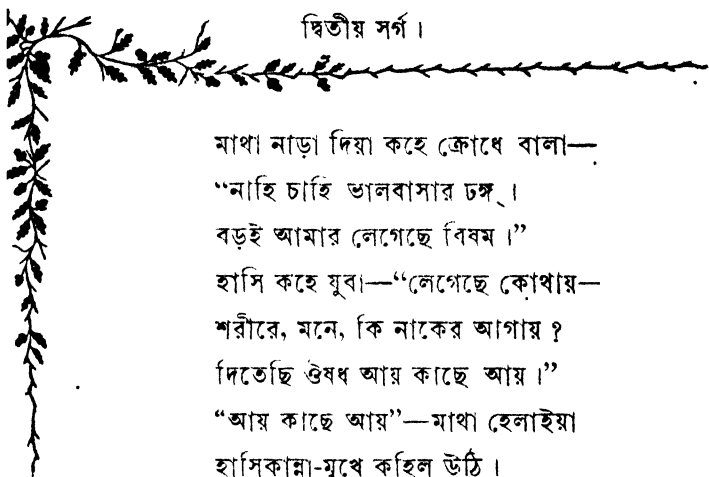
মাথা নাড়া দিয়া কহে ক্রোধে বালা—
"নাহি চাহি ভালবাসার ঢঙ্‌।
বড়ই আমার লেগেছে বিষম।"
হাসি কহে যুবা—"লেগেছে কোথায়—
শরীরে, মনে, কি নাকের আগায় ?
দিতেছি ঔষধ আয় কাছে আয়।"
"আয় কাছে আয়"—মাথা হেলাইয়া
হাসিকান্না-মুখে কহিল উঠি।
উঠিলা যুবক ; ছুটিল যুবতী—
উড়ে কেশভার চরণে লুটি।
আঁকিতে লাগিলা যুবা পুনঃ ছবি ;
চুপে চুপে বালা ফিরিয়া আসি,
ধীরে ধীরে ধীরে বীণাটী লইয়া
ঢালিতে লাগিল অমৃতরাশি।
সেই বীণা তানে প্রাণেশের প্রাণে
বহিতে লাগিল কি সুধাধারা !
আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর
কি আঁকে না জানে,—আপনাহারা।
মিশিল বীণায় কণ্ঠ উত্তরার,
বীণায় জীবন্ত বীণার লয় !
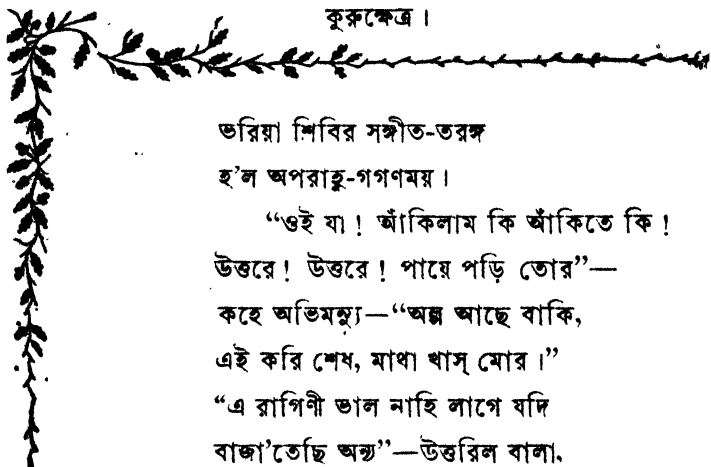
ভরিয়া শিবির সঙ্গীত-তরঙ্গ
হ'ল অপরাহ্ণ-গগণময়।
"ওই যা! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি!
উত্তরে! উত্তরে! পায়ে পড়ি তোর"—
কহে অভিমন্যু—"অল্প আছে বাকি,
এই করি শেষ, মাথা খাস্ মোর।"
"এ রাগিণী ভাল নাহি লাগে যদি
বাজা'তেছি অন্য"—উত্তরিল বালা,
ছড়ের আছাড়ে, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
কার সাধ্য বসে, কান ঝালাপালা।
এক করে টিপি কপোলযুগল,
অন্য করে বীণা লইয়া কাড়ি,
কহে অভিমন্যু—"এই দেখ তবে
সাধের এ বীণা ভাঙ্গি আছাড়ি।"
হি-হি-হি-হি হাসি—"দাইমা! দাইমা!"
উঠিল চীৎকার উপরে চীৎকার;
গর্জ্জি বেগে সুলোচনা ঠাকুরাণী,
নামিয়া আসরে দিলেন বার।
অন্তরাল হ'তে ধাত্রী সুলোচনা
দেখি অভিনয় মোহিত মনে,

এবে ছল-রোষে রাঙ্গাইয়া আঁখি
কহিলা গর্জ্জিয়া ভ্রূকুটী সনে

স্নুলো। কি হয়েছে বল ?"

উত্তরা। মেরেছে আমায়।

স্নুলো। কে মেরেছে ? অভি ?

অভি। দাইমা ! অভাগী
মিছে কথা কহে।

স্নুলো। চোরের বেটা চোর,
চোরের ভাগিনা ! কি—কি বলিলি কি ?
দাইমা অভাগী ! ভদ্রা কৃষ্ণার্জ্জুন
ধ্যান করে যার মহিমা অপার ?

অভি। না দাইমা ! আমি আঁকিতেছি ছবি,
শুধু জ্বালাতন করে বার বার।

স্নুলো। বটে দুষ্ট মেয়ে !

উত্তরা। জানি লো, জানি লো,
তুই ওর দিকে টানিস্ সতত।
হইবে বাবার সমক্ষে বিচার,
যার কাছে হবে উচিত মত।

স্নুলো। কে রে তোর বাবা ? কি বলিলি তুই ?
দিলি রে আমার বিচার দোষ ?

আমার উপরে কে সে বিচারক !
চল দেখি যাই।

করি মহারোষ,

ছু’টে বালিকায় অঙ্কেতে লইয়া,—
হাসে পুষ্পরাশি সে পুষ্পদোলায়।
চুম্বিয়া চুম্বিয়া সেই হাসিরাশি
হাসিতে হাসিতে সুলোচনা যায়।
ভাবে অভিমন্যু—“দাই মা এ কায
করিল কি ভাল ? হৃদয়ে আমার
রাখি মেঘ, গেল বিজলি চলিয়া,
আজি ছবি আঁকা হবে না আর।’
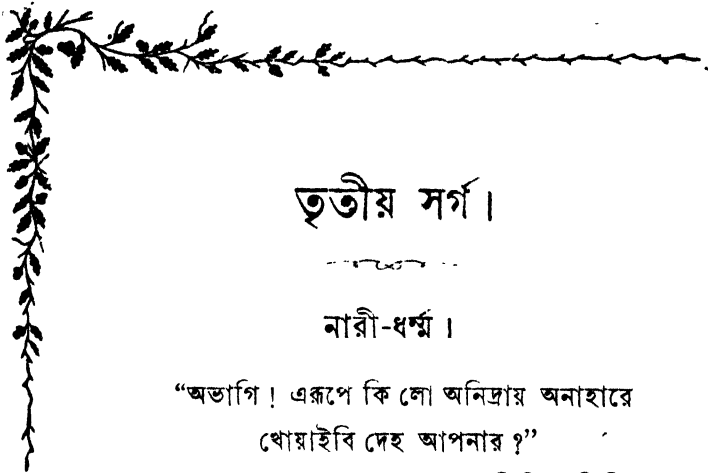
তৃতীয় সর্গ।

নারী-ধর্ম্ম।

"অভাগি! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?"
কহে সুলোচনা খেদে,—সুভদ্রা শিবিরে ফিরি,
ম্লান দেহ ক্লান্তির আধার
রাখিয়া শয্যায় যবে হইলা অর্দ্ধশায়িতা,
অবসন্না মূর্ত্তি করুণার!
শ্লথ গ্রন্থি গেল খসি, ধূসরিত কেশরাশি
ধূলামাখা পড়িয়া শয্যায়।
পাশে বসি সুলোচনা চারু সুকোমল করে
ধীরে ধীরে বিনাইছে তায়।

সুলো। অভাগি! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার!

শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার।
বসিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলায় ধূসর কেশভার।

আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ,
দেখি নাই তব হাসি মুখ।
এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ!

সুভ।— ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনাছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!

যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ, শোক, দুখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক।

আছে আর কিবা সুখ, হায়! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়!
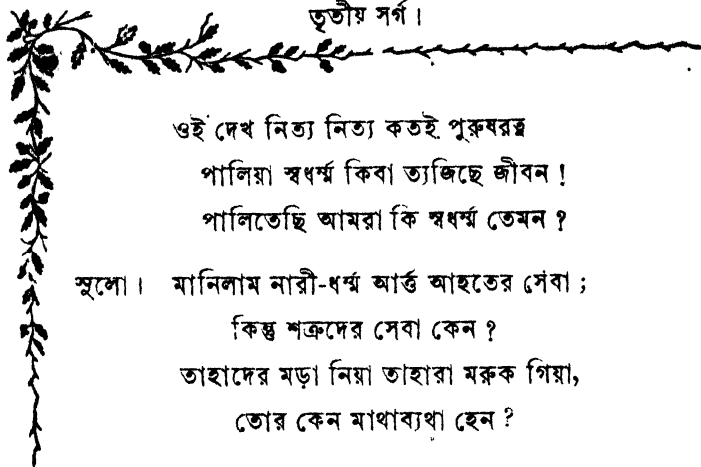
ওই দেখ নিত্য নিত্য কতই পুরুষরত্ন
পালিয়া স্বধর্ম্ম কিবা ত্যজিছে জীবন!
পালিতেছি আমরা কি স্বধর্ম্ম তেমন?

সুলো। মানিলাম নারী-ধর্ম্ম আর্ত্ত আহতের সেবা;
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন?
তাহাদের মড়া নিয়া তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাথাব্যথা হেন?

সুভ। শত্রু!—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।
তাও এক ধাতুময়, অস্ত্রে একরূপে হয়
সর্ব্ব দেহ ক্ষত ও বিক্ষত;
সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যুমুখে
শত্রু মিত্র হয় নিপতিত।
শত্রু!—এক ভগবান সর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা!
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

সুলো। শত্রুকেও তাহা বলি করিব কি মিত্র জ্ঞান?
মিত্র ওই কর্ণ দুর্য্যোধন?
দুর্জ্জনের (ও) দুঃখে দুঃখী হইব কি? সমভাবে
বিষামৃত করিব গ্রহণ?

সুভ। যেই জন পুণ্যবান, কে না তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম-অবতার।
সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্কে মাতা বসুধার!
সুমুজ্জ্বল রত্ন সহ অনন্ত বালুকারাশি
বহিতেছে গর্ব্ভে পারাবার।
জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান!
সর্ব্বত্র সমান প্রেম, সর্ব্বত্র সমান দয়া,
সর্ব্বত্র কি একত্ব মহান্!
না, দিদি!—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই!
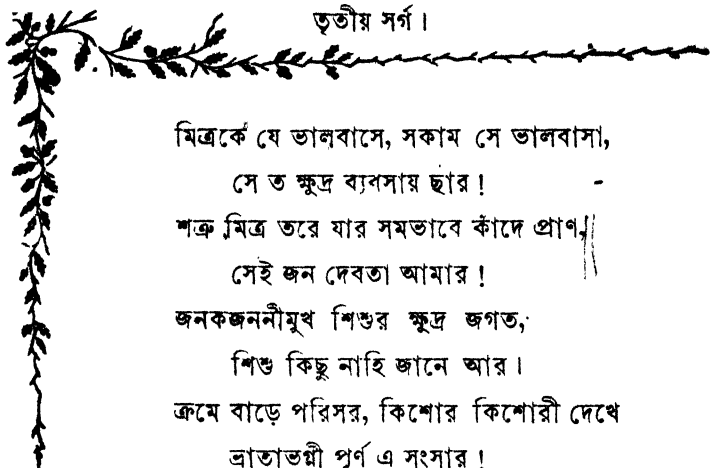
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার!
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার!
জনকজননীমুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতাভগ্নী পূর্ণ এ সংসার!
পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্তমুখ,—
পুণ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গম!
প্রেমধর্ম্ম এই, দিদি! কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার!
পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি, পুত্র, মহাবিশ্বে,
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে লো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।
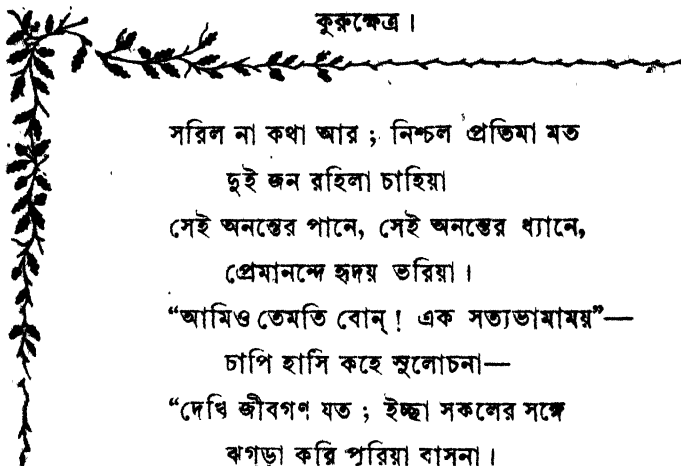
সরিল না কথা আর ; নিশ্চল প্রতিমা মত
দুই জন রহিলা চাহিয়া
সেই অনন্তের পানে, সেই অনন্তের ধ্যানে,
প্রেমানন্দে হৃদয় ভরিয়া।
"আমিও তেমতি বোন্! এক সত্যভামাময়"—
চাপি হাসি কহে সুলোচনা—
"দেখি জীবগণ যত ; ইচ্ছা সকলের সঙ্গে
ঝগ্‌ড়া করি পূরিয়া বাসনা।
দ্বারকা ছাড়িয়া যেন আসিয়াছি কত যুগ !
মরি জিহ্বাকণ্ডূয়নে হায় !
তোর কাছে আসি যদি বিজি বিজি কি বকিস্,
শুনি মম হাড় জ্ব'লে যায়।
যাই উত্তরার কাছে, তার সেই হিহি হাসি,
একেবারে কাণ ঝালাপালা !
পোড়া শাশুড়ীর মুখে চিরদিন চাপা হাসি,
বউটী ফুটন্ত হাসিডালা !
গালি পাড়,—তাও হাসি, মার,—অনর্গল হাসি,
হাসির কিছুতে নাহি শেষ।
যুড়িয়া ঝগড়া করি, হাসিতে ঝগড়ার ঝোঁক
ভেসে যায়,—এ ত জ্বালা বেশ !
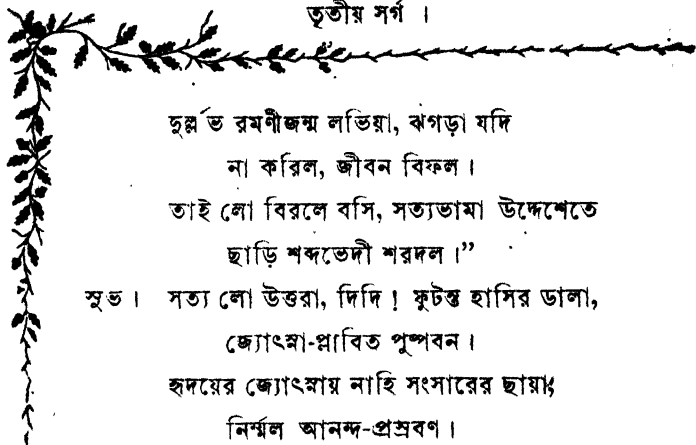
দুর্ল্লভ রমণীজন্ম লভিয়া, ঝগড়া যদি
না করিল, জীবন বিফল ।
তাই লো বিরলে বসি, সত্যভামা উদ্দেশেতে
ছাড়ি শব্দভেদী শরদল ।”

সুভ । সত্য লো উত্তরা, দিদি ! ফুটন্ত হাসির ডালা,
জ্যোৎস্না-প্লাবিত পুষ্পবন ।
হৃদয়ের জ্যোৎস্নায় নাহি সংসারের ছায়া;
নির্ম্মল আনন্দ-প্রস্রবণ ।
সেই হাসি, সেই ভাষা, সে আনন্দ, ভালবাসা,
কিবা স্বর্গ, সরলতাময় ।
সরলা আনন্দময়ী আমার উত্তরা, দিদি !
এই জগতের যেন নয় !
কৃষ্ণার্জ্জুন শিষ্য শিষ্যা উভয়ের সংমিলন—
মিলন সৌন্দর্য্য প্রতিভার !
ঘুমন্ত প্রতিভা-অঙ্কে ফুটন্ত সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন ;
কি সংযোগ শশাঙ্ক সুধার !

সুলো । হউক তা, কিন্তু যেনে না জানে ঝগড়া ছুঁড়ী,—
কমল কণ্টকে মনোহর !

সুভ । কেন, দু'জনে ত দিদি ! করে ঝগড়া অহরহ ;
সে কোন্দল কতই সুন্দর !

সুলো। মূর্খ তুই শিক্ষকের শিক্ষার অভাব টুক
চাহিতেছি করিতে পূরণ!
কিন্তু সে হাসির স্রোতে সকল ভাসিয়া যায়,
হইতেছে পণ্ড মম শ্রম।

সুভ। দিবসান্তে কৃষ্ণার্জ্জুন আসিলে শিবিরে ফিরি
ঝগড়া ত বাদ তব নাই।
তাতে কি উদর তোর নাহি ভরে, পোড়ামুখি!
শিশু দুটী ল'য়ে মর তাই!

সুলো। হরি! হরি! এ কি কথা! মিটিল না সাধ যার
সত্যভামা-কোন্দলসাগরে,
কিসে সে গণ্ডুষ-জলে বাঁচিবেক,—এত দিনে
সুলোচনা পড়িলী ফাঁফরে!

সুভ। কোন্দল-রোগের তোর করিতেছি প্রতিকার,—
সঙ্গে মম থাকি নিরন্তর
করিবি আহত-সেবা, পালিবি রমণী-ধর্ম্ম,
আয়, দিদি! এই সত্য কর।

সুলো। তোর নারী-ধর্ম্ম ল'য়ে মর্ গিয়া মড়া খাঁটি,
আমার তাহাতে কায নাই।
আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণার্জ্জুন, অন্য
আহত সেবিতে আমি যাই!
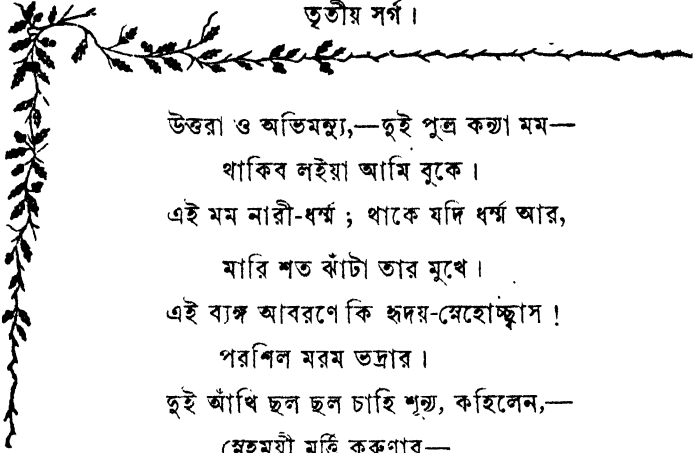
উত্তরা ও অভিমন্যু,—দুই পুত্র কন্যা মম—
থাকিব লইয়া আমি বুকে।
এই মম নারী-ধর্ম্ম ; থাকে যদি ধর্ম্ম আর,
মারি শত ঝাঁটা তার মুখে।
এই ব্যঙ্গ আবরণে কি হৃদয়-স্নেহোচ্ছ্বাস !
পরশিল মরম ভদ্রার।
দুই আঁখি ছল ছল চাহি শূন্য, কহিলেন,—
স্নেহময়ী মূর্ত্তি করুণার—
"আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার ?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয়, সে পুণ্য-পারাবার !"
"জয় ! সুভদ্রার জয় ! অর্জ্জুনমহিষী জয় !"—
কে গাইল বাঁশরীর স্বরে ?

সুলো। আ মলো ! কে কালামুখি ! "জয় সুলোচনা জয়"—
তোর বুঝি কণ্ঠে নাহি সরে ?
"জয় পাণ্ডবের জয় ! জয় কৌরবের জয় !"—
শুনে শুনে হাড় জ্বালাতন।
"জয় ! সুভদ্রার জয় !"—তাহার উপরে কেন
কাটা ঘায়ে নুণ বরিষণ।
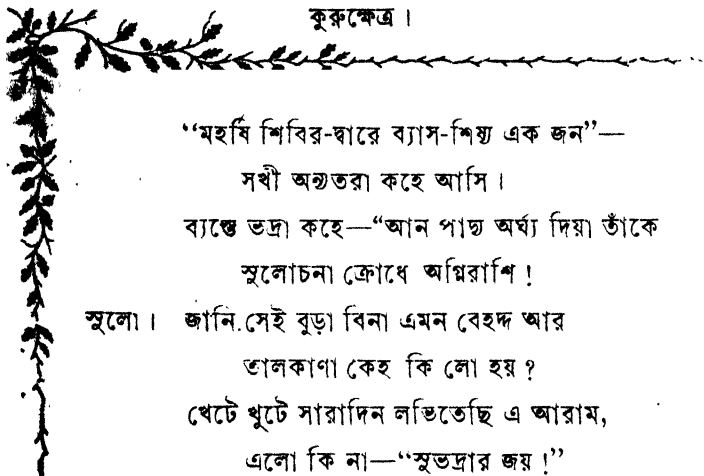
"মহর্ষি শিবির-দ্বারে ব্যাস-শিষ্য এক জন"—
সখী অন্যতরা কহে আসি।
ব্যস্তে ভদ্রা কহে—"আন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁকে
সুলোচনা ক্রোধে অগ্নিরাশি!
সুলো। জানি সেই বুড়া বিনা এমন বেহদ্দ আর
তালকাণা কেহ কি লো হয়?
খেটে খুটে সারাদিন লভিতেছি এ আরাম,
এলো কি না—"সুভদ্রার জয়!"
এখনই সে অদ্ভুত ঘট, পট, সর্ব্বভূত,
খোলা যাবে কত শাস্ত্র-হাঁড়ি।
যাই উত্তরার কাছে, হাসির তরঙ্গে তার
যদি ভূত নামাইতে পারি।
শিবির-দুয়াঁরে আহা! ও কি মূর্ত্তি মনোহর!
সখীর না চলিল চরণ।
নীলোৎপল প্রতিমায় জাগিতেছে যৌবনের
কি মধুর প্রথম স্বপন!
সুন্দর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি
সুকুমার দেহ মনোহর।
ললাটে চূড়ার মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি,
অমার্জ্জিত ধূলায় ধূসর।

সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে,
আকর্ণবিস্তৃত ছল্ ছল্।
ভাসিছে যুগল তারা, নীলিম প্রভাতাকাশে
দুই সুখতারা সমুজ্জ্বল।
কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে,
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহকথা
হৃদয়ের, ভাসিতেছে হায়!
প্রণমিতে পার্থ-প্রিয়া উঠিলে, নিবারি যুবা
কহিল,—কি কণ্ঠ সুকুমার!—
"যে ধর্ম্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্ত্তি তার,
দেবি! তুমি নমস্যা আমার।
যে ধর্ম্মের আত্মা কৃষ্ণ, বাহুবল ধনঞ্জয়,
জ্ঞানবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
দেহ যার মূর্ত্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি,
পুণ্যময়ী প্রেম-প্রস্রবণ,
এ পবিত্র মহাগীতা তার সুধাময়ী ভাষা,
আশীর্ব্বাদ সহ উপহার
বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে,
সুধাকরে সুধার ভাণ্ডার।

মানব-অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী,
গীতামৃত করি বিকীরণ,
সুশীতল জ্যোৎস্নায় জুড়াও, জগতারাধ্যে!
জগতের তাপিত জীবন!"
উদ্দেশেতে দ্বৈপায়নে প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী,
শিরে গ্রন্থ করিয়া ধারণ,
পার্শ্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখি শূন্যপানে চাহি
রহিলা বসিয়া শূন্যমন।
সুলোচনা চিত্রবৎ তপস্বীর ক্ষুদ্র মুখ
স্থিরনেত্রে রয়েছে চাহিয়া।
সেই তীব্র দৃষ্টিতলে, চাহি ধরণীর পানে
আছে যুবা সলজ্জ বসিয়া।
সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা,
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত,
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত!
বহুক্ষণ আত্মহারা বসি ভদ্রা ধীরে ধীরে
কহিলা মধুরে—"তপোধন
আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র
পুনর্ব্বার করি পদার্পণ।"
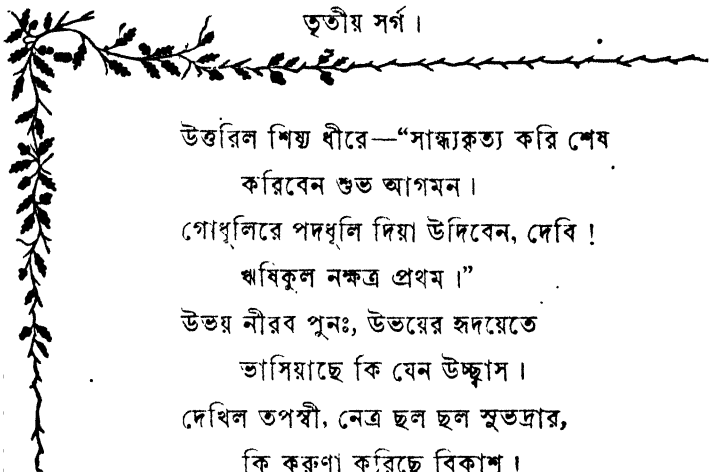
উত্তরিল শিষ্য ধীরে—"সান্ধ্যকৃত্য করি শেষ
করিবেন শুভ আগমন।
গোধূলিরে পদধূলি দিয়া উদিবেন, দেবি!
ঋষিকুল নক্ষত্র প্রথম।"
উভয় নীরব পুনঃ, উভয়ের হৃদয়েতে
ভাসিয়াছে কি যেন উচ্ছ্বাস।
দেখিল তপস্বী, নেত্র ছল ছল সুভদ্রার,
কি করুণা করিছে বিকাশ!
সরিল না কথা আর, বিদায় হইয়া যুবা
ধীরে ধীরে ত্যজিলে শিবির,
কহে সুলোচনা—"এর ঋষিপনা বল, ভদ্রা,
করি আমি এখনি বাহির।
এ যদি সে শৈল নহে, নাহি আমি সুলোচনা,
জানে ছুঁড়ি ছদ্মবেশ কত!
অপরাজিতার আহা! মরি! মরি! কি পুতুল!"
সুভদ্রা নীরব চিত্রমত।
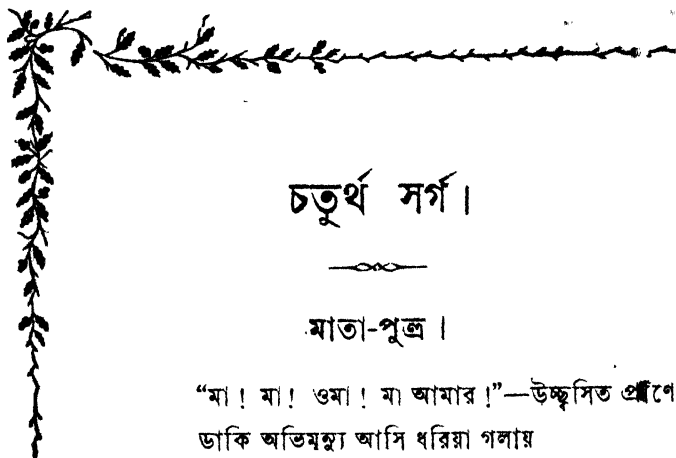
চতুর্থ সর্গ।

মাতা-পুত্র।

"মা! মা! ওমা! মা আমার!"—উচ্ছ্বসিত প্রাণে
ডাকি অভিমন্যু আসি ধরিয়া গলায়
জননীর, চাহি মার স্নেহ মুখ পানে,
রাখে মুখ মার বুকে ক্ষুদ্র শিশু প্রায়!—
উপাধানে অবসন্ন অঙ্গ আরোপিয়া
এখনো সুভদ্রা দেবী বসিয়া শিবিরে।
আনন্দে হৃদয়-নিধি হৃদয়ে লইয়া,
অসংখ্য চুম্বন স্নেহে বরষিলা শিরে।
আসি গরজিয়া মত্তা মাতঙ্গিনী মত
সুলোচনা ক্রোধভরে লইল কাড়িয়া
মাতৃ-বুক হ'তে পুত্র, মাতঙ্গিনী মত
কহিল কৃত্রিম ক্রোধে ঘন গরজিয়া—
"হাঁরে রে! কৃতঘ্ন ছেলে! উহারে না বলিতে মা
কতবার করিয়াছি মানা।

বল আমাকেই মা,—"মা" ! বল আরবার মা,—"মা !"
ডাক আরবার বলি মা,—"মা !"
আঁটিয়া ধরিয়া বুকে চুম্বি মুখ সুলোচনা
যত কহে, হাসি খল খল
তত ডাকে "মা" বলিয়া চাহি তার মুখ পানে
চারি চক্ষু স্নেহে ছল ছল !
"বল, নহে সুভদ্রা মা" উত্তর—"সুভদ্রা মা !"
পড়িল অমনি গালে চড়।
"বল, নহে সুভদ্রা মা !"— "সুভদ্রা আমার মা।"—
পুনঃ চড় স্নেহ-পুষ্পশর !

সুলো। হাঁরে ! কৃতঘ্নের ছেলে এই ধর্ম্ম তোর !
আমি পালিলাম, তুই পুত্র হলি ওর ?

অভি। আমার যুগল মাতা স্নেহ-নির্ঝরিণী,
তুই লো শূলীমা ! আর সুভদ্রাজননী।

সুলো। "শূলীমা ! শূলীমা !"—আচ্ছা আসুক এখন
তোর সে যুগল পিতা, নর-নারায়ণ !
কেমন শূলী রে আমি যাবে আজ জানা,
দেখি দু'জনের আছে কাণ কয়খানা।

অভি। গালি দিস্, তোরে নাহি মা ডাকিব আর।
আচ্ছা, সত্য কথা তবে বলি এইবার।

আমার যুগল মাতা, করুণার ছবি,
সুভদ্রা ও সুলোচনা—দেবী ও মানবী।
সুভদ্রা মায়ের স্নেহ স্বর্গ নিরমল,
সুলোচনা মার স্নেহ ধরণী শীতল।

সুলো। সারাদিন মড়া খেঁটে মরে ওই পোড়ামুখী,
তোরে নাহি দেখে একবার,
'দেবী মা' হইল রে সে, 'মানবী' হইনু আমি,
সে স্বর্গ লো; আমি মাটি ছার?

অভি। আমাকে দেখিতে, মা গো, আছে ত মা সুলোচনা,
হৃদয় স্নেহের পারাবার।
তাদের দেখিতে বল কে আছে মা! রণক্ষেত্রে?
তাদের মা জননী আমার।
সে দিন মা! রণক্ষেত্রে প্রখর রবির কর
জ্বলিতেছে মস্তক উপর।
জ্বলিছে প্রখরতর চারি দিকে যুদ্ধানল,
পিপাসায় হইনু কাতর।
সারথি আনিল বারি, আগ্রহে মা পানপাত্র
লইয়াছি করিবারে পান,
দেখিনু অদূরে মা গো! পড়িয়া সৈনিক এক
অস্ত্রাহত, কণ্ঠাগত-প্রাণ।
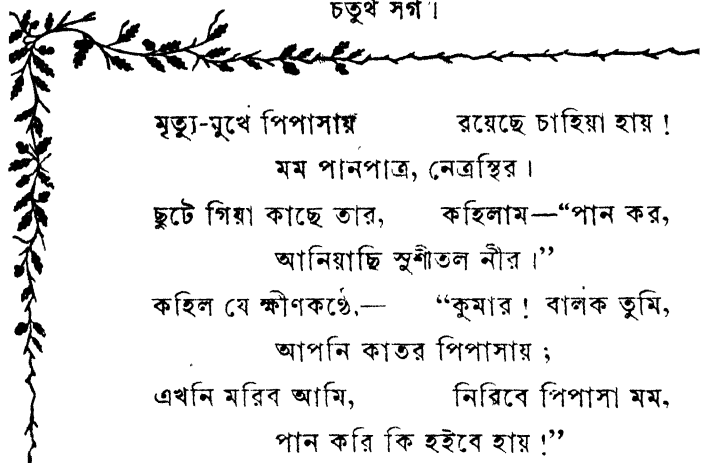
মৃত্যু-মুখে পিপাসায় রয়েছে চাহিয়া হায় !
মম পানপাত্র, নেত্রস্থির।
ছুটে গিয়া কাছে তার, কহিলাম—"পান কর,
আনিয়াছি সুশীতল নীর।"
কহিল যে ক্ষীণকণ্ঠে,— "কুমার ! বালক তুমি,
আপনি কাতর পিপাসায় ;
এখনি মরিব আমি, নিবিবে পিপাসা মম,
পান করি কি হইবে হায় !"
কাঁদিয়া তাহার শির রাখিয়া অঙ্কে আমার,
কহিলাম—"পিপাসা আমার
কিছু আর নাহি ভাই ! তুমি নাহি কর পান,
এই জল ছুঁইব না আর।"
বাম করে খুলি মুখ দিলাম ঢালিয়া বারি,
পান করি কহিল আবার,—
"এমন না হবে কেন, অভিমন্যু তুমি পুত্র
আমাদের মাতা সুভদ্রার।"
বহিল যুগল ধারা দু'নয়নে, দুই তারা
ক্রমে ক্রমে অপলক স্থির ;
মায়ের পবিত্র নাম থাকিতে অধর-প্রান্তে
বীর-স্বর্গে চলি গেল বীর।

"সেই জগতের মাতা আমার সুভদ্রামাতা"—
ছাড়ি গলা সুলোচনা মার,
গলায় মা সুভদ্রার পড়ি, কহে—"মা! মা! ওমা!
জগতজননী মা আমার!"
স্নেহভরা মুখখানি সুভদ্রা লইয়া বুকে
চুম্বিলেন আবার আবার,
কহিলেন,—"সত্য বৎস! তুচ্ছ ভদ্রা, সুলোচনা,
জগতজননী মা তোমার।
মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বুকে দেখিলা তাহার মুখে
পরিপূর্ণ অখিল সংসার,
ঢালিও এ প্রেমধারা, তখন দেখিবে মাতা
দুই নহে, অসংখ্য তোমার!"
ছয় চক্ষু ছল ছল যেন পুষ্প-পাত্রোৎপল!
কি সঙ্গীত জগত প্লাবিয়া
হৃদয়ের যন্ত্রে এবে বাজিতেছে এক তানে!
তিন জন রহিলা শুনিয়া!
"এ কি গ্রন্থ?"—কহে যুবা, ল'য়ে প্রসারিয়া কর,—
'ভগবদ্গীতা' কি মা! কবি কে?"
সুভ। মহর্ষিবর।
পড়িতে লাগিলা পুত্র হইয়া নিবিষ্টমন,
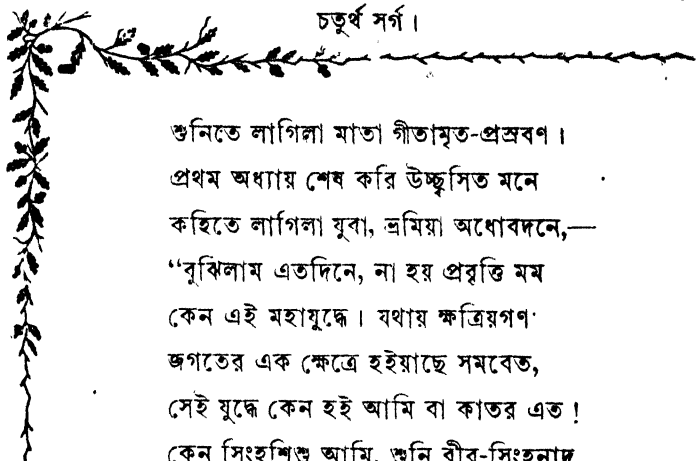
শুনিতে লাগিলা মাতা গীতামৃত-প্রস্রবণ।
প্রথম অধ্যায় শেষ করি উচ্ছ্বসিত মনে
কহিতে লাগিলা যুবা, ভ্রমিয়া অধোবদনে,—
"বুঝিলাম এতদিনে, না হয় প্রবৃত্তি মম
কেন এই মহাযুদ্ধে। যথায় ক্ষত্রিয়গণ
জগতের এক ক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত,
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত!
কেন সিংহশিশু আমি, শুনি বীর-সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম। পাছে হয় অপবাদ
কেন শুধু যন্ত্রগত করি যুদ্ধে যোগদান,
কেন শ্লথ করে আমি ছাড়ি লক্ষ্যহীন বাণ।

কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত;
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত।
'কি কায রাজ্যে, গোবিন্দ! কি কায ভোগে, জীবনে?
যাঁদের কারণ
'চাহি রাজ্য-ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে
ত্যজিতে জীবন।
'হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি,
হে মধুসূদন!
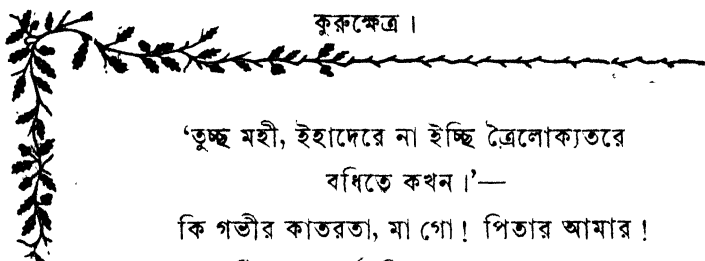
'তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে
বধিতে কখন।'—
কি গভীর কাতরতা, মা গো! পিতার আমার!
হৃদয় কি প্রেম-স্বর্গ, কিবা দয়া-পারাবার!
কি দেবহৃদয়ে! অহো! কি বাড়ব প্রস্রবণ!
কি প্রেম-সলিলে ভাসে কিবা বীর্য্য-হুতাশন!
কি ধর্ম্মভীরুতা সহ কিবা বীর-পৌরুষতা!
কি বীরত্ব-পারিজাতে কি স্নেহ-ত্রিদিবলতা!
পিতার এ ভাব যবে, মা গো! কি বিস্ময় তবে,
অযোগ্য পুত্রের তাঁর হৃদয়ে এ ভাব হবে?
হায় মা! তথাপি পিতা করুণহৃদয় মম,
কেন করিছেন বল এই মহাপাপ রণ?
স্বয়ং নারায়ণ কেন হইয়া সারথি তাঁর,
করিছেন এইরূপে সংহার মা! এ সংসার?
সুভ। ভক্তিভরে পড় বৎস! এই গ্রন্থ জ্ঞানাধার,
বুঝিবে রহস্য তুমি পাইবে উত্তর তার।
তখন বসিয়া যুবা লাগিলা অনন্যমনে
পড়িতে সে মহাগ্রন্থ, অতুলিত ত্রিভুবনে।
সুলোচনা কাছে বসি হাই তুলি কিছুক্ষণ,
চলি গেল ব্যাসদেবে করি মিষ্ট সম্ভাষণ।
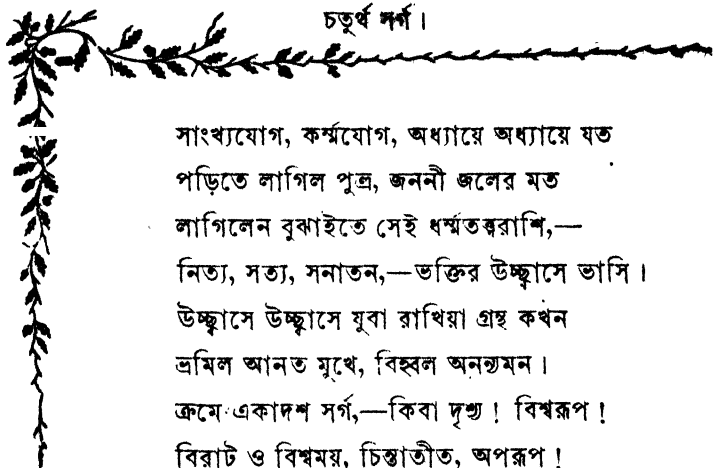
সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্ম্মতত্ত্বরাশি,—
নিত্য, সত্য, সনাতন,—ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি।
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে যুবা রাখিয়া গ্রন্থ কখন
ভ্রমিল আনত মুখে, বিহ্বল অনন্যমন।
ক্রমে একাদশ সর্গ,—কিবা দৃশ্য! বিশ্বরূপ!
বিরাট ও বিশ্বময়, চিন্তাতীত, অপরূপ!
সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত, পড়িয়াছে গ্রন্থ খসি,
চাহে শূন্য পানে যুবা বিস্মিত স্তম্ভিত বসি!

অভি। এক কৃষ্ণ রূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,
অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট পুরুষবর!
সংখ্যাতীত সৌর রাজ্য, চন্দ্র, তারা, প্রভাকর,
ঝলসি সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর!
সংখ্যাতীত ধূমকেতু, সৌর অগ্নি অস্ত্রমত,
অনন্ত পূরিয়া স্বনে ছুটিয়াছে অবিরত!
ছুটিয়াছে মহামন্দ্রে মেঘবৃন্দ অগণন
বিক্ষেপিয়া তাড়িতাস্ত্র ঘন বজ্র বিভীষণ!
গ্রহে গ্রহে বিধূনিত সংখ্যাতীত পারাবার,
বহিতেছে সংখ্যাতীত নদ নদী অনিবার।
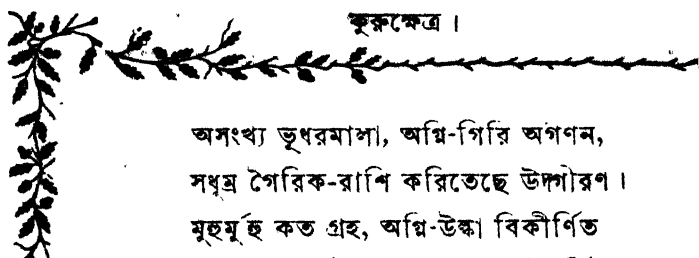
অসংখ্য ভূধরমালা, অগ্নি-গিরি অগণন,
সধূম্র গৈরিক-রাশি করিতেছে উদ্গারণ।
মুহুর্মুহু কত গ্রহ, অগ্নি-উল্কা বিকীর্ণিত
করিয়া, বিরাট শব্দে হইতেছে বিচূর্ণিত!
স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্ট, স্থিত, লীন দেহে, জলে জলবিম্ব মত।
অনন্ত করাল-মূর্ত্তি করিছে বিশ্ব সংহার,
উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার!
করুণানিধান কৃষ্ণ, মা গো! জগন্নাথ হরি,
কেন নাশিছেন বিশ্ব এ ভীষণ রূপ ধরি?

সুভ। অদ্বিতীয়, সর্ব্বময়, সর্ব্বভূত-মূলাধার
যদি বৎস! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তবে রূপ তাঁর।
জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস! সোপান দ্বিতীয় আর।
দেখিলে এ বিশ্বরাজ্য, অভিন্ন চেতনে জড়ে,
নির্ম্মম সংহার নিত্য সর্ব্বত্র নয়নে পড়ে।
নহে নির্দ্দয়তা, বৎস! ধ্বংসনীতি দয়াধার!
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!
রুদ্ধ কর ধ্বংসদ্বার; মুহূর্ত্তেতে জীবগণ
অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ

চতুর্থ সর্গ ।

দারুণ যন্ত্রণাভোগ ! মাগিবে দয়া মৃত্যুর
কাতরে, সলিল যথা মরু-দগ্ধ তৃষ্ণাতুর ।
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার অধর্ম্মের অভ্যুত্থান
করিবে, ভারত মত, জগত মহাশ্মশান ।
কৌরবের লোভ হ'তে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার,
ধ্বংস বিনা বল, বৎস ! আছে কি উপায় আর ?
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত ।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল ।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন ;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতিচক্রে বিচরণ ।
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা, সৃষ্টি তথা সংখ্যাতীত
হতেছে মুহূর্ত্তে, স্থিতি এরূপে হয় সাধিত ।
সর্ব্বভূতহিত তবে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয় ;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময় ।
ধ্বংসনীতি ধর্ম্মনীতি, ধ্বংসরূপী নারায়ণ ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, ধর্ম্মযুদ্ধ এই রণ ।
আবার আবার পুত্র পিতার সে মহাধ্যান
পড়িল বিহ্বল চিত্তে, আতঙ্কপূরিত প্রাণ ।

করি পাঠ সমাপন, শিবির-গবাক্ষপথে
চাহি আকাশের পানে রহিল, জ্ঞানের রথে
স্তম্ভিত বিস্মিতমন হইয়া যেন উত্থিত
কি অনন্তে, কি আলোকে গাম্ভীর্য্যে কল্পনাতীত,
হইল বিলীন ক্রমে ; ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে
মিশাইল বারিবিম্ব যেন মহাপারাবারে।
অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রমে, কক্ষে কক্ষে ধীরে ধীরে,
প্রবেশিল অভিমন্যু অপূর্ব্ব মহামন্দিরে—
অতল, অনন্ত-স্পর্শী ; পশি কক্ষে ঊর্দ্ধতম
দেখিল কি মহাদৃশ্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গম !
জাহ্নবী জড়প্রকৃতি চেতন পুরুষবক্ষে
মিলিয়াছে, মহাগীত উঠিতেছে কক্ষে কক্ষে,—
"আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু, ধনঞ্জয় !
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়।"
চাহি ঊর্দ্ধ পানে স্থির শুনিতেছে এই গীত
জ্ঞানস্বরূপিণী মাতা, কুমার প্রতিভান্বিত।
কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহে উভয়ের চক্ষে !
কি পূর্ণ আনন্দসিন্ধু উচ্ছ্বসিছে দুই বক্ষে !
প্রদোষ অস্ফুটালোক ধীরে ভক্তিভরে আসি,
এ আনন্দে, এ উচ্ছ্বাসে ঢালিছে গাম্ভীর্য্যরাশি !

কুমার অস্ফুটালোকে ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে শিবিরে, আনতশিরে।
জননী প্রফুল্লমুখে কহিলা প্রফুল্লস্বরে,—
ভাসিল পূরবী সান্ধ্য-সমীরে ভকতিভরে—
"বুঝিলে কি, অভিমন্যু!—অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।
কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত তাঁহার প্রকৃতি পায়;
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায়।
এইরূপে চরাচর জন্মি জন্মি হয় লয়;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বৎস! এরূপে সাধিত হয়।
'যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহাবায়ু
করে অবস্থান,'
সেইরূপে সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত,—
তিনি ভগবান।
নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত
আকাশ যেমন,
সর্ব্বদেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা
নির্লিপ্ত তেমন।
নরের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল কদাচিত
না সৃজেন বিভু, জীব স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত।
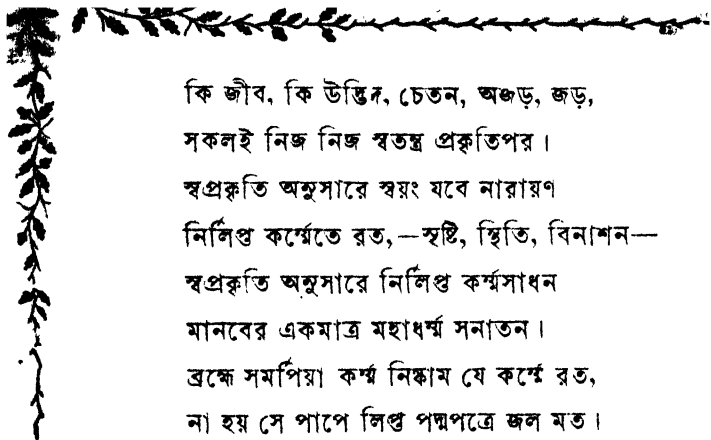
কি জীব, কি উদ্ভিদ, চেতন, অজড়, জড়,
সকলই নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর।
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বয়ং যবে নারায়ণ
নির্লিপ্ত কর্ম্মেতে রত,—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন—
স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্ম্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম্ম সনাতন।
ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত।
সর্ব্বভূতস্থিত ব্রহ্ম; সাধ সর্ব্বভূত-হিত,
হইবে তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত।
জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দুহিত,
জগতের হিত, বৎস! তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত,
জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম্ম কর পালন,
এইরূপে কর্ম্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।
ফলিয়া অনন্ত তরু, বরষিয়া মেঘদল,
সাধিছে কি স্বার্থ? বিশ্ব আদর্শ নিষ্কামস্থল!
আপন প্রকৃতি মতে ফলে তরু, বর্ষে ঘন,
জগতের হিতে সাধি স্বধর্ম্ম মোক্ষ পরম।

বীরত্বপ্রকৃতি তব, স্বধর্ম্ম যুদ্ধ তোমার ;
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।
সুখে দুঃখে অনাসক্ত, লাভালাভে জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি, বৎস! যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
বুঝিলে কি অভিমন্যু! গীতামৃত করি পান,—
নিবারিতে ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ;
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন ;
স্থাপন করিতে বৎস! জগতে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য,—
এই মহারণ ?"
"বুঝিলাম,"—জননীর পদতলে পড়ি
কহে গলদশ্রু যুবা,—"বুঝিনু আমার
মাতা দেবী, পিতা দেব, মামা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মা গো! পুত্র নরাধম!
বুঝিলাম ক্ষুদ্র শুক্তি জন্মে রত্নাকরে ;
কুফল অশ্বত্থে, বটে ; তৃণ মহীধরে।
দিলে আজি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্ঠতর,
শিরে দিয়া দুই হাত আশীর্ব্বাদ কর,—
স্বধর্ম্ম পালনে মা গো! করি প্রাণদান,
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।"

দেব পুত্রে দেবী মাতা লইয়া হৃদয়ে
অশ্রুমুখী, চুম্বি সেই সিক্ত কুবলয়ে,
কহিলা উচ্ছ্বাস-কণ্ঠে ভকতিপূরিত,
মাতৃ-স্নেহে দুই ধারা করি বিগলিত—
"লও আশীর্ব্বাদ—করি স্বধর্ম্মপালন,
গীতা সাম্রাজ্য কর্ জগতে স্থাপন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, অর্জ্জুনতনয়,
তোর মাতা,—হ'ক মম এই পরিচয়।'
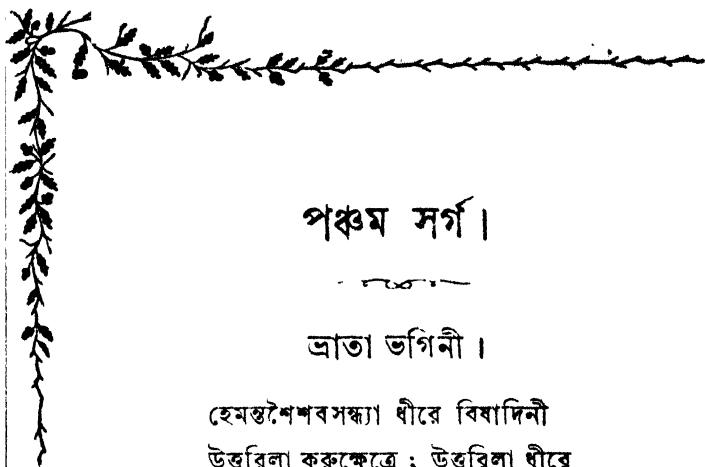
পঞ্চম সর্গ।

ভ্রাতা ভগিনী।

হেমন্তশৈশবসন্ধ্যা ধীরে বিষাদিনী
উত্তরিলা কুরুক্ষেত্রে ; উত্তরিলা ধীরে
অদূর দক্ষিণারণ্যে, বসিয়া যথায়
সন্ন্যাসিনী জরৎকারু সন্ধ্যাস্বরূপিণী।
অপরাহ্ণ হ'তে বামা বসি একাকিনী
বনপ্রান্তে, দূর পথ চাহি অবিরাম,
কহিল—"গিয়াছে আশা। এইরূপে হায়!
যাইবে জীবন কি লো? সূর্য্য অস্তমিত ;—
যেই সন্ধ্যা-ছায়া হায়! ভাসিতেছে এবে
জীবনে এ দুঃখিনীর, নিবিড় নিশীথে
তাও অভাগিনীর কি হবে পরিণত?
রমণীর সুখসূর্য্য, রমণীর প্রেম,
ডুবিয়াছে বহুদিন। হয় ত উদয়
অস্তরবি, অস্তপ্রেম ফিরে না কি আর?
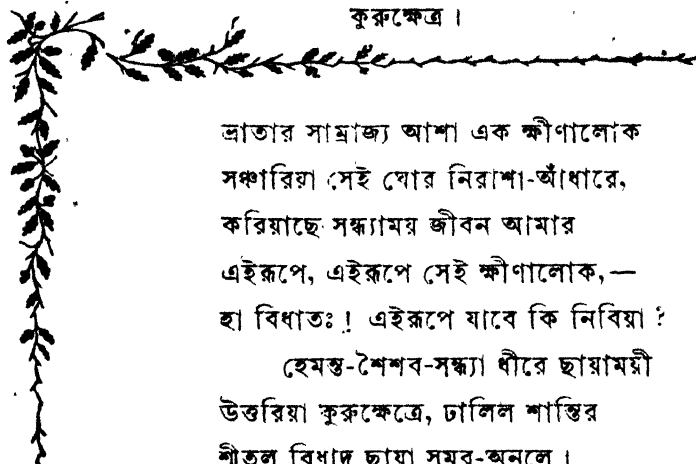
ভ্রাতার সাম্রাজ্য আশা এক ক্ষীণালোক
সঞ্চারিয়া সেই ঘোর নিরাশা-আঁধারে,
করিয়াছে সন্ধ্যাময় জীবন আমার
এইরূপে, এইরূপে সেই ক্ষীণালোক,—
হা বিধাতঃ! এইরূপে যাবে কি নিবিয়া?

হেমন্ত-শৈশব-সন্ধ্যা ধীরে ছায়াময়ী
উত্তরিয়া কুরুক্ষেত্রে, ঢালিল শান্তির
শীতল বিষাদ ছায়া সমর-অনলে।
দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল;
দিবসের শেষ মৃত চুম্বিল ভূতল;
শেষ সিংহনাদ, শেষ কোদণ্ডটঙ্কার,
মিশাইল সন্ধ্যানিলে। শেষ শঙ্খনাদে
দিবসের রণ-শান্তি ঘোষিয়া গম্ভীরে,
যোদ্ধাগণ দুই স্রোতে চলিল শিবিরে,—
অনন্ত বলাকামালা দুই স্রোতে যেন
চলিল কাকলীকণ্ঠে প্লাবিয়া গগণ;
দুই প্রতিকূলানিলে চলিল ছুটিয়া
ফেনিল তরঙ্গমালা মহাপারাবারে।
নিবিল ঝটিকা,—ঘোর শঙ্খের নিনাদ,
সমর-নির্ঘোষ,—মত্ত জলধি উচ্ছ্বাস,
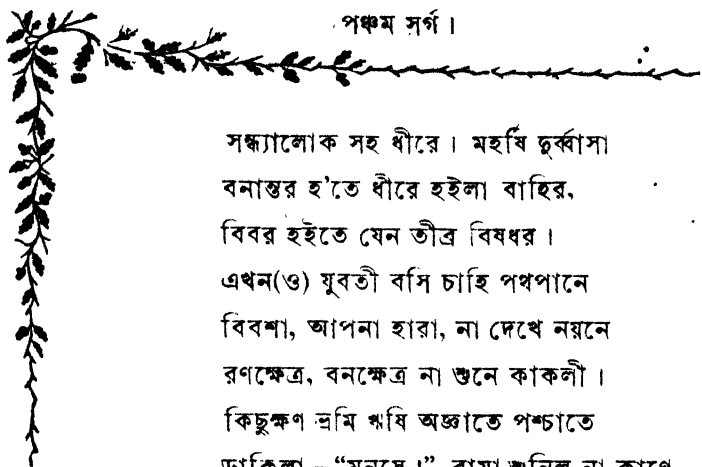
সন্ধ্যালোক সহ ধীরে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা
বনান্তর হ'তে ধীরে হইলা বাহির,
বিবর হইতে যেন তীব্র বিষধর।
এখন(ও) যুবতী বসি চাহি পথপানে
বিবশা, আপনা হারা, না দেখে নয়নে
রণক্ষেত্র, বনক্ষেত্র না শুনে কাকলী।
কিছুক্ষণ ভ্রমি ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
ডাকিলা—"মনসে!" বামা শুনিল না কাণে,
চিত্রিত প্রতিমা মত রহিল বসিয়া।
"পাপীয়সি!"—স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা
দেখিল ফিরিয়া ঋষি। "পাপী-পাপীয়সি।"—
ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর,
—"নিয়ত আমায় তুচ্ছ! নিয়ত এখানে
থাকিস্ বসিয়া; নিত্য একই ভাবনা!"
কাতরে কহিল কারু,—"সংসার-বন্ধন
একে একে হায়! প্রভো! ছিঁড়েছি সকল;'
—মুখ ফিরাইয়া পুনঃ চাহি পথপানে.—
"একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব। স্নেহ-পারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার। সেই এক বৃন্তে.

শুষ্ক ফল সম এই হৃদয় আমার
ঝুলিছে সংসার-বৃক্ষে ; কাটিও না তারে,
শুষ্ক ফল হায়! প্রভু! পড়িবে ঝরিয়া।
জগতে এমন ভাই কোথা আছে আর?
শৈশবে এ অভাগীরে গেলেন ছাড়িয়া
জনক জননী। হায়! পিতৃব্যভগিনী—
বিশ্বাসঘাতিনী শৈল! হারা'ল শৈশবে
জনক জননী তার। দুইটি বালিকা
বন বল্লরীর মত পালিলা আদরে
অঙ্গে অঙ্গ জড়াইয়া, অঙ্গ মিশাইয়া,
কল্পতরু নাগরাজ। প্রভু! আমাদের
নাগরাজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা সহচর।
শুনিয়াছি মহাবনে আছে তরুবর,
কঠিন কঠোর দেহ, হৃদয় তাহার
দুগ্ধে ভরা, সেই তরু মম সহোদর,—
শিলারোধে অবরুদ্ধ স্নেহের সাগর।
মুখে মুখে বুকে বুকে অনাথা দু'জনে
বিহঙ্গ শাবক মত করিলা পালন
কত দুঃখে, কত স্নেহে; কতই আদরে
শিখা'লেন অস্ত্রবিদ্যা, শিল্প, ও সঙ্গীত।
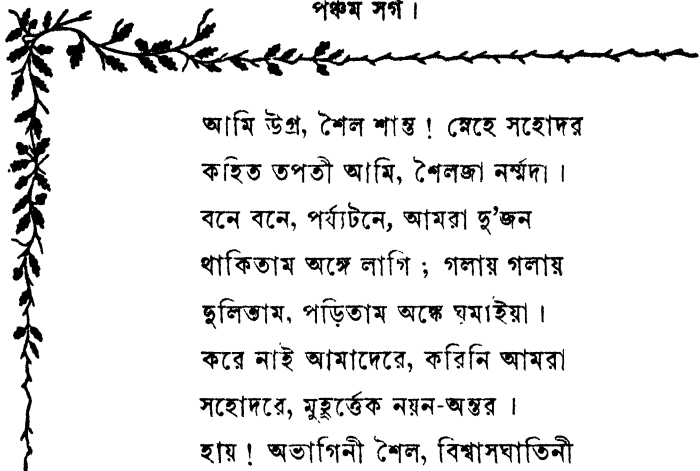
আমি উগ্র, শৈল শান্ত! স্নেহে সহোদর
কহিত তপতী আমি, শৈলজা নর্ম্মদা।
বনে বনে, পর্য্যটনে, আমরা দু'জন
থাকিতাম অঙ্গে লাগি; গলায় গলায়
দুলিতাম, পড়িতাম অঙ্কে ঘুমাইয়া।
করে নাই আমাদেরে, করিনি আমরা
সহোদরে, মুহূর্ত্তেক নয়ন-অন্তর।
হায়! অভাগিনী শৈল, বিশ্বাসঘাতিনী
পুড়ি মনস্তাপানলে,—জগতে এমন
নাহি বুঝি দুঃখ আর!—ছাড়ি মর্ত্ত্যলোক,
ওই বুঝি আকাশেতে রয়েছে ফুটিয়া
সেই ক্ষুদ্র স্নেহফুল! এই দীর্ঘকাল
নাহি জানি ভাই কোথা।"

কাঁদিল রমণী,

দর দর দুই ধারা বহিল নয়নে।

দুর্ব্বাসা। পতিচিন্তা, একমাত্র সতী রমণীর
মহাধর্ম্ম, অন্য চিন্তা মহাপাপ তার।
নারীর আবার কে বা পিতা, মাতা, ভ্রাতা?
তাহার সর্ব্বস্ব স্বামী। বিবাহের সনে
ছাড়ি পিতৃকুল, পতিকুলেতে স্থাপিত

হয় অরুন্ধতী মত। হ'লে বৃক্ষান্তর,
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার?
"ভ্রাতার সাম্রাজ্য-সাধ যাক্ রসাতলে।
ইচ্ছা—এই দণ্ডে পোড়া যজ্ঞকাষ্ঠখানি
ভাঙ্গি ঝড়রূপ ধরি, করি খণ্ড খণ্ড
কুঠারে অস্থিপঞ্জর"—কহিয়া স্বগত,
কহিল কাতর-কণ্ঠে শিহরি রমণী—
"শিব! শিব! একি কথা! ইহা যদি, প্রভু!
নারীধর্ম্ম আর্য্যদের, অনার্য্যা এ দাসী
পারিবে না তাহা কভু করিতে পালন।
বিবাহের পরে থাকি অনার্য্যা আমরা
পিতৃবাসে, পিতৃকোলে, জননীর বুকে,
ভ্রাতা ভগ্নীগণ সঙ্গে গলায় গলায়।
ছাড়ি সেই স্বর্গ, ছাড়ি পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ছিন্ন করি সে অনন্ত স্নেহের বন্ধন,
বাঁচিতে অনার্য্যা লতা পারে না কখন।
মানব-হৃদয় সিন্ধুনদ শতমুখ;—
কত আশা, কত তৃষা, কত ভালবাসা!
অবরুদ্ধ সর্ব্বস্রোত মম হৃদয়ের।
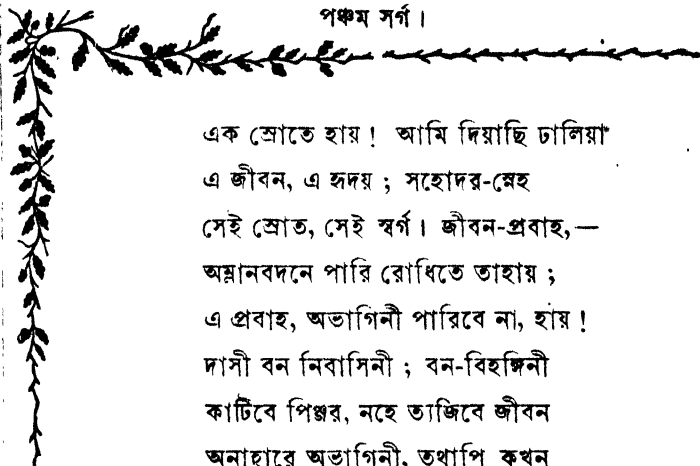
এক স্রোতে হায়! আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন, এ হৃদয়; সহোদর-স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ। জীবন-প্রবাহ,—
অম্লানবদনে পারি রোধিতে তাহায়;
এ প্রবাহ, অভাগিনী পারিবে না, হায়!
দাসী বন নিবাসিনী; বন-বিহঙ্গিনী
কাটিবে পিঞ্জর, নহে ত্যজিবে জীবন
অনাহারে অভাগিনী, তথাপি কখন
কাটিবে না স্নেহময়ী স্নেহের বন্ধন।
ওকি দেখা যায় ওই! আসিলা আমার
ওই বুঝি দাদা! ওই!—দাদা! দাদা! দাদা!"
যেমতি পিঞ্জর-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী,
ছুটিয়া রমণী বেগে আনন্দে অধীরা,
পড়িল বাসুকি বক্ষে। গলা জড়াইয়া
কহিল কাঁদিয়া—"দাদা! ছাড়িয়া আমারে
কেমনে রহিলে তুমি বল এত দিন?
তুমি বিনা এ জগতে কি আছে আমার?"
উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে চুম্বিয়া আদরে,
কহিলা বাসুকি, নেত্র স্নেহে ছল ছল,—
"কারু! কারু! পাগলিনি! আসিতে আমার

হইল বিলম্ব কিছু ; ছিলাম ব্যাপৃত
নানা কার্য্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া,
কেবল দেখিতে তোরে, লইতে রে বুকে
কোমল মু'খানি তোর ; জুড়া'তে জীবন,—
দুরাকাঙ্ক্ষা মরীচিকা,—তোর স্নেহাসারে।
না দেখি আমারে তোর যত কাঁদে প্রাণ,
কাঁদে মম ততোধিক ; সংসার-মরুতে
একমাত্র তুই মম স্নেহ-মন্দাকিনী।”
আবার আবার স্নেহে চুম্বিয়া বদন,
স্নাত ফুল্ল নীলোৎপল, জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
“কেমন আছিলি কহ।”

উত্তরিল হাসি
ধীরে অধোমুখী বামা—“আছিলাম,—আছি
আশ্রিত পাদপ-চ্যুত লতিকার মত।
ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লতিকার,
পদাঘাতে বিদলিত ; মরে না তথাপি,
স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি।”
“নরাধম! দুরাচার!”—লৌহ দৃঢ়তম
আঘাতিল শিলা দৃঢ়! অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
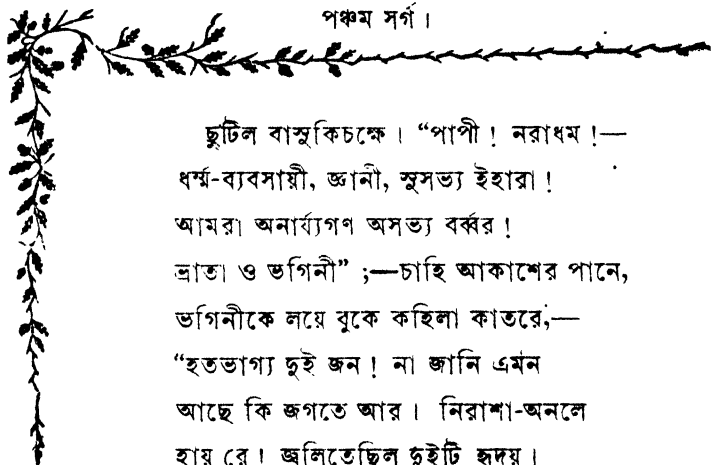
ছুটিল বাসুকিচক্ষে। "পাপী! নরাধম!—
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, জ্ঞানী, সুসভ্য ইহারা!
আমরা অনার্য্যগণ অসভ্য বর্ব্বর!
ভ্রাতা ও ভগিনী";—চাহি আকাশের পানে,
ভগিনীকে লয়ে বুকে কহিলা কাতরে,—
"হতভাগ্য দুই জন! না জানি এমন
আছে কি জগতে আর। নিরাশা-অনলে
হায় রে! জ্বলিতেছিল দুইটি হৃদয়।
ডুবিনু আপনি, আর ডুবাইনু তোরে,
অনার্য্যের রাজ্যোদ্ধার দুরাশা-সাগরে,
নিবাইতে সেই জ্বালা,—সে ভীষণ জ্বালা
রাজ্যলাভে পারে যদি, পারি নিবাইতে!—
হায়! যদি রণরঙ্গে, শত্রুর শোণিতে,
প্রতিহিংসা-সুরামৃতে নিবে রে সে জ্বালা!
বুঝিলাম আশা-মত্ত আমরা দুজন।
অন্যথা বাসুকি তোর তিল সুখ তরে,
তুচ্ছ কথা ধরারাজ্য, সুররাজ্য পারে
ফেলিতে চরণে ঠেলি অম্লান বদনে।
কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর নিগ্রহ!
হা বিধাতঃ! বাসুকির স্নেহের মৃণালে

একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে,
ফুটিল, তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি!
ফেলিলে আনায়ে এই বনের শার্দ্দূল,
করিলে নির্ব্বীর্য্য হেন, রয়েছে চাহিয়া
ভগিনীর অপমান!"—
বহিল নয়নে,
বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী মেঘে, সলিলের ধারা।
কাতরে কহিল কারু,—"এ কি কথা, দাদা!
বাস্থকির ভগ্নী আমি, নাগেন্দ্রনন্দিনী,
কি সাধ্য একটি দীন ঋষি দুরাচার
করে মম অপমান? একটি পতঙ্গ
কি সাধ্য নিগ্রহ, দাদা! করে সিংহিনীর?
একটি কমল ক্ষুদ্র তুলিতে কণ্টক
জান ত সহিতে হয়। সামান্য নিগ্রহ
সহিতে না পারি যদি, বীরেন্দ্র! কেমনে
একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার?"
দাঁড়াইয়া ঋষিবর দেখিতেছিলেন
এই দৃশ্য, ভাবিতেছিলেন, মনে মনে—
"সংসারবন্ধন যদি মোহের বন্ধন,
মোহ তবে কি মধুর! কি স্বর্গ সুন্দর,—
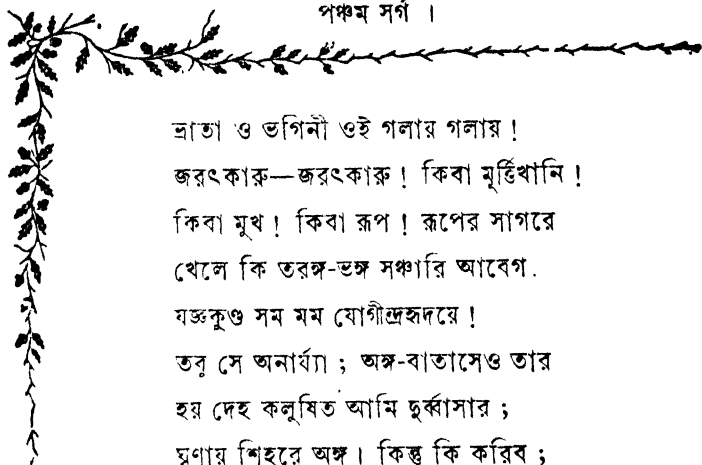
ভ্রাতা ও ভগিনী ওই গলায় গলায় !
জরৎকারু—জরৎকারু ! কিবা মূর্ত্তিখানি !
কিবা মুখ ! কিবা রূপ ! রূপের সাগরে
খেলে কি তরঙ্গ-ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ.
যজ্ঞকুণ্ড সম মম যোগীন্দ্রহৃদয়ে !
তবু সে অনার্য্যা ; অঙ্গ-বাতাসেও তার
হয় দেহ কলুষিত আমি দুর্ব্বাসার ;
ঘৃণায় শিহরে অঙ্গ । কিন্তু কি করিব ;
ব্রাহ্মণের আধিপত্য রক্ষিত বর্দ্ধিত
করিতে লয়েছি ব্রত । তার উদ্‌যাপন
না হইবে যত দিন, হইবে সহিতে
অনার্য্য-সংসর্গ-পাপ, এই বিড়ম্বনা ।”

প্রণমিল নাগরাজ । আশীষিয়া ঋষি
জিজ্ঞাসিলা—“কহ, শুনি শুভ সমাচার ।”
উত্তরিলা নাগরাজ ছাড়িয়া নিশ্বাস—
“অসংখ্য অনার্য্য জাতি হইবে গ্রথিত
একতার সূত্রে, ঋষি ! অসম্ভব কথা ।
দুই চারি জন যদি হয় অগ্রসর,
দুই চারি শত যায় পশ্চাৎ সরিয়া ।
অসংখ্য নক্ষত্রাবলি ওই আকাশের
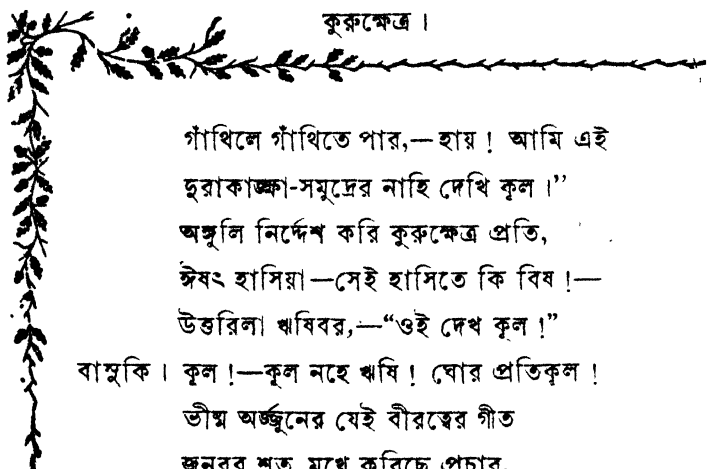
গাঁথিলে গাঁথিতে পার,—হায়! আমি এই
দুরাকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রের নাহি দেখি কূল।"
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কুরুক্ষেত্র প্রতি,
ঈষৎ হাসিয়া—সেই হাসিতে কি বিষ!—
উত্তরিলা ঋষিবর,—"ওই দেখ কূল!"

বাসুকি। কূল!—কূল নহে ঋষি! ঘোর প্রতিকূল!
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যেই বীরত্বের গীত
জনরব শত মুখে করিছে প্রচার,
প্লাবিয়া ভারতভূমি পশিয়াছে বনে
সে অপূর্ব্ব বীর-গাথা। করেছে সঞ্চার
কি যে ত্রাস হৃদয়েতে বনপুত্রদের
কহিতে না পারি আমি। জিজ্ঞাসে সকলে—
'কে ধরিবে অস্ত্র বল ইহাদের আগে?
আছি ভাল সুশীতল কানন ছায়ায়।
মাতা বনদেবী-অঙ্কে জ্বালি দাবানল,
কি ফল লভিব বল পুড়িয়া, মরিয়া?'

দুর্ব্বাসা। জরুৎকারু ঋষিশ্রেষ্ঠ যথা যজ্ঞাগারে
কাষ্ঠের অগ্নিতে কাষ্ঠ করে ভস্মীভূত,
ক্ষত্রিয়-অগ্নিতে তথা সমগ্র ক্ষত্রিয়
পোড়াইছে এই দেখ! আশু দাবানল
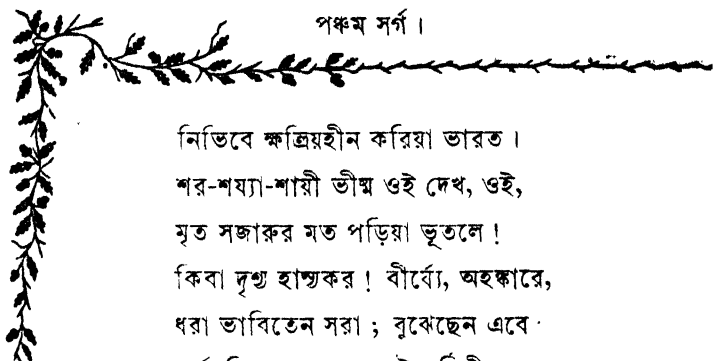
নিভিবে ক্ষত্রিয়হীন করিয়া ভারত।
শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্ম ওই দেখ, ওই,
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে!
কিবা দৃশ্য হাস্যকর! বীর্য্যে, অহঙ্কারে,
ধরা ভাবিতেন সরা; বুঝেছেন এবে
সার্দ্ধ তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিবীর
হয়েছে গর্ব্বিত শৌর্য্য বীর্য্য পরিমিত,—
ভীষ্ম ও ভীরুর শেষে এক পরিমাণ!
ওই ষণ্ড, রাজসূয় যজ্ঞে মহাদর্পে
বাড়াইয়া গোপসুতে করিল প্রহার
ব্রাহ্মণের শিরে অসি। বিধর্ম্মী পামর
প্রাণভয়ে অর্জ্জুনের সাজিয়া সারথি,
উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছে তাঁহার,—
ওই ভীষ্মদেব, পড়ি মণ্ডূকের মত!

বীরত্বের এ বিদ্রূপে অঙ্গ বাসুকির
উঠিল জ্বলিয়া ক্রোধে—"যজ্ঞব্যবসায়ী
কাপুরুষ তুমি ঋষি; বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ; এই বীরত্বের
কেমনে বুঝিবে তুমি অতুল মহিমা,—
মুষিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গৌরব?
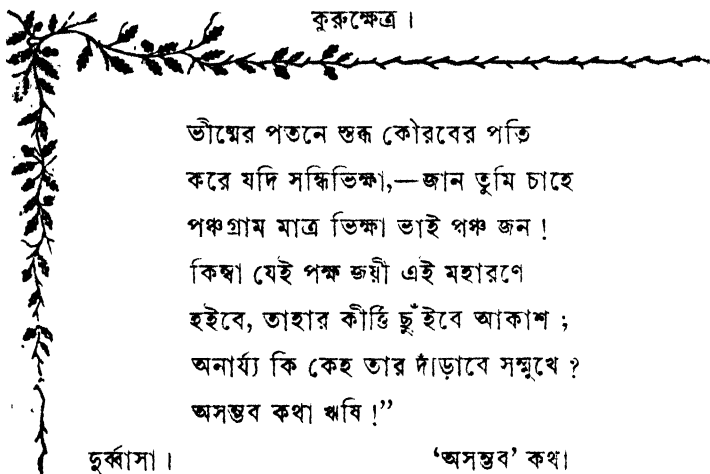
ভীষ্মের পতনে স্তব্ধ কৌরবের পতি
করে যদি সন্ধিভিক্ষা,—জান তুমি চাহে
পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা ভাই পঞ্চ জন!
কিম্বা যেই পক্ষ জয়ী এই মহারণে
হইবে, তাহার কীর্ত্তি ছুঁইবে আকাশ;
অনার্য্য কি কেহ তার দাঁড়াবে সম্মুখে?
অসম্ভব কথা ঋষি!”

দুর্ব্বাসা। 'অসম্ভব' কথা
জরৎকারু মহর্ষির নাহি অভিধানে।
না হইতে প্রভাকর উদয় আবার,
ক্ষত্রিয়-অদৃষ্ট-গ্রহ যোগবলে আমি
ফিরাইব যেই মতে হেলা'য়ে তর্জ্জনী,
নিশ্চয় হইবে তাহে সন্ধি অসম্ভব,
ভস্মিবে উভয় পক্ষ শিমূলের মত।
জয়ী পক্ষ এই রণে, বাসুকি! আমরা!
নীরবে চিন্তিয়া ঋষি কহে অধোমুখে—
“কর্ণের শিবিরে গিয়া কহিবে গোপনে
নাগেন্দ্র! আসিতে হেথা গভীর নিশীথে।”

জরৎকা। না, দাদা! একে ত ক্লান্ত হইয়াছ তুমি
দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে। অবসন্ন দেহ

কাতরে মাগিছে শ্রান্তি, পড়িছে ভাঙ্গি
মূলশূন্য তরু যেন। তাহাতে তোমায়
দেখে যদি কোন জন, চিনে যদি কেহ,
হইবে শত্রুর মনে সন্দেহ বিষম।
মহা-অন্ধকারে নাহি পারে লুকাইতে
মহীরুহ, ক্ষুদ্র লতা অলক্ষিতা সদা।
নহে তুমি, যাব আমি।
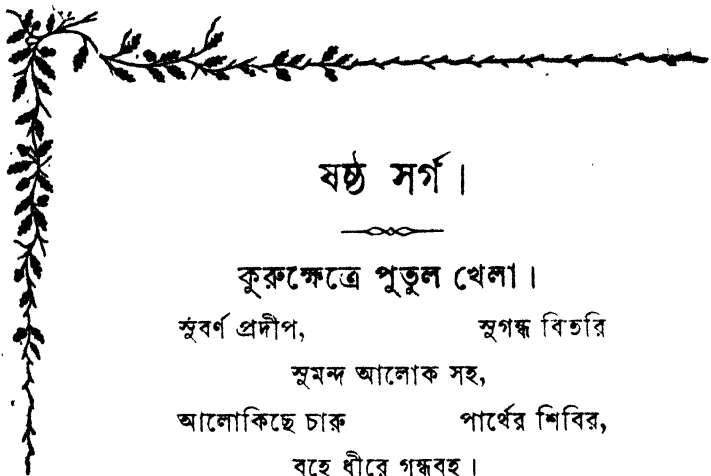
ষষ্ঠ সর্গ।

কুরুক্ষেত্রে পুতুল খেলা।

সুবর্ণ প্রদীপ, সুগন্ধ বিতরি
সুমন্দ আলোক সহ,
আলোকিছে চারু পার্থের শিবির,
বহে ধীরে গন্ধবহ।

দুই পর্য্যঙ্কেতে, শুয়ে দুই জন—
ধনঞ্জয়, জনার্দ্দন।
সুভদ্রা কৃষ্ণের, উত্তরা পার্থের,
ঔষধ অঙ্গে লেপন

করিছে আদরে,— বিষাদিত মুখ
মেঘমাখা চন্দ্র যথা।
কহিছেন হর্ষে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জ্জুন
দিবসের রণ-কথা।

উত্তরা না শুনে সেই বীর-গাথা
তা'তে তার নাহি প্রীতি,
নীরবে তাহার নয়নের ধারা
পড়িছে কপোল তিতি।—
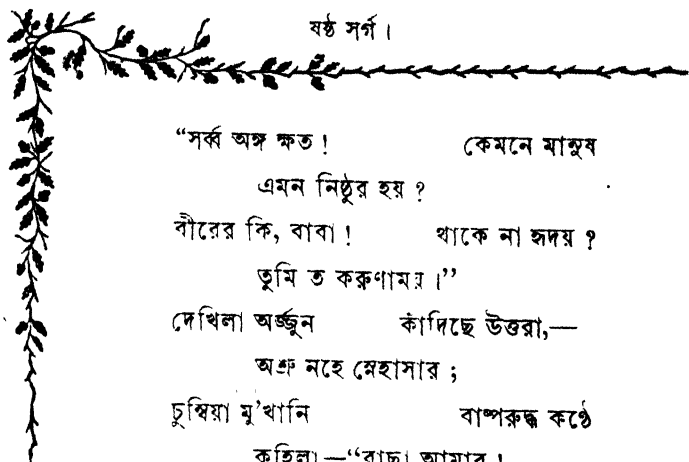
"সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষত! কেমনে মানুষ
এমন নিষ্ঠুর হয়?
বীরের কি, বাবা! থাকে না হৃদয়?
তুমি ত করুণাময়।"
দেখিলা অর্জ্জুন কাঁদিছে উত্তরা,—
অশ্রু নহে স্নেহাসার;
চুম্বিয়া মু'খানি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে
কহিলা—"বাছা আমার!
বীর-ধর্ম্ম যুদ্ধ, এ ত আর তোর্
নহে পুতুলের রণ।
বীর-বালা তুই, দেখি অস্ত্র-লেখা
কাতরা কেন এমন?"

"না না বাবা! আমি না পারি বুঝিতে,
পোড়া বীর-ধর্ম্ম ছাই
সংসার ছাড়িয়া যা'ক্ যমপুরে
লইয়া সব বালাই।
একটি কণ্টক চরণে তোমার
ফুটিলে উত্তরা তব
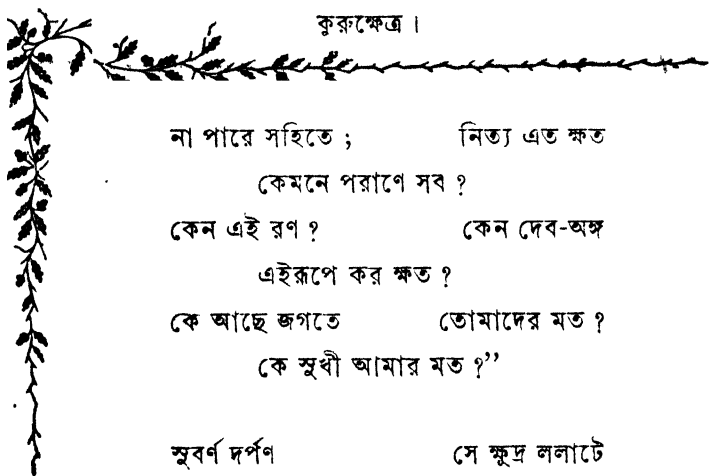
না পারে সহিতে ; নিত্য এত ক্ষত
কেমনে পরাণে সব ?
কেন এই রণ ? কেন দেব-অঙ্গ
এইরূপে কর ক্ষত ?
কে আছে জগতে তোমাদের মত ?
কে সুখী আমার মত ?"

সুবর্ণ দর্পণ সে ক্ষুদ্র ললাটে
আদরে বুলায়ে কর,
কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া ধীরে,
উত্তরিলা বীরবর—
"পিতৃরাজ্য বাছা ! করিব উদ্ধার,
'রাজা হবে অভি মম ;
তুই হবি রাণী বসি বামে তার,
ইন্দ্রপাশে শচী সম !"

অধোমুখী বামা, কণ্ঠ ছল ছল,
কহিল বীণার স্বরে
কণ্ঠমূৰ্চ্ছনায় নারী-হৃদয়ের
অমৃত বর্ষণ ক'রে—
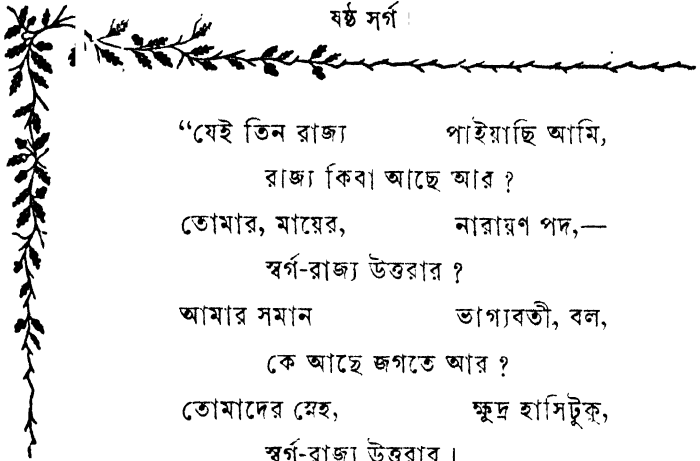
"যেই তিন রাজ্য পাইয়াছি আমি,
রাজ্য কিবা আছে আর ?
তোমার, মায়ের, নারায়ণ পদ,—
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার ?
আমার সমান ভাগ্যবতী, বল,
কে আছে জগতে আর ?
তোমাদের স্নেহ, ক্ষুদ্র হাসিটুকু,
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার।
এ পোড়া ধরার রাজ্যে কিবা সুখ ?
নিত্য এই কাটাকাটি ;
কে কারে মারিয়া কে কারে খাইবে,—
এ সংসার কান্নাহাটি।
করে পুত্রহীনা মাতা হাহাকার,
পতিহীনা কত নারী
কাঁদিছে অনাথ শিশু ল'য়ে বুকে,—
প্রাণে না সহিতে পারি!
এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই বনে,
বাঁধিয়া কুটীর ঘর,
তোমাদের পদ সেবিবে উত্তরা,—
সে রাজ্য কি সুখকর।"

পার্থ, কেশবের, মাতা সুভদ্রার,
ছয় চক্ষু ছল ছল ;
অর্জ্জুন আবার চুম্বিয়া উচ্ছ্বাসে
বিষণ্ণ ফুল্ল কমল।
ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া হৃদয়ে,
—নীলাকাশে যেন তারা,—
গদ গদ কণ্ঠে কহিলা অর্জ্জুন
উচ্ছ্বাসে আপনাহারা—
"আশীর্ব্বাদ করি,— এ কৌরব-কুল
মহা হিমাচল সম,
শোভে শিরে যেন বীরত্ব-কৈলাস
বাছা অভিমন্যু মম!
তুই মা আমার যাইবি বহিয়া,
জননী জাহ্নবী জিনি,
সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত,
করুণার মন্দাকিনী!
আমার মতন নির্ম্মম পাষাণ,
হয় যেন মুক্ত স্নেহেতে তোর!
তোর স্নেহমুখ চাহিয়া চাহিয়া
জীবনের স্বপ্ন হয় মা! ভোর!"

সকলি নীরব ; কি যেন কি স্বর্গ,—
জোছনার স্বপ্ন প্রায় !
কেবল সে স্বর্গে অনন্ত করুণা
উছলি উছলি ধায়।
ভাবিলেন কৃষ্ণ— "ধর্ম্ম শাস্ত্ররাশি
কি ছাই ঘাঁটিয়া মরি !
সরলা বালার পবিত্র হৃদয়ে
কি স্বর্গ দর্শন করি !
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত রমণী-হৃদয়
যে স্বর্গে লইয়া যায়,
কত সাধনায় ধর্ম্মশাস্ত্র তার
ছায়া মাত্র দেখে, হায় !"
জিজ্ঞাসিলা ভদ্রা— "দাদা ! জ্ঞানযোগ,
কর্ম্মযোগ, কিছু নয়
ভক্তি কাছে যেন ; ভক্তই তোমার,
ভক্তের তুমি নিশ্চয়।"

"সকলের মূলে ভকতি, ভগিনি !
না থাকে ভকতি যদি,

পাইতে আমায় চাবে কেন তুমি
জ্ঞানে কর্ম্মে নিরবধি?
জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত
যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"—
অন্য মনে কৃষ্ণ করিয়া উত্তর
রহিলেন চিন্তাকুল।
ভাবিলেন মনে কংস-নিসূদন—
"হ'তেছে বড়ই ভুল।
একে ত কোমল পার্থের হৃদয়,—
বীরত্ব আর্দ্র দয়ায়;
বালিকার এই করুণা-উচ্ছ্বাসে
বুঝি গীতা ভেসে যায়।"
বুঝিল উত্তরা পার্থের হৃদয়
হয়েছে কাতর অতি,
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া অশ্রুতে হাসিয়া
কহে প্রত্যুৎপন্নমতি—
"হে বাবা! ত তুমি বহু দিন ধরি
পুতুলগুলি আমার
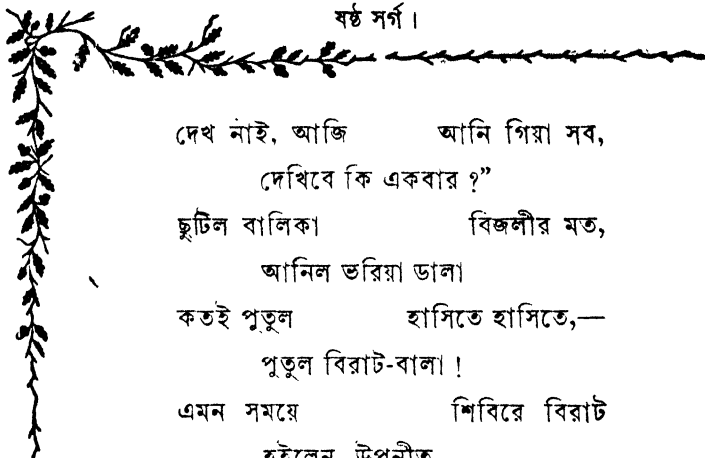
দেখ নাই, আজি আনি গিয়া সব,
দেখিবে কি একবার ?”
ছুটিল বালিকা বিজলীর মত,
আনিল ভরিয়া ডালা
কতই পুতুল হাসিতে হাসিতে,—
পুতুল বিরাট-বালা !
এমন সময়ে শিবিরে বিরাট
হইলেন উপনীত,
ছুটিয়া উত্তরা ঢুলিল গলায়
যেন স্বর্ণ উপবীত।
হাসিয়া হাসিয়া কহিলা বিরাট—
“এ কৌতুক মন্দ নয়,
কুরুক্ষেত্র এই পুতুলের নাচ।”

“দার্শনিক মহাশয় !
না হ'লে বিরাট মূর্খ, হেন কথা
কে বলিতে পারে আর ?
যানরে না বুঝে, রঙ্গরস বিনা
নাহি চলে এ সংসার।

বীর-নাচ, আর পুতুলের নাচ,
দেখি হাড় জ্বালাতন।
বানরের নাচ আজিকার মত
দেখিব ভরি নয়ন।"—
হাসিতে হাসিতে মন্থর গতিতে
সুলোচনা দিল বার,—

বিরাট। ও কেও? কে? তুমি

সুলো। পদ-চতুষ্টয়ে
করে দাসী নমস্কার।

বিরাট। না দেখি তোমায় ভেবেছিনু মনে
কাটাব সন্ধ্যাটি আজি
গল্প করি সুখে, লাগিলে কি তুমি?
লাগ তবে।

সুলো। একি পাজি!
যাই, কেন মরি শূকরে মুকুতা,
অরসিকে দিয়া প্রাণ?

বিরাট। পায়ে পড়ি তোর, দেখ্ মেয়ে কাছে
ছাড়্ রঙ্গ অভিমান।
ওই ঔষধির পাতাটি লইয়া
আয় দেখি, আয় কাছে।
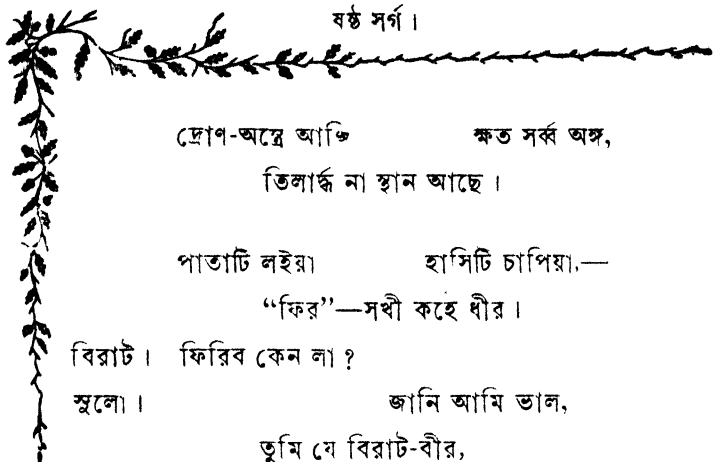
দ্রোণ-অস্ত্রে আজি ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গ,
তিলার্দ্ধ না স্থান আছে।

পাতাটি লইয়া হাসিটি চাপিয়া,—
"ফির"—সখী কহে ধীর।

বিরাট। ফিরিব কেন না?

সুলো। জানি আমি ভাল,
তুমি যে বিরাট-বীর,
বুক পাতি রণ কারো সনে তুমি
করিবার পাত্র নয়।
অস্ত্র-লেখা কিছু থাকে অঙ্গে যদি,
পিঠে তা আছে নিশ্চয়!

সুভ। ক্ষমা কর দিদি! পায়ে পড়ি তোর,
কাতর বিরাটেশ্বর
দিবসের রণে; ঔষধটি অঙ্গে
দিদি লো! লেপন কর।
নয়ন মুদিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া;
বসিয়া বিরাটপতি,—
"আহা! উহু! মরি! আহা! কি আরাম!
ঔষধ সুস্নিগ্ধ অতি"!

তত্তোধিক স্নিগ্ধ সুলোচনা তোর
সুকোমল হাত খানি,
জিহ্বাটিতে শুধু এত কেন ঝাল,
বুঝিতে না পারি আমি।—
বাবা গো! বাবা গো! গেছি রে! গেছি রে!
দূর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাড়্!
বড়ই লেগেছে!”

সুলো। কমলেতে কাঁটা
আছে, কি জান না আর?

কৃষ্ণ। কই লো মা তোর পুত্র কয় জন?

সুভ। বল মা! তাদের নাম।

উত্তরা। বল না দাই মা এইটি—

সুলো। অৰ্জ্জুন।

উত্তরা। এটি?

সুলো। বোকা ভগবান!

গালে ক্ষুদ্র চড় পড়িল অমনি।
সখী বাড়াইয়া কর,
বানরের মূর্ত্তি তুলিয়া কহিল—
“এইটি বিরাটেশ্বর!”

উত্তরা । দূর্ পোড়ামুখি ! তা কেন না হবে ?
এই ত বাবা সুন্দর !
ওইটির সঙ্গে দিব বিয়ে তোর,—
সুলো । বিরাট পাবে দোসর !
উত্তরা । এই তিন পুত্র ।
সুভদ্রা । কন্যা মা ! ক'জন ?
উত্তরা । এই কন্যা পঙ্কজনা—
তুমি মা, দুকন্যা দ্বারকায়,—
সুলো । আর ?—
উত্তরা । পোড়ামুখী সুলোচনা ।
কৃষ্ণ । আমি মা ! না হব ছেলে তোর কভু,
দেখ্ বেশী অলঙ্কার
দিয়াছিস্ তুই শ্বশুরের মা ! তোর,
বিমাতা তুই আমার !
উত্তরা । না বাবা ! তোমায় দিব আমি কাল
অলঙ্কার রাশি রাশি ।
অর্জ্জুন । তা হইলে আমি নিশ্চয় তোমারে
ডাকিব—"উত্তরা মাসী ।"
উত্তরা । না বাবা ! তোমায় সকলের বেশী
দিব আমি আভরণ ।
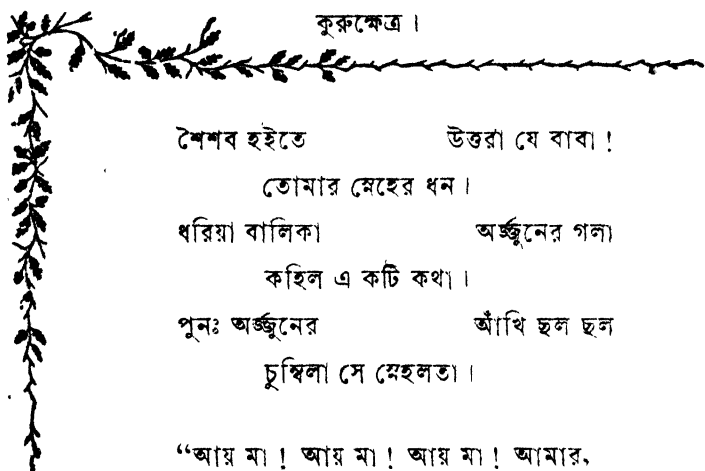
শৈশব হইতে উত্তরা যে বাবা !
তোমার স্নেহের ধন।
ধরিয়া বালিকা অর্জ্জুনের গলা
কহিল এ কটি কথা।
পুনঃ অর্জ্জুনের আঁখি ছল ছল
চুম্বিলা সে স্নেহলতা।

"আয় মা ! আয় মা ! আয় মা ! আমার,
আয় দেখি একবার।"—
মুখানি ধরিয়া কহিলা কেশব—
"ক' বাপ কহ তোমার ?"

উত্তরা। এ বাপ, ও বাপ, ওই বাপ আর—
কৃষ্ণ। শুনিলে বিরাটরাজ !
বিরাট। মা কটি মা ! তোর ?
উত্তরা। মা আমার পাঁচ।
বিরাট। বেয়াই ! কে জিতে আজ ?
সুলো। স্বামী পাঁচ জন তা তো হয় জানি.
মাও এবে শুনি পাঁচ।
সংখ্যা শুনিলাম, সংজ্ঞা এবে শুনি
দেখি কার কিবা ছাঁচ !

উত্তরা। এক মা বিরাটে, ওই মাতা আর,
দুই মাতা দ্বারকায়।

সুলো। দুই দুই চারি, তার পর শুনি?

উত্তরা। শূলীমা বাপের পায়।

বিরাট। বাবা গো! বাবা গো! মরেছি এবার!
মেরেছে ঘায়ে কি খোঁচা!

সুলো। শূলীমার শূল লাগিল কেমন
আমার গোধন ওঁচা?

উত্তরা। আমাকে মারিস, মারিস বাবাকে,
ঝগড়া তোর দিন রাতি।
কালামুখি! সব এখনি বাবারে
দিব কয়ে পাতি পাতি।
দেখ বাবা! দেখ, শূলীমা আমায়
আজ মারিয়াছে বড়,
আরো তোমাদের কত দেয় গালি,
বাবা গো বিচার কর।

অর্জ্জুন। হাঁ রে সুলোচনা! আমাদের গায়ে
ঝারি জিহ্বা দিন রাত
মিটে না কি সাধ? মেয়েটিরে শেষে
লাগিলি দেখাতে হাত?
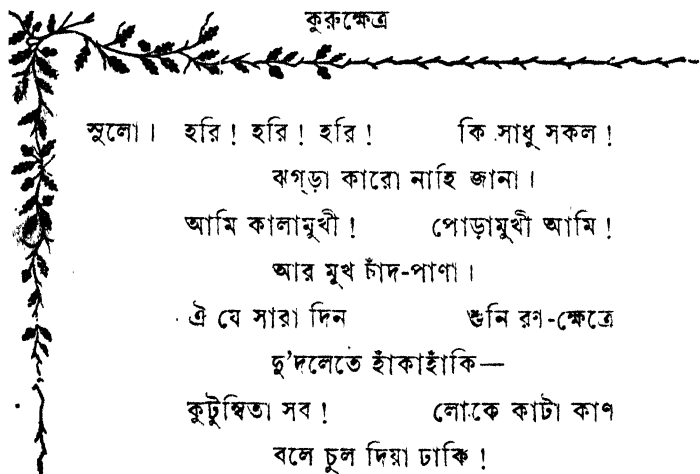
সুলো। হরি! হরি! হরি! কি সাধু সকল!
ঝগ্‌ড়া কারো নাহি জানা।
আমি কালামুখী! পোড়ামুখী আমি!
আর মুখ চাঁদ-পাণা।
ঐ যে সারা দিন শুনি রণ-ক্ষেত্রে
ছ'দলেতে হাঁকাহাঁকি—
কুটুম্বিতা সব! লোকে কাটা কাণ
বলে চুল দিয়া ঢাকি!
কর সারা দিন মর্দ্দানি গর্দ্দানি,
রণক্ষেত্রে ঘুরি ঘুরি,
গৃহক্ষেত্রে কিছু না রাখ খবর,
কি করে যে এই ছুঁড়ী।
সারা দিন তার পুতুলের বিয়ে
হুলুধ্বনি, উচ্চহাসি,
ছ'টিতে মিলিয়া করে কাড়াকাড়ি
ঝগ্‌ড়া করে রাশি রাশি।
কথা যদি কহি, মাথা ধরে মোর,—
শত্তুরের মুখে চুণ!
নিদ্রা যাই যদি, হাসি ও চীৎকার—
ভেঙ্গে যায় কাঁচা ঘুম!

সাধুর বেটী সাধু! আমি কালামুখী?
আচ্ছা যাইতেছি আমি,
দিব চূণ তোর বাপের মুখেতে;
এই আমি সাক্ষী আনি!
ছুটিল যুবতী, ছুটিল উত্তরা,—
অর্জ্জুন ধরিলা হাসি।
"ছেড়ে দাও বাবা!"— কহে হেঁট-মুখে—
"ছেড়ে দাও, যাই,—আসি।"
ছুটি অভিমন্যু পশিল শিবিরে
প্রণমিয়া গুরুজন,
কৃষ্ণপদতলে বসে জানু পাতি।
জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ—
"কহ বাবা! শুনি, কাঁর কার সনে
করেছিলে আজি রণ?"
"না মামা! যুদ্ধেতে—" হাসিয়া কিশোর—
"আজি না লাগিল মন।
কেবল মাতুল হার্দ্দিক্যের সনে
করেছিনু কোলাকুলি,
পিসা জয়দ্রথ হয়ে অগ্রসর
দিয়া গেলা পদধূলি।
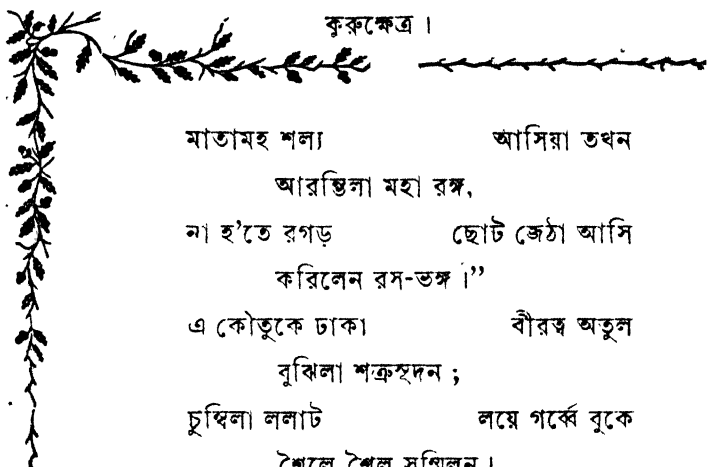
মাতামহ শল্য আসিয়া তখন
আরম্ভিলা মহা রঙ্গ,
না হ'তে রগড় ছোট জেঠা আসি
করিলেন রস-ভঙ্গ।"
এ কৌতুকে ঢাকা বীরত্ব অতুল
বুঝিলা শত্রুসূদন ;
চুম্বিলা ললাট লয়ে গর্ব্বে বুকে
শৈলে শৈল সম্মিলন।
"থাক্ রঙ্গরস"— ধরি এক কাণ
উঠাইল সুলোচনা—
"তিন কুল চোর, তোর লাগি আমি
সহি রে এত গঞ্জনা !"
তোলে অন্য করে ধরি এক কাণ
বিরাট রাজকুমারী,
"বল দেখি অভি ! তোর সঙ্গে আজ
কে করিল কাড়াকাড়ি ?"
দুই গালে চড় পড়ে দুই দিকে,
আদরে যে দিকে চায়।
"দেখ তবে এই দেই আল্‌পনা
বিরাট বীরের গায়।"
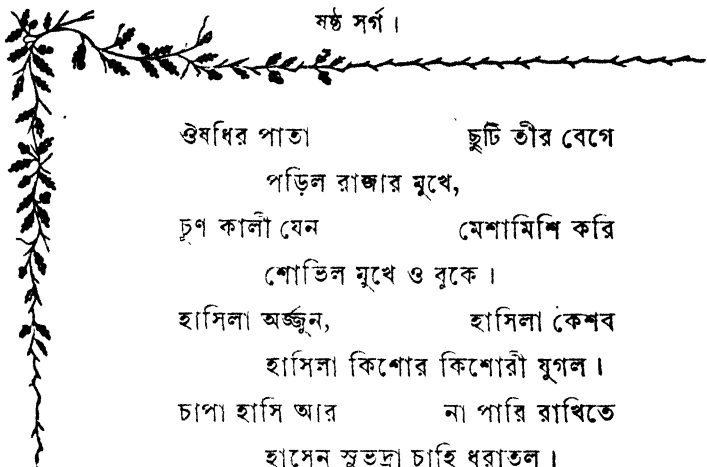
ঔষধির পাতা ছুটি তীর বেগে
পড়িল রাজার মুখে,
চূণ কালী যেন মেশামিশি করি
শোভিল মুখে ও বুকে।
হাসিলা অর্জ্জুন, হাসিলা কেশব
হাসিলা কিশোর কিশোরী যুগল।
চাপা হাসি আর না পারি রাখিতে
হাসেন সুভদ্রা চাহি ধরাতল।
কহে সুলোচনা— হাসি নাহি মুখে,
—বিরাট-নৃপতি ক্রোধে গড় গড়—
"আচ্ছা বল দেখি, হেন লক্ষ্য শুদ্ধ
চলে কি কখনো তোমার শর?
সখের সমর বিরাট রাজার,
বসনে কখন লাগে না দাগ।
মুখ চেয়ে দাগ লেগেছে বসনে,
বিরাট রাজার এই ত রাগ?"

না থামিতে হাসি কৌরব-শিবিরে
উঠে জয়ধ্বনি মেঘমন্দ্র জিনি।

চমকিলা সব, পশিল উত্তরা
সুভদ্রার বুকে ভীতা কুরঙ্গিণী।
বেগে রাজদূত পশিয়া শিবিরে
কহে,—"দ্রোণাচার্য্য করেছেন পণ,—
কালি মহারণে করিবেন হত
পাণ্ডবের মহারথী একজন।"

সপ্তম সর্গ।

দাবাগ্নি
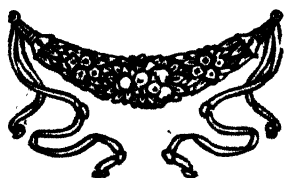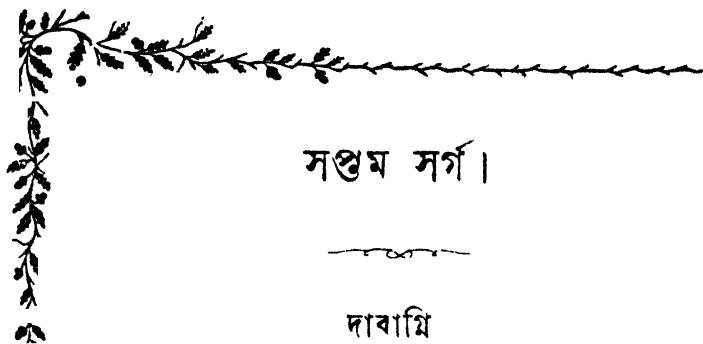
কুরুক্ষেত্রে !—ক্রীড়াক্ষেত্র হায় দুরাশার !
অতীত প্রহর নিশি ! কৃষ্ণা অষ্টমীর
নিবিড় তিমিরে এবে আচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ।
উপরে নক্ষত্ররাশি জ্বলিছে কেবল
ব্যাপি ঘনকৃষ্ণ নভঃ ; জ্বলিছে কেবল
অনন্ত আলোকরাশি শিবিরে শিবিরে
ঘনকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ; জ্বলিছে কেবল
দুরাশার ক্ষীণালোক হৃদয়ে হৃদয়ে
ঘনকৃষ্ণ বিষাদের ঘোর অন্ধকারে।
বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, জ্বালিয়া হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোকে, চলিয়াছে কারু
পাণ্ডব-শিবিরমুখে ধীরে বিষাদিনী,
ছাড়ি অলক্ষিতা অঙ্গপতির শিবির।
শুবে, ভগ্ন রথ-কাষ্ঠে, স্খলিতচরণ

হইতেছে পদে পদে,—নাহি জানে বামা ।
ছুটিতেছে চারিদিকে নৈশ-পর্য্যটক
মাংসাহারী হিংস্র পশু,—না দেখে নয়নে ।
বিকট চীৎকার স্থানে স্থানে পশুদের,
বীর-কণ্ঠ, উচ্চহাসি, উচ্ছৃঙ্খল গীত
সৈনিকের স্থানে স্থানে, উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে রহিয়া রহিয়া,—
না শুনে শ্রবণে বামা । খর চিন্তাস্রোতে
ছিন্ন লতা সম কারু চলেছে ভাসিয়া ।
নীরবে এসেছে বামা যাইছে নীরবে—
চিন্তাকুলা, অন্যমনা ; জ্বলিছে হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোক নিরাশা আঁধারে,
নৈশ অন্ধকারে ক্ষীণ তারালোক যথা ।
ভাবিতে লাগিল কারু—"বুঝেছিনু আগে
ছদ্ম নাম শরৎকারু, সেই প্রবঞ্চনা,
সেই রুদ্র দরশন,—করেছিল মনে
ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া অস্পষ্ট সঞ্চার ।
কিন্তু সহোদর মম, সরল-হৃদয় ;
ওই নিরমল নভঃ হৃদয় তাঁহার,
বিভাসিত পুণ্যালোক-নক্ষত্র-মালায়
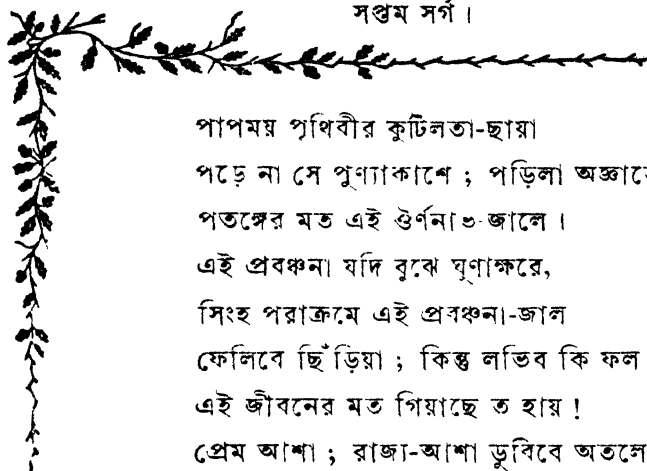
পাপময় পৃথিবীর কুটিলতা-ছায়া
পড়ে না সে পুণ্যাকাশে ; পড়িলা অজ্ঞাতে
পতঙ্গের মত এই ঔর্ণনাভ-জালে।
এই প্রবঞ্চনা যদি বুঝে ঘৃণাকরে,
সিংহ পরাক্রমে এই প্রবঞ্চনা-জাল
ফেলিবে ছিঁড়িয়া ; কিন্তু লভিব কি ফল ?
এই জীবনের মত গিয়াছে ত হায় !
প্রেম আশা ; রাজ্য-আশা ডুবিবে অতলে।"
নীরবে চলিল বামা নক্ষত্রখচিত
নব-শিত-নিরমল আকাশের পানে
চাহিয়া চাহিয়া, ধীরে ধীরে চিন্তাকুলা।
"গিয়াছে ত প্রেম আশা ; হা হত বিধাতঃ !
কিন্তু কি গিয়াছে প্রেম ? যায় কি তা কভু ?
যায় আশা,—আকাঙ্ক্ষা ত যায় না কথন !
ভ্রাতার বিরহ-চিন্তা কিছুদিন হ'তে
করেছিল আকুলিত রমণী-হৃদয়
জাগাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি। ধীরে সরাইয়া
যৌবন-জলদজাল, দেখাইতেছিল
জীবনের কি সুন্দর প্রফুল্ল প্রভাত,
হালোকে, আশালোকে, শান্ত সমুজ্জ্বল।
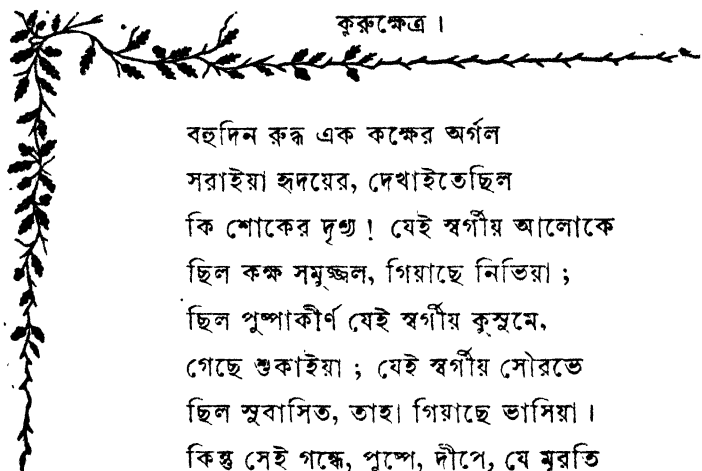
বহুদিন রুদ্ধ এক কক্ষের অর্গল
সরাইয়া হৃদয়ের, দেখাইতেছিল
কি শোকের দৃশ্য! যেই স্বর্গীয় আলোকে
ছিল কক্ষ সমুজ্জল, গিয়াছে নিভিয়া;
ছিল পুষ্পাকীর্ণ যেই স্বর্গীয় কুসুমে,
গেছে শুকাইয়া; যেই স্বর্গীয় সৌরভে
ছিল সুবাসিত, তাহা গিয়াছে ভাসিয়া।
কিন্তু সেই গন্ধে, পুষ্পে, দীপে, যে মূরতি
হইত পূজিত,—সেই হৃদয়ের দেব,
কারুর হৃদয়নাথ,—রয়েছে স্থাপিত
কারুর প্রণয়-পদ্মে সেই মত হায়!
সেই রুদ্ধ কক্ষ-দ্বারে দ্বাদশ বৎসর
করেনি আঘাত কেহ; জগতে দ্বিতীয়
নাহি কেহ, পারিবে যে করিতে আঘাত
সেই দৃঢ় রুদ্ধ দ্বারে; খোলেনি কখন
সেই রুদ্ধ দ্বার এই দ্বাদশ বৎসর।
স্মৃতি কুহকিনী হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
খুলিয়া সে রুদ্ধ দ্বার, জ্বালাইয়া দীপ,
বাচাইয়া শুষ্ক ফুল, ঢালিয়া সুবাস,
আরম্ভিল প্রেমারতি; রমণী-হৃদয়

আবেশে আবেগে হায়! হইল আকুল।
পর্ব্বতনির্ঝরে শুষ্ক বহিল ছুটিয়া
ঘোর বরিষার বন্যা প্লাবিয়া দু'কূল,
ভাসি সেই স্রোতোবেগে আকুলা রমণী
আসিলাম কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে, যথা
বিরাজিছে অভাগীর হৃদয়-ঈশ্বর।
অঙ্গের বাতাস তাঁর, অঙ্গের সুবাস,
সেই ফুল্ল কম্বু-কণ্ঠ,—বহুদিন শ্রুত
নিশীথ-নির্জ্জনে দূর বাঁশরীর রব,—
ভেবেছিনু মনে, বহি নৈশ সমীরণে
জুড়াইবে হায়! এই প্রাণের উচ্ছ্বাস।"
সম্মুখে পথিক এক; জিজ্ঞাসিল কারু
মৃদুলে—"কোথায় কহ কৃষ্ণের শিবির?"
কহিল পথিক—"ওই নীল সূর্য্য মত
জ্বলিছে আলোক যেই শিবিরের দ্বারে
কৃষ্ণের শিবির উহা।"

ওই নীলালোক!
সম্মুখে শিবির!—হায়! রমণীর আর
চলিল না পদ। বলে চাপিয়া উচ্ছ্বাস
উচ্ছলিত, অন্ধকারে পাদপের মূলে

হেলাইয়া বাম অঙ্গ, অবশ মস্তক,
আশ্রিতা লতিকা যেন বসিল রমণী—
বিহ্বলা, বিবশা, দীনা ; রহিল চাহিয়া
অনিমেষনেত্রে সেই আলোকের পানে।
সেই নীলালোকে যেন নিরখিছে কারু
শিবিরের অন্তঃস্থল ; নিরখিছে যেন
সুবর্ণপর্য্যঙ্ক-অঙ্কে শায়িত শিবিরে
নীলমণিময় কিবা মূরতি সুন্দর !
দেখিল জলধি যেন পূর্ণ শশধর ;
উনমত্ত, উচ্ছ্বসিত, ছুটিল বহিয়া।
"মরি ! মরি ! কি সুন্দর !"—ভাবিতে লাগিল কারু,—
"কিবা রূপ নয়ন মোহিয়া,
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম,
প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয়া।
কিবা অঙ্গভঙ্গিমায় মহিমা ভাসিয়া যায়।
কিবা বক্ষ মহিমা-পূরিত !
মহিমা নয়নে ভাসে, মহিমা অধরে হাসে,
বীর-কণ্ঠ মহিমা-সঙ্গীত !
পূর্ণচন্দ্র বিভাসিত সুনীল আকাশ সম,
কি ললাট মহিমা-দর্পণ !
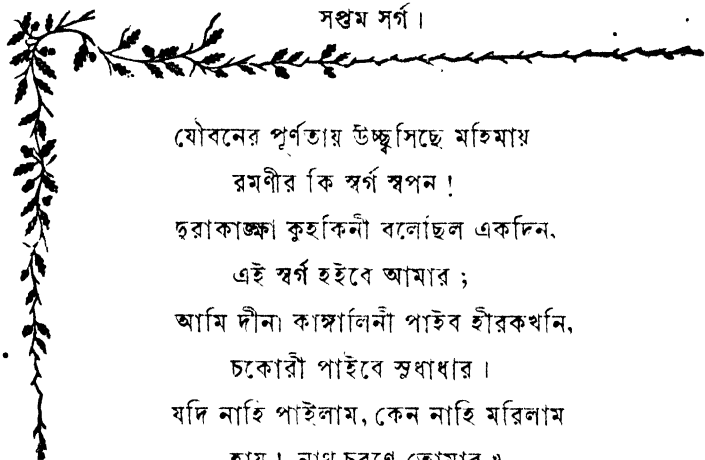
যৌবনের পূর্ণতায় উচ্ছ্বসিছে মহিমায়
রমণীর কি স্বর্গ স্বপন!
দুরাকাঙ্ক্ষা কুহকিনী বলেছিল একদিন,
এই স্বর্গ হইবে আমার;
আমি দীনা কাঙ্গালিনী পাইব হীরকখনি,
চকোরী পাইবে সুধাধার।
যদি নাহি পাইলাম, কেন নাহি মরিলাম
হায়! নাথ চরণে তোমার?
জীবন স্বপন সহ জীবন না পোহাইল,
জ্যোৎস্না হইলে অন্ধকার?
রমণীর অভিমান হৃদয়েতে চাপিলাম;
বিচূর্ণিত হইল হৃদয়।
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি স্মৃতির সলিল-রাশি
আজি বেলা ভাসাইয়া বয়!
উত্তাল এ সিন্ধু মাঝে ছিল মৈনাকের মত
অভিমান হৃদয় চাপিয়া;
স্মৃতির নিশ্বাসে ক্ষুদ্র, এত দীর্ঘকাল পরে,
হায়! তাহা গেল কি উড়িয়া?—
এ ভগ্ন হৃদয় হায়! অবারিত প্রেম-স্রোতে
এরূপে কি চলিল ভাসিয়া?
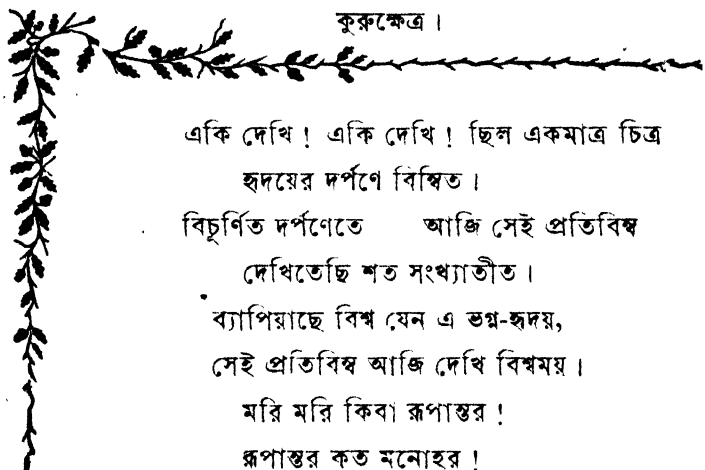
একি দেখি! একি দেখি! ছিল একমাত্র চিত্র
হৃদয়ের দর্পণে বিম্বিত।
বিচূর্ণিত দর্পণেতে আজি সেই প্রতিবিম্ব
দেখিতেছি শত সংখ্যাতীত।
ব্যাপিয়াছে বিশ্ব যেন এ ভগ্ন-হৃদয়,
সেই প্রতিবিম্ব আজি দেখি বিশ্বময়।
মরি মরি কিবা রূপান্তর!
রূপান্তর কত মনোহর!
মোহিল যে অষ্টমীর শশী
এ কিশোরী চকোরীর মন,
সেই শশী পূর্ণচন্দ্র আজি,
এ চকোরী যুবতী এখন।
বনবালা কিশোরীর প্রেম
গিরিসুতা ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী,
হইয়াছে আজি প্রাণনাথ!
মহানদী ধরাবিপ্লাবিনী!
বনবালা কিশোরীর হায়!
সে আকাঙ্ক্ষা বাঁশের আগুন,
হইয়াছে অকরুণ! আজি,
পিপাসার দাবাগ্নি দারুণ।
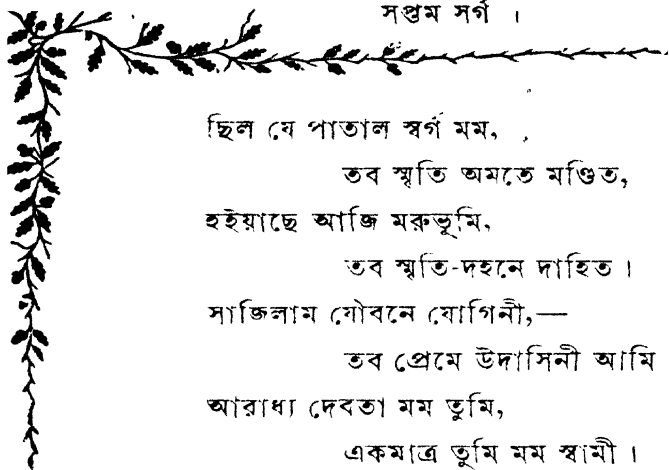
ছিল যে পাতাল স্বর্গ মম,
তব স্মৃতি অমতে মণ্ডিত,
হইয়াছে আজি মরুভূমি,
তব স্মৃতি-দহনে দাহিত ।
সাজিলাম যৌবনে যোগিনী,—
তব প্রেমে উদাসিনী আমি
আরাধ্য দেবতা মম তুমি,
একমাত্র তুমি মম স্বামী ।
দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি,
আমি পত্নী নহি দুর্ব্বাসার ;
উভয় উভয়ে মাত্র দেখি—
উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার ।
পারিবে না দুর্ব্বাসা কখন
পরশিতে এ দেহ আমার ।
দেব-পদে নিবেদিত যাহা,
চিরদিন রবে দেবতার ।
বুঝিয়াছি তুমি নহে নর,
বুঝিয়াছি তুমি নারায়ণ ।
কারুর হৃদয়নাথ তুমি,
তুমি জগন্নাথ সনাতন ।

যেই প্রেম-উৎস বৃন্দাবন,
ভাসাইছ যে প্রেমে ধরায় ;
সেই প্রেম কারুর হৃদয়ে
উথলিছে মত্ত সিন্ধু প্রায়।
না না, নাথ! তুমি মম স্বামী,
আমি আমরণ তব দাসী :
চরণে ঢালিব আজি তব,
প্রস্ফুটিত এই পুষ্প-রাশি।
এ শিবির ত্রিদিব আমার,
তুমি মম আরাধ্য ঈশ্বর,
পড়িব চরণে আজি তব,
পিপাসায় পুড়িছে অন্তর।"
দাঁড়াইল উন্মাদিনী ; গেল ছুটি পদদ্বয় ;
ছিন্ন লতা মত ঢলি পড়িল ভূতলে।
মাটিতে রাখিয়া বুক, কাঁদিতে লাগিল বামা,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা তিতি নেত্রজলে।
"অভিমান! অভিমান! ওরে!
একি কথা, একি কথা তোর
'পাবি না রে পাবি না রে স্থান ;
মরীচিকা হইবে রে ভোর।'

সপ্তম সর্গ।

নাহি পাই, নাহি পাই যদি
তাঁহার চরণে আমি স্থান,
লইয়া হৃদয়ে পা দু'খানি
তেয়াগিব এ নিরাশ প্রাণ।
হায় নাথ! যেই জলধর
ঢালে বিশ্বে অমৃত-আসার,
একটি তাপিতা লতা বুকে
সে কি বজ্র করিল প্রহার?
যেই দিনমণি বিশ্বময়
খোলে নিত্য শোভার ভাণ্ডার;
সে কি এই কুমুদিনী প্রাণে
করে এই মরু আবিষ্কার?
যেই অগ্নি পতিত-পাবন,
জগতের আনন্দ-বর্দ্ধন,
পতিতা এ পতঙ্গিনী তরে
সে কি হায়! কেবল দাহন?
শুনি তুমি দয়া-পারাবার,
শুনি তুমি প্রেম-অবতার;
পতঙ্গেও পায় তব দয়া,
আমি মাত্র অযোগ্যা তাহার?
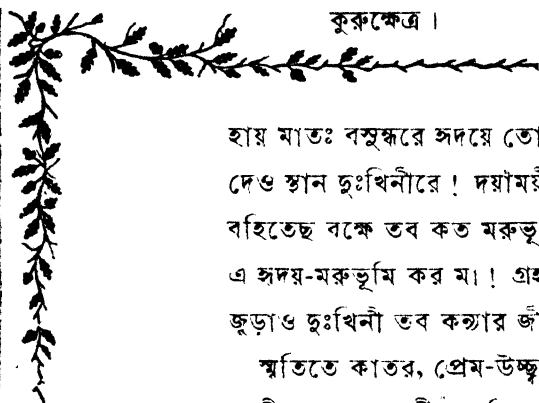
হায় মাতঃ বসুন্ধরে হৃদয়ে তোমার
দেও স্থান দুঃখিনীরে! দয়াময়ী তুমি,
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি।
এ হৃদয়-মরুভূমি কর মা! গ্রহণ,
জুড়াও দুঃখিনী তব কন্যার জীবন।"
স্মৃতিতে কাতর, প্রেম-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল,
রমণীর হৃদয়েতে তীব্র অভিমান
দংশিল বৃশ্চিক সম; ছটফট করি
কাঁদিতে লাগিল বামা চাপিয়া হৃদয়
ধরাতলে, বাণবিদ্ধ বন-কপোতিনী।
অতীত প্রহর নিশি। নীরব প্রাঙ্গণ।
প্রান্তস্থিত শিবিরের অসংখ্য আলোক
আসিছে নিভিয়া ক্রমে। আসিছে নিভিয়া
ক্রমে দূর নর-কণ্ঠ; উঠিছে ভাসিয়া
নীরব শর্ব্বরী-বক্ষে নর-মাংসাহারী
কুক্কুর-শৃগাল-কণ্ঠ কর্কশ কঠোর।
সুপ্ত-উত্থিতার মত উঠিয়া রমণী
যন্ত্রের পুতুল যেন চলিল সবেগে
কিছু দূর,—ওকি কণ্ঠ! ত্রিদিব-সঙ্গীতে
প্রাঙ্গণ হইল পূর্ণ; নৈশ সমীরণ
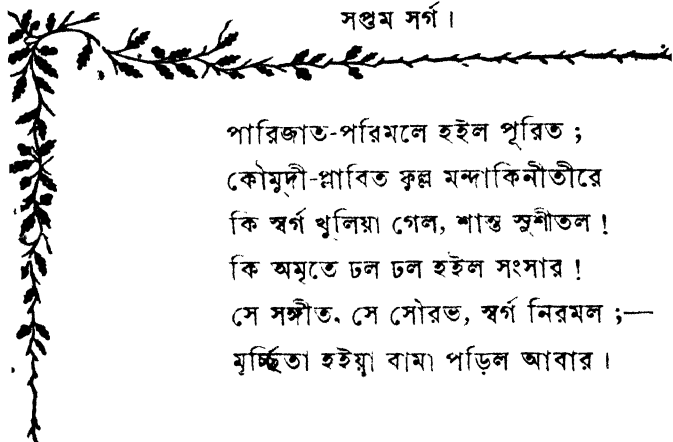
পারিজাত-পরিমলে হইল পূরিত ;
কৌমুদী-প্লাবিত কুল্ল মন্দাকিনীতীরে
কি স্বর্গ খুলিয়া গেল, শান্ত সুশীতল !
কি অমৃতে ঢল ঢল হইল সংসার !
সে সঙ্গীত, সে সৌরভ, স্বর্গ নিরমল ;—
মূর্চ্ছিতা হইয়া বামা পড়িল আবার।
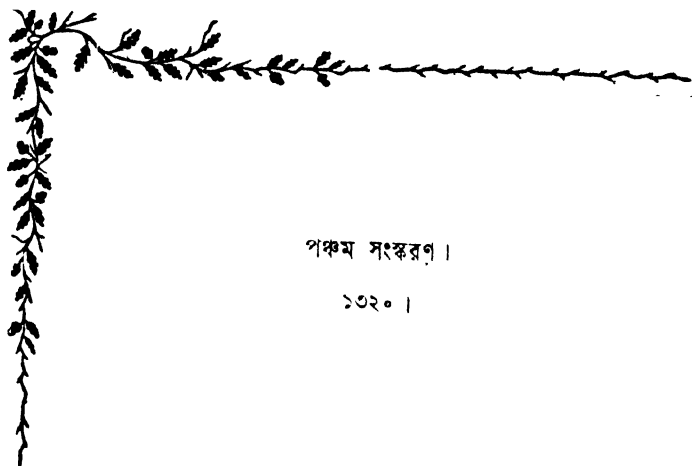
পঞ্চম সংস্করণ।

১৩২০।

কলিকাতা
২৮ নং বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন, বাণী প্রেসে
শ্রীগোষ্ঠবিহারী কয়ড়ী দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

আমার

সরলা স্নেহময়ী শোকসন্তপ্তা

স্বর্গীয়া জননী

রাজরাজেশ্বরী দেবীর

পবিত্র চরণাম্বুজে

সদ্য-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে

এই শোক-কাব্য

উৎসর্গ করিলাম।

রাণাঘাট,
৩০শে বৈশাখ,।
১৩০০ সাল।

নবীন।

নিবেদন।

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান ভাগ 'রৈবতকের' সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রের' সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। 'রৈবতকের' ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্রের' ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।

আমার পুত্রপ্রতিম

ভাগিনেয়

৺কামিনীকুমুদ সেন

প্রাণাধিক,

তোমার বড় আদরের কুরুক্ষেত্র,—নানা কারুকার্য্যে খচিত করিয়া মুদ্রিত করিবে বলিয়া তুমি যে 'কুরুক্ষেত্রের' মুদ্রাঙ্কন দুই বৎসর যাবৎ স্থগিত রাখিয়াছিলে,—তুমি রোগ-শয্যায় শায়িত হইলে যে 'কুরুক্ষেত্রের' আভরণহীন মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া তুমি এত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলে,—আজ সে কুরুক্ষেত্রের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইল, আর তুমি কি আজিই একটি পবিত্র সুখস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইলে? তুমি যে একবার মুদ্রিত কুরুক্ষেত্র দেখিয়াও গেলে না আমার এ দুঃখ কোথায় রাখিব? আমি একটি শিশু-শোক-স্মৃতির সহিত 'কুরুক্ষেত্র' আরম্ভ করিয়াছিলাম, জানিতাম না তোমার শোক-স্মৃতি ইহার শেষের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। ভগবানের যে শোক আমি কল্পনায় অনুভব করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে সেই শোক 'কুরুক্ষেত্রের' মুদ্রাঙ্কনের শেষের সহিত মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে। জানিতাম না যে, যে মহাচিতা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য জ্বলিবে। তথাপি আমার দুঃখ নাই। তোমার জীবনে বুঝি

জন্মান্তরের কিঞ্চিৎ কর্ম্মছায়া ছিল, ২৩ বৎসর কাল ধরাধামে থাকিয়া তাহা অপসারিত করিয়া, তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও দেবত্ব কোনরূপে কলুষিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি আজ পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রকৃতির শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে "নীরবে শান্তভাবে" দেবলোকে চলিয়া গেলে। যাও বৎস! আমিও পুণ্যবতী শৈলজার মত দেখিতেছি—————

"ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।"

আমিও শৈলজার মত সেই—————

"শান্তির ত্রিদিব-বুকে
পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমোদের শোক চরণে অর্পণ,
গাব সুখে কৃষ্ণ নাম জুড়াব জীবন।"

রাণাঘাট,
৩০শে বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

তোমার শোকে সন্তপ্ত
নবীন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন